দুঃসাহসিক অভিযাত্রা

ড. মুহাম্মদ রেজাউল করিম

দুঃসাহসিক অভিযাত্রা

ড. মুহাম্মদ রেজাউল করিম

আরজু পাবলিকেশন্স
৬০/ডি, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০
পরিবেশনায়
ঢাকা বুক কর্নার
৬০/ডি, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০
মোবা : ০১৭১১ ০৩০৭১৬, ০১৯১৭ ২০৬৫০৪

www.amarboi.org

দুঃসাহসিক অভিযাত্রা

ড. মুহাম্মদ রেজাউল করিম

প্রকাশক
মুহাম্মদ আমীনুল ইসলাম
আরজু পাবলিকেশন্স
ঢাকা বুক কর্নার
৬০/ডি, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০
মোবা : ০১৭১১ ০৩০৭১৬, ০১৯১৭ ২০৬৫০৪

প্রথম প্রকাশ
ডিসেম্বর ২০১০ ইংরেজি

মুদ্রণ
চৌকস প্রিন্টার্স
ফকিরাপুল, ঢাকা

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

মূল্য : ১৫০ টাকা মাত্র।

Dussahosik Ovijatra Writen by Dr. Muhammad Rezaul Karim, and Published by Arju Publication, 60/D Purana Paltan, Dhaka, Price : Tk. 150.00 only, US$ 3.00 Only

www.amarboi.org

প্রারম্ভিক কথা

কমিউনিজমের পতনের পর পশ্চিমাদের সামনে এখন নতুন চ্যালেঞ্জ (Political Islam) পলিটিক্যাল ইসলাম। পশ্চিমাদের বুদ্ধিগুরু হিসেবে খ্যাত স্যামুয়েল হান্টিংটনের 'দ্য ক্ল্যাশ অব সিভিলাইজেশনস্' 'সভ্যতার দ্বন্দ্ব' তত্ত্বটির আলোকে পশ্চিমাদের সামনে এখন একমাত্র শত্রু ইসলাম ও মুসলমান। বিশ্ব জায়নবাদীগোষ্ঠী এই তত্ত্বকে মিডিয়ার নিকট অর্পণ করেছে। মিডিয়া বিভিন্নভাবে সিনেমা, ফিল্ম, নভেল, নাটক, বক্তৃতা-বিবৃতি ও গবেষণামূলক প্রবন্ধ-নিবন্ধের মাধ্যমে পাশ্চাত্যের মন-মস্তিষ্কে এ কথা মজবুতভাবে ঢুকিয়ে দেয়ার প্রাণান্তকর প্রয়াস চালিয়েছে যে, কমিউনিজমের পতনের পর পাশ্চাত্যের শত্রুতার গতিপথ এখন ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে রুখ করেছে।

আর এই 'নয়া ক্রুসেড'-এর মূল লক্ষ্য মুসলমানদের জিহাদী চিন্তা, চেতনা ও বিশ্বাসে আঘাত হানা। মুসলমানদের মধ্যে জিহাদের চেতনায় উজ্জীবিত ব্যক্তি, দল, গোষ্ঠীকে চিত্রিত করা, মৌলবাদ, সাম্প্রদায়িকতা, উগ্রবাদ, পশ্চাৎপদতা, জঙ্গিবাদ, নাশকতাকারী, মানবতাবিরোধী, সেকেলে অনুন্নত ও অ-আধুনিক বলে ব্যাপকভাবে প্রচারণা চালানো।

পশ্চিমারা মুসলমানদের উত্থান ঠেকাতে শুধু ব্যর্থই হয়নি, নিজেদের অস্তিত্বই আজ হুমকির সম্মুখীন। সম্প্রতি মুসলমানদের ক্রমবর্ধমান সংখ্যা বিবেচনা করে জার্মানির চ্যান্সেলর এঙ্গেলা মার্কেল মন্তব্য করেছেন, 'জার্মানি উইল বিকাম অ্যা ইসলামী স্টেট'। ইসলামের আদর্শে আনুপ্রাণিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে 'টক অব দ্য ওয়ার্ল্ড' হয়েছেন সাবেক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ারের শ্যালিকা বিশিষ্ট সাংবাদিক লরেন বুথ। পশ্চিমারা নাইন-ইলেভেন ঘটিয়েছে মুসলমানদের সন্ত্রাসী বানিয়ে তাদের পুনর্জাগরণ ঠেকাতে কিন্তু নাইন-ইলেভেনের পরই সবচেয়ে বেশি আমেরিকান ইসলাম গ্রহণ করেছে। তাই আমি বইটিকে ছয়টি অধ্যায় বিন্যাস করে পাশ্চাত্যের হীন রাজনৈতিক স্বার্থে ইসলামের বিরুদ্ধে অপবাদ ও এর কৌশল এবং এর মোকাবেলায় করণীয় দিকগুলো তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

আমাদের এ সমাজে আজ অপরাধীরা মুক্ত। নিরপরাধীরাই যেন নির্মম জুলুম নির্যাতন, অপ্রচার আর প্রতিহিংসার শিকার। সৎ চরিত্রের লালন যাদের দীপ্ত শপথ, খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তাদের চরিত্র হননই আজ জাতীয় দায়িত্ব বানিয়ে নিয়েছে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের দোসররা।

কিন্তু এত কিছুর পরও সন্তানহারা পিতা-মাতার রোনাজারি, ভাইহারা বোনের আহাজারি হযরত বেলাল, খাব্বাব ও মুসআব (রা.) চেতনার উত্তরসূরিদের থামিয়ে দিতে পারেনি। অসংখ্য জুলুম নির্যাতনের পথ মাড়িয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টির

www.amarboi.org

জন্য পাগলপারা একদল যুবক জীবন দেয়ার প্রতিযোগিতায় এখানে লিপ্ত। পৃথিবীর সকল শক্তি যখন তাদেরকে নিঃশেষ করতে উদ্যত, গভীর রাতে ঐ যুবকরাই আল্লাহর রাহে জীবন দেয়ার ফরিয়াদে সিজদারত। এমন কাফেলাকে কি কখনো জুলুম, নির্যাতন আর ভয় দেখিয়ে রোখা যায়? এত মাবুদের সাথে বান্দার করা প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন। যারা আমাদেরকে নির্যাতন চালিয়ে পিছিয়ে দিতে এসেছে তারা তো আমাদের কামিয়াবির পথকে কতটুকু এগিয়ে দিয়েছে তা সে জানে না। এ কাফেলার ওপর আঘাত যত হানা হয়, কাফেলা এগিয়ে চলে তার মঞ্জিলের দিকে তত দুরন্তগতিতে। এত আমাদের মহাগ্রন্থ আল কুরআনেরই কথা। তারা তো তা বোঝেই না। এসব অগ্নিপরীক্ষা ইসলামী আন্দোলনের জন্য খুবই সহায়ক। ফলে কাপুরুষ হীন চরিত্রের দুর্বল লোকেরা এ আন্দোলনের ধারে কাছেই ঘেঁষতে পারেনি। আমাদের সাথে সমাজের মণিমুক্তাগুলোই শরিক হলো এ আন্দোলনে। বস্তুত এক মহান বিপ্লবী আন্দোলনের উপযোগী শ্রেষ্ঠ লোকদের বাছাইয়ের জন্য এর চাইতে উত্তম পন্থা আর হতে পারে কি?

আবার বিপদ-আপদ ও সমস্যা সঙ্কটের করাল আঘাত তাকে ক্ষত-বিক্ষত করতে থাকে এহেন অবস্থায়ও নিজের মানবিক চরিত্র বিনষ্ট করে না। কখনো কখনো প্রতিপক্ষের জুলুম, নিপীড়ন, কূটতর্ক এবং লাগাতার মিথ্যাচার বিরক্তিতে ভরে ওঠে। এ অবস্থায় ও ধৈর্য, সাহসিকতা ও নিশ্চিন্ততার সাথে পরিস্থিতির মোকাবেলা করে।

সত্য ও মিথ্যার সংঘাতের যে বিধান আল্লাহ তৈরি করে দিয়েছেন তা অনিবার্য। তা পরিবর্তনের ক্ষমতা কারো নেই। সত্যপন্থীদের অবশ্য দীর্ঘকাল পরীক্ষার আগুনে ঝালাই হতে হবে। তাদের পরীক্ষা দিতে হবে নিজেদের সবর, সহিষ্ণুতা, সততা, সত্যবাদিতা, ত্যাগ-তিতিক্ষা, আত্মোৎসর্গিতা, ঈমানী দৃঢ়তা ও আল্লাহর প্রতি নির্ভরশীলতা আর সমস্যা ও সঙ্কটের সুকঠিন পথে। তাদের মধ্যে এমন গুণাবলী সৃষ্টি করতে হবে যা কেবলমাত্র ঐ কঠিন বিপদসঙ্কুল গিরিপথেই লালিত হতে পারে। তাদেরকে শুরুতেই নির্ভেজাল উন্নত নৈতিক গুণাবলী ও সচ্চরিত্রের অস্ত্র ব্যবহার করে জাহেলিয়াতের ওপর বিজয় লাভ করতে হবে।

পরিশেষে বলতে চাই, এই বইয়ের নাম দুঃসাহসিক পথ। কিন্তু বিজ্ঞপাঠকের নিকট যা তুলে ধরতে চেয়েছি, তা আরেক দুঃসাহসিকতা। আমার বিশ্বাস, একটি শিশুকে যেমনি হাঁটি হাঁটি পা পা করে বেড়ে উঠতে সমাজের সকলেই ভালোবাসা ও সাহায্য সহযোগিতার হাতকে বাড়িয়ে দেয়, আমার প্রত্যাশাও ঐ শিশুর চেয়ে ব্যতিক্রম নয়। ইতঃপূর্বে আমার লেখা বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত প্রবন্ধ

www.amarboi.org

সঙ্কলন 'জাতীয় জীবনে মূল্যবোধের অবক্ষয়' ও 'ওয়ান ইলেভেন : সংস্কারের রাজনীতি নয় রাজনীতির সংস্কার' বই দু'টির মুখবন্ধ মতামত লিখেছেন সাবেক সচিব জনাব আসাফউদ্দৌলা, সাবেক সচিব ও আমার দেশ পত্রিকার ভারপাপ্ত সম্পাদক জনাব মাহমুদুর রহমান। তারা অনেক বড় বড় শব্দ চয়ন করে আমি ও আমার লেখার মান না যত, তার থেকে বেশি মর্যাদা দিয়েছেন। এই ভালোবাসাও দুরন্ত গতিতে এগিয়ে যাওয়ার সাহস জোগায়।

বিজ্ঞ ব্যক্তিদের এই মতামত আমার নিজের ভুল-ত্রুটি পাঠকদের থেকে আগলে রাখতে সাহায্য করলেও পাঠকদের সঠিক সমালোচনা ও পরামর্শ পাওয়ার প্রতিবন্ধক কি না, সেই চিন্তা থেকেই এই বইটির পরামর্শ ও সমালোচনার দুয়ার পাঠকদের জন্য উন্মুক্ত রাখলাম। আমার মনে হয় কাঁচা হাতের একজন লেখকের জন্য এটিও কম সাহসিকতার ব্যাপার নয়।

এই বইয়ের কোন ভুল-ত্রুটি যদি আপনাদের নজরে পড়ে তাহলে সরাসরি আমাকে ই-মেইল পাঠালে অথবা প্রকাশক বরাবর লিখে পাঠালে আমরা পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। আশা করি সকল ভুল-ত্রুটি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন।

এই আন্দোলনের একজন কর্মী হিসেবে বর্তমান সময়কে অতিক্রম করতে গিয়ে প্রতিপক্ষের কূটকৌশলের মোকাবেলায় আমাদের যা করণীয় এই বই তার একটি সম্মিলিত সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনা মাত্র। যাদের বইয়ের সহযোগিতা নিয়েছি তাদের সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

বিশেষ করে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আরজু পাবলিকেশন্সের মালিক আমীনুল ইসলাম ও সমন্বয়ক প্রিয় ভাই মহিউদ্দিন মধুকে, যাদের লেগে থাকার কারণেই বলা যায় বইটির আলোর মুখ দেখা সম্ভব হয়েছে। মোবারকবাদ সম্মানিত সেক্রেটারি জেনারেল ডা. ফখরুদ্দিন মানিক ও সকল সেক্রেটারিয়েট এবং কার্যকরী পরিষদ সদস্য ভাইদের যারা বিভিন্নভাবে উৎসাহ দিয়েছেন। ধন্যবাদ প্রিয় ভাই আব্দুর রহমান, নুরুন্নবী রায়হান, জুবায়ের হুসাইন, আবুল কালাম খান, মাজহারুল ইসলাম, রহুল আমিনসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে। এই বই পড়ে দ্বীনের পথে পাঠকদের সামান্যতম প্রেরণা ও পরিশ্রমের সার্থকতা খুঁজে পাবে। আল্লাহ আমাদের সকল প্রচেষ্টা তার সন্তুষ্টির জন্য কবুল করুন, আমীন।

ড. মুহাম্মদ রেজাউল করিম
mrkarim_80@yahoo.com,
ঢাকা
নভেম্বর ০৩, ২০১০, ঈসায়ী

www.amarboi.org

এ কাজের জন্য এমন একদল দুঃসাহসী যুবকের প্রয়োজন, যারা সত্যের প্রতি ঈমান এনে তার ওপর পাহাড়ের মতো অটল হয়ে থাকবে। অন্য কোনো দিকে তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হবে না। পৃথিবীতে যা-ই ঘটুক না কেন, তারা নিজেদের লক্ষ্য উদ্দেশ্যের পথ থেকে এক ইঞ্চিও বিচ্যুত হবে না।

সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী

প্রচারমাধ্যম ও বিশেষজ্ঞরা যেভাবে নির্ধারণ করে দেয় অবশিষ্ট পৃথিবীর প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি।

এডওয়ার্ড ডব্লিউ সাঈদ

এই পৃথিবীকে যে রকম দেখছ, তোমাকে সেটাই মেনে নিতে হবে; এমন কোন কথা নেই, আমাদের কাজ হবে, আমরা যে রকম পৃথিবী চাই, যে পৃথিবী আমাদের পছন্দ, তা খুঁজে নেয়া।

নেলসন ম্যান্ডেলা

উৎসর্গ

এই দুঃসাহসিক পথের অভিযাত্রী শহীদেরা
যাদের প্রেরণা-ই আমাদের উৎস,
সত্যের পথে চলতে গিয়ে যারা
জালেমের প্রতিহিংসার শিকার হয়ে
কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ
সেই জাতীয় বীর সেনানীদের প্রতি...

www.amarboi.org

প্রকাশকের কথা

সত্য ও মিথ্যার দ্বন্দ্ব চিরন্তন। মানবসমাজে রয়েছে নানা অসঙ্গতি ও বৈপরীত্য। এসব বিষয়কে সঠিক খাতে প্রবাহিত করার জন্য প্রয়োজন বলিষ্ঠ নেতৃত্ব, উদ্যম, নৈতিক মান ও সর্বোপরি কুরআন ও সুন্নাহর মানদণ্ডে উত্তীর্ণ গুণাবলিসম্পন্ন একদল সাহসী মানুষের। ছাত্র ইসলামী আন্দোলনের শীর্ষে অবস্থানকারী একটি সংগঠনের সিপাহসালার তথা শীর্ষ দায়িত্বশীল হিসেবে ড. মুহাম্মদ রেজাউল করিম দীর্ঘ অভিজ্ঞতার জীবনে অনেক কিছুই অবলোকন করেছেন। তিনি তার মেধা ও যোগ্যতার স্বাক্ষর রেখেছেন সংগঠন পরিচালনা, বক্তৃতা ও লেখনীর মাধ্যমে। তার লেখা বিভিন্ন পত্রপত্রিকা ও সাময়িকীতে অব্যাহতভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। একাধিক পুস্তকও প্রকাশিত হয়েছে, যা পাঠকমহলে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে। আমরা আশা করি বক্ষ্যমাণ পুস্তকটিও সর্বস্তরের পাঠকমহলে সমাদৃত হবে।

তার লেখা এ পুস্তকটি আমরা প্রকাশ করার সুযোগ পেয়ে সম্মানিত লেখক মহোদয় ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল ভাইদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

মহান আল্লাহর দরবারে তাদের সাফল্য কামনা করি। আল্লাহ আমাদের সকলের প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমিন!

বিনীত

তারিখ : নভেম্বর ২০১০ ইংরেজি

মুহাম্মদ আমীনুল ইসলাম

www.amarboi.org

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

- পাশ্চাত্য বনাম ইসলাম # ১৩
  - পশ্চিমারা চায় জিহাদমুক্ত ইসলাম # ১৫
- পাশ্চাত্যের হীনরাজনৈতিক স্বার্থে অপবাদ # ১৯
- ইসলামের পুনর্জাগরণে পশ্চিমাদের হতাশা # ২১
  - জার্মানি উইল বিকাম অ্যা ইসলামী স্টেট # ২৩
- ইসলাম নিয়ে পশ্চিমাদের উদ্বেগ # ২৬
- পাশ্চাত্য আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলছে # ২৯
  - পশ্চিমাদের মৌলবাদভীতি # ৩০
- ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের অন্তরালে ইসলাম বিমুখতা # ৩৩
  - ধর্মহীনতার আরেক নাম ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ # ৩৪
- সারাবিশ্বে পশ্চিমা মিডিয়ার বিষবাষ্প # ৩৬
  - ইসলাম ও মুসলমানের বিরুদ্ধে তথ্যসন্ত্রাস # ৩৭
- সমরকৌশলী রাসূল (সা.) ও আজকের পৃথিবী # ৪২
  - প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের চিত্র # ৪৩

দ্বিতীয় অধ্যায়

- মানুষ আল্লাহর মনোনীত প্রতিনিধি # ৪৫
  - দুনিয়া মুমিনের জন্য পরীক্ষাগার # ৪৫
  - মুমিনের জানমাল আল্লাহ খরিদ করেছেন # ৪৬
  - সংঘবদ্ধ জীবন ছাড়া ইসলাম নেই # ৪৮
- মানুষের মর্যাদা দিয়েছে ইসলাম # ৫১
- ইসলামের রাজনৈতিক শিক্ষা # ৫৫
  - আল্লাহর সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতেই মানুষের রাজনৈতিক জীবন # ৫৫
  - নবী-রাসূলদের জীবনে রাজনীতি # ৫৬
  - হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জীবনে রাজনীতি # ৫৮
  - আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোকে ইসলামী রাষ্ট্রের নমুনা # ৬০
  - ধর্ম ও রাষ্ট্রকে আলাদা করতে গিয়ে আল্লাহর আইন নির্বাসনে # ৬১
  - মেকিয়াভেলির ধর্মবিবর্জিত রাজনীতি # ৬৪
  - ইসলামের পূর্ণাঙ্গ রাজনৈতিক ব্যবস্থা # ৬৬

www.amarboi.org

তৃতীয় অধ্যায়

- জিহাদের শাব্দিক অর্থ ও পরিচয় # ৬৯
- জিহাদের পারিভাষিক অর্থ ও পরিচয় # ৭১
- জিহাদের প্রয়োজনীয়তা # ৭৪
  - জিহাদ আত্মরক্ষামূলক লড়াই নয় # ৭৫
  - মানুষের ওপর মানুষের প্রভুত্বের উৎখাত # ৭৮
- জিহাদের মর্যাদার কারণ # ৭৯
  - অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে লড়াই # ৮১
  - কাপুরুষ জাতির জন্য লাঞ্ছনা # ৮২
- জিহাদ, ধর্মযুদ্ধ ও চরমপন্থা # ৮৪
- আল-কুরআনে জিহাদের নির্দেশ # ৮৭
- জিহাদ প্রসঙ্গে হাদিসে রাসূল (সা.) # ৯৫
  - জিহাদ থেকে বিরত থাকার পরিণাম # ১০০
  - জিহাদ থেকে বিরত থাকলে কিয়ামতের পূর্বেই শাস্তি # ১০২
- জিহাদ সহনশীলতা ও পরমতসহিষ্ণুতা # ১০৭
  - শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই জিহাদ # ১০৮
- জিহাদ ও মানবপ্রেম # ১১২
- অকল্যাণ ও অরাজকতার মূলোৎপাটন # ১১৫
  - বেশির ভাগ ধর্মগ্রন্থে যুদ্ধের অনুমোদন # ১১৬
  - ইসলাম তরবারি দিয়ে ছড়ানো হয়নি # ১১৭
  - আমেরিকা ও ইংল্যান্ডে সবচেয়ে জনপ্রিয় ধর্ম হচ্ছে ইসলাম # ১১৯
- সামাজিক জীবনে আমর বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকারের মর্যাদা # ১২১
- জিহাদ ও সন্ত্রাসবাদ # ১২৫
  - জিহাদ ও সন্ত্রাস এক নয় # ১২৮

চতুর্থ অধ্যায়

- মুহাম্মদ (সা.)-এর ওপর সন্ত্রাস ও নির্যাতন # ১৩১
  - রাসূল (সা.)-এর কারাবরণ # ১৩৪
  - তায়েফে ইসলামের দাওয়াত ও নির্যাতন # ১৩৫
- রাসূল (সা.) এর বিরুদ্ধে নোংরা অপপ্রচার # ১৩৯
  - পদলোভের অভিযোগ # ১৪২
  - আন্দোলনের অভ্যন্তরে বিভ্রান্তি সৃষ্টি # ১৪৩
  - রাসূল (স) কে হত্যার ষড়যন্ত্র # ১৪৫

www.amarboi.org

- সাহাবীদের ওপর নির্যাতন ও শাহাদাত # ১৪৭-১৬১
  হযরত বেলাল (রা.), হযরত খাব্বাব (রা.), হযরত আম্মার (রা.), আম্মার ইবনে, হযরত ইয়াসির, হযরত হামজা (রা.)-এর শাহাদাত, জীবন্ত শহীদ হযরত তালহা (রা.), হযরত মুসআব (রা.)-এর শাহাদাত, হযরত হানযালা (রা.) এর শাহাদাত, হযরত আমর ইবনে জমুহ্ (রা.)-এর শাহাদাত, হযরত আনাস বিন-নযর (রা.)-এর শাহাদাত, ওসমান ইবনে মাজউন (রা.)-এর উজ্জ্বল ঈমান
  - আল্লাহর প্রেমে পাগলপারা # ১৬২
  - শাহাদাতের প্রেরণা # ১৬৩
- যুগে যুগে নির্যাতন # ১৬৪-১৬৬
  ইমাম আবু হানিফা (রহ), ইমাম মালেক (রহ), ইমাম হাম্বল (রহ), ইমাম ইবনে তাইমিয়া, সাইয়েদ কুতুব (রহ), সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী (রহ)

পঞ্চম অধ্যায়

- দুঃসাহসিকতার ইতিহাস যুগে যুগে # ১৬৭
  - ভাগ্যের ওপর বিশ্বাস # ১৬৭
  - বিপদের মূল্যায়ন # ১৬৮
  - বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত স্থাপন # ১৬৮
  - হযরত ওমর (রা.)-ইসলাম গ্রহণের আগে # ১৬৯
  - সত্যের পথে দৃঢ়তা # ১৭০
  - মুমিনের অস্ত্র আল্লাহর উপর ভরসা # ১৭০
  - আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর অসীম সাহসিকতা # ১৭১
  - ধৈর্যশীলদেরকে বে-হিসাব বিনিময় # ১৭১
  - হযরত যোবায়ের (রা.)-এর ঈমান # ১৭২
  - হযরত ওমর (রা.) ফারূক উপাধি পেলেন # ১৭৩
  - ওমর ফারূক (রা.)-এর অন্তরে সত্যের আলোক শিখা # ১৭৩
  - অত্যন্ত কঠিন পরীক্ষা # ১৭৫
  - ঈমানের পরীক্ষা হয় দুঃখ-কষ্ট ও মুসিবতের সময় # ১৭৮
  - রাসূলের অনুকরণীয় আদর্শ # ১৮০
  - আকাবার প্রথম বাইয়াত, আকাবার দ্বিতীয় বাইয়াত আকাবার শেষ বাইয়াত # ১৮০-১৮১
  - কা'বা জিয়ারতের সফর # ১৮২

www.amarboi.org

– কুরাইশদের সঙ্গে আলোচনা # ১৮২
– রিযওয়ানের শপথ # ১৮৩
– হুদাইবিয়া সন্ধির শর্তাবলি # ১৮৪
– হযরত আবু জান্দালের ঘটনা # ১৮৫
– হুদাইবিয়া সন্ধির প্রভাব # ১৮৫
– অগ্নিপরীক্ষার পয়লা ফায়দা # ১৮৭
– অগ্নিপরীক্ষার দ্বিতীয় ফায়দা # ১৮৮
– অগ্নিপরীক্ষা ও চরম সংঘাতের তৃতীয় সুফল # ১৮৯
– মানবরচিত মতাদর্শ কায়েমে কালজয়ী যারা, নেলসন ম্যান্ডেলা, অং সান সু চি, আর্নেস্তো চে গুয়েভারা # ১৯১-১৯৩
– বিশ্বব্যাপী নয়া ক্রুসেড # ১৯৪
– মুসলমানদের হাতে বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয় # ১৯৬
– বীর সালাহউদ্দীনের নেতৃত্ব # ১৯৮
– আজ সালাহউদ্দীনের মত নেতার প্রয়োজন # ১৯৯

ষষ্ঠ অধ্যায়

● ধৈর্য সাফল্যের চাবিকাঠি # ২০১
– সাহসী লোকের দরকার # ২০২
– ধৈর্যের সাথে বাধা বিপত্তির বিরোচিত মোকাবেলা # ২০৩
● নৈতিক চরিত্রই হাতিয়ার # ২০৬
– দৃঢ়তা ও সাহসিকতা ঈমানের অনিবার্য দাবি # ২০৭
– নিরপেক্ষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা # ২০৯
● আল্লাহ তায়ালার ওপরই তায়াক্কুল # ২১১
– ধৈর্য ও নামাজের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর # ২১৫
– মুমিনের জন্য আল্লাহর সাহায্য অবধারিত # ২১৯
– দাওয়াতে হকের বিরুদ্ধে চক্রান্তকারীদের চক্রান্ত সফল হবে না # ২২২
– সত্যের পথিকেরা যা দ্বারা শক্তি অর্জন করে # ২২২

www.amarboi.org

www.amarboi.org

প্রথম অধ্যায়

পাশ্চাত্য বনাম ইসলাম

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পৃথিবীতে সকল আম্বিয়ায়ে কেরামকে পাঠিয়েছেন সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য। এই কাজ করতে তারা সকলেই প্রাণান্তকর সংগ্রাম করেছেন। সংগ্রাম করতে গিয়ে তাদের সহ্য করতে হয়েছে অবর্ণনীয় জুলুম-নির্যাতন, কারাবরণ, দেশান্তর, এমনকি হত্যার মত জঘন্য কাজটিও সংঘটিত হয়েছে আল্লাহর মনোনীত এই ব্যক্তিদের কারো কারো জীবনে। কিন্তু তারা প্রত্যেকেই ছিলেন তাদের দায়িত্ব পালনে সদা অটল ও অবিচল। পৃথিবীর সকল শক্তি তাদের টলাতে পারেনি এক ইঞ্চি জমিন থেকে। আল্লাহ তায়ালা রাসূল প্রেরণের উদ্দেশ্য সম্পর্ক বলেন-

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

পৃথিবীতে সকল মানবরচিত মতাদর্শের ওপর ইসলামের বিজয় নিশ্চিত করাই ছিল তাদের দায়িত্ব। জীবন উৎসর্গের এই সংগ্রামই হলো জিহাদ। তাদের কালে প্রতিষ্ঠিত মানবরচিত সভ্যতাগুলোর বিরোধিতার একটিমাত্র কারণ ছিল যে, তারা প্রত্যেকেই ভালোভাবে জানত এক আল্লাহর হুকুম প্রতিষ্ঠিত হলে এর নেতৃত্ব চলে যাবে সত্যপন্থীদের হাতে। তাই সকল শক্তি নিয়োগ করেছিল এর বিরোধিতায়। পৃথিবীর শুরু থেকে আজ অবধি তা অব্যাহত।

আবু লাহাব, আবু জাহেল, ওতবা, শায়বা যে কূটকৌশলের নীতি অবলম্বন করেছিল, আজকে কালের পরিবর্তনে পাশ্চাত্যবাদীরা বিরোধিতার ধরন পাল্টিয়ে বিভিন্ন কায়দা-কানুনের পথ বেছে নিয়েছে বটে কিন্তু তাদের উভয়ের উদ্দেশ্য

www.amarboi.org

এক ও অভিন্ন। তারা কখনও মানবিক, কখনও বুদ্ধিভিত্তিক আবার কখনও মানবতার ধুয়া তুলে ইসলামের ওপর এই হামলা চালাচ্ছে। কিন্তু ক্ষমতা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখতেই সত্যপন্থীদের সাথে এই যুদ্ধ, বা 'নয়া ক্রুসেড' তাতে কোন সন্দেহ নেই। এই জন্য আজকে পশ্চিমাদের প্রধান টার্গেট ইসলাম ও মুসলমান।

পৃথিবীর ঠাণ্ডা লড়াইয়ের পরিসমাপ্তির পর পশ্চিমা মিডিয়া, গবেষক, চিন্তাবিদ ও নীতিনির্ধারক সংস্থাগুলোর মুখে মুখে সর্বদা একই আলোচনা শুরু হয়, কমিউনিজমের পর পশ্চিমাদের সামনে এখন নতুন চ্যালেঞ্জ (Political Islam) পলিটিক্যাল ইসলাম। পশ্চিমাদের বুদ্ধিগুরু হিসেবে খ্যাত স্যামুয়েল হান্টিংটনের 'দ্য ক্লাশ অব সিভিলাইজেশনস্' 'সভ্যতার দ্বন্দ্ব' তত্ত্বটি মৌলিকভাবে বার্নার্ড লুইস (Bernerd Lewis) এর আবিষ্কার নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এই তত্ত্বটির ফলে পশ্চিমা গবেষক ও চিন্তাবিদদের মন-মস্তিষ্কে এ কথা ছেয়ে গেছে, ইসলাম ও পশ্চিমাদের মাঝে দ্বন্দ্ব-সংঘাত অনিবার্য। আফগানিস্তান ও ইরাকে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক আক্রমণ, ধ্বংসলীলা ও জবর দখলের ঘটনা একই প্রেক্ষাপটে হয়েছে। পশ্চিমাদের আগামী দিনের সকল রণপ্রস্তুতি এখন এরই আলোকে।

বিশেষ করে আমেরিকার এগারই সেপ্টেম্বরের ঘটনার পর ইসলামে জিহাদের অর্থকে যুগপৎভাবে ধর্মযুদ্ধ এবং সন্ত্রাসবাদ হিসেবে বর্ণনা করা হচ্ছে। কোনো কোনো মুসলমান এ ষড়যন্ত্রটি না বুঝেই বিষয়টিকে অত্যন্ত চরমভাবে ব্যাখ্যা করছেন, আর পশ্চিমারা অনেককে বানাচ্ছে তাদের ক্রীড়নক। এক শ্রেণীর ভাড়াটিয়া লোক দিয়ে ও মিডিয়ার মাধ্যমে ভীতি ছড়ানোর কাজটি পশ্চিমারা অত্যন্ত সুকৌশলের সাথে সম্পন্ন করছে। অপরদিকে পাশ্চাত্য দেশগুলো ইসলামকে দীর্ঘদিন ধরে এবং উদ্দেশ্যমূলকভাবে এক ভুল চিত্রে চিত্রিত করছে। এ দুয়ের চরম অবস্থার ফলাফলই জিহাদের ভুল অর্থ সৃষ্টির অন্যতম কারণ। পাশ্চাত্যের গৃহীত রাজনৈতিক ধারণার ফলে ইসলাম এবং মুসলিম শব্দদ্বয়ের মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে তাও গুলিয়ে ফেলা হয়েছে। ফলে যে চরম অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তার পেছনে পাশ্চাত্যের বিবিধ জটিলতাও যে দায়ী তা অস্বীকার করা যায় না।[১] তা'ছাড়া পশ্চিমারা যে কিছু নামধারী অজ্ঞ মুসলমানকে অর্থ, অস্ত্র ও প্রশিক্ষণ দিয়ে তথাকথিত জিহাদী আবেগকে পুঁজি করে ইসলামের নাম ব্যাবহার

---

১ আসমা বারলাস, জিহাদ, ধর্মযুদ্ধ ও সন্ত্রাসবাদ অপব্যাখ্যার রাজনীতি।

www.amarboi.org

করে নিজেদের স্বার্থ হাসিল করছে এটা এখন কারোই অজানা নয়। বাংলাদেশেও এই এজেন্টরা তৎপর। লক্ষ্য ইসলামের পুনর্জাগরণ ঠেকানো। আমেরিকা 'চোরকে বলে চুরি কর, আর গৃহস্থকে বলে সজাগ থাক' এরপর বিচারের আসনেও তারই অবস্থান।

পশ্চিমারা অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায় ইসলামের পুনর্জাগরণ ঠেকানোর পথ ঠিক করে নিয়েছে, তার জন্য দরকার আশঙ্কামুক্ত ইসলাম আর রাষ্ট্রক্ষমতামুক্ত মুসলমান। এতে মুসলমানদের সংখ্যা যদি বর্তমানের চাইতে দ্বিগুণ হয় তাতেও কোন আশঙ্কা নেই যতটুকু সমস্যা আর উদ্বিগ্নতা ইরান, আলজেরিয়া, আর তুরস্কের মত মুসলিম উত্থিত রাষ্ট্রকে নিয়ে। এই ফলাফল নিশ্চিত করতে পশ্চিমাদের আবিষ্কার Political Islam- বা 'নিয়ন্ত্রিত ইসলাম'। আসল বা নির্যাস ছাড়া ইসলাম। রাজনীতিমুক্ত ইসলাম। যুদ্ধ, সংগ্রাম, বিপ্লব, চেতনাসত্তা ছাড়া ইসলাম। আর যে 'পলিটিক্যাল ইসলাম' ক্ষমতার বৃত্তকে ঘিরে ফেলে তাই হলো 'জিহাদ' তাই 'জিহাদমুক্ত ইসলাম' চাই, এটি নামধারী মুসলমানদের জন্যও কোন অসুবিধার নয়, বরং সুবিধার। এখানে পশ্চিমাদের সুবিধার আয়তন অনেক বিশাল ও বিস্তৃত। জিহাদমুক্ত পৃথিবীই আজ পশ্চিমাদের একমাত্র কাম্য। কারণ জিহাদের সিঁড়ি বেয়েই ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। যদি মুসলমানদের জিহাদের চেতনাকে কালো আবরণ দিয়ে ঢেকে দেয়া যায় তাহলেই সকল প্রচেষ্টা গুড়ে বালি। মুসলমানরা হবে অনেকটা দাঁতবিহীন ব্যাঘ্র।

পশ্চিমারা চায় জিহাদমুক্ত ইসলাম

পশ্চিমারা আজ মুসলমানদের কোন তৎপরতাকে এতটুকু ক্ষতিকর মনে করে না যতটুকু সমস্যা হিসেবে দেখে জিহাদকে। তাদের নিকট ইসলামী নেতৃত্বের পরিচালনায় ও ইসলামের আদর্শের ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালিত হওয়া অনেক বেশি বেদনার, উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার। এর রোধে কার্যকর প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে তিনটি Stage ঠিক করে নিয়েছে তারা তা হলো : Stage one is the crisis-সঙ্কট সৃষ্টি করা। Stage two is the demonization of the enemy leader-নেতাকে দানব হিসেবে তুলে ধরা, Stage three is the dehumanizing of the enemy as individual- ব্যক্তিগতভাবেও শত্রু মনুষ্যত্বহীন বলে প্রচার করা, Stage four is the atrocity stage- শত্রুর অত্যাচার ও নৃশংসতা ও নাশকতার গল্প তৈরি করা। যে গল্পের ডিজাইন পৃথিবীর সকল মুসলমানের জন্য অভিন্ন। স্থান-কালভেদে এর মুখোশ আলাদা আলাদা। অবশ্য বর্তমানে পশ্চিমাদের পরিকল্পনা

www.amarboi.org

অর্থবিত্তে পরিচালিত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তি ও সংস্থা বাংলাদেশেও ইসলাম ও ইসলামী আন্দোলনের বিরোধিতায় যথেষ্ট পারঙ্গম। ইসলামী দল ও নেতৃত্বের চরিত্র হননে যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিচ্ছে প্রতিনিয়ত। তারা এখন পশ্চিমাদের যোগ্য উত্তরসূরি।

ইসলামের জিহাদের বিধানের বিরুদ্ধে পশ্চিমাদের আরেকটি জিহাদ হলো মুসলমানদের মধ্যে জিহাদের প্রচেষ্টায় উজ্জীবিত ব্যক্তি, দল, গোষ্ঠীকে চিত্রিত করা, মৌলবাদ, সাম্প্রদায়িকতা, উগ্রবাদ, পশ্চাৎপদতা, জঙ্গিবাদ, নাশকতাকারী মানবতাবিরোধী, সেকেলে অনুন্নত ও অ-আধুনিক বলে ব্যাপকভাবে প্রচারণা চালানো।

তারই ধারাবাহিকতায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইসলাম ও পাশ্চাত্যের সম্পর্কবিষয়ক যেসব গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে দু'টি গ্রন্থ অতি গুরুত্বপূর্ণ। এক. আমেরিকা এন্ড পলিটিক্যাল ইসলাম (America and Political Islam), লেখক গ্যারজেস দুই. পলিটিক্যাল ইসলাম এন্ড দি ইউনাইটেড স্টেট (Political Islam and the United State), লেখক পিন্টো।[২]

উক্ত গ্রন্থদ্বয়ে ইসলাম সম্পর্কে মার্কিন শাসকদের দুই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাব ব্যক্ত করা হয়েছে। এক শ্রেণীর ধারণা ইসলাম যুদ্ধংদেহি। অপর শ্রেণীর ধারণা ইসলাম সমঝোতাপ্রিয়।

যারা ইসলমাকে যুদ্ধংদেহি মনে করেন তারা প্রকৃতিগতভাবেই ইসলামকে একনায়কতন্ত্রপ্রিয়, কট্টরপন্থী, গণতন্ত্রবিরোধী ও পাশ্চাত্য সভ্যতার পরিপন্থী মনে করেন। ফলে অনিবার্যভাবেই ইসলাম পাশ্চাত্য ও ইসরাইলের আজন্ম শত্রু। এই শ্রেণীর আমেরিকান নীতিনির্ধারকদের সিদ্ধান্ত হলো, প্রতিটি পর্যায়ে ইসলামকে প্রতিরোধ করা হবে এবং ইসলামী দেশগুলোর সেসব সরকারকে টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করা হবে, যারা পশ্চিমের রাজনৈতিক, ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্বার্থ সংরক্ষণে সচেষ্ট। তারা যতই ডিক্টেটর ও একনায়কতন্ত্রী হোক না কেন, তাদের অবশ্যই টিকিয়ে রাখতে হবে। তাদের ধারণা, মুসলিম বিশ্বের দেশগুলোতে যদি ইসলামী নেতৃত্ব রাষ্ট্রক্ষমতায় চলে আসে তাহলে আল্লাহর নামে গণতন্ত্র দাফন হয়ে যাবে। অন্য ভাষায় ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে পাশ্চাত্যের স্বার্থ বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

---

২ এডওয়ার্ড ডব্লিউ সাঈদ, কাভারিং ইসলাম, ঢাকা ঃ সংবেদ প্রকাশনী

www.amarboi.org

মার্কিন বুদ্ধিজীবী নোয়াম চমস্কি বলেন, বিশ্বের ওপর মার্কিন ব্যবস্থা তথা ইহুদি ব্যবস্থার নেতৃত্ব কর্তৃত্ব অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত হবে। এ ছাড়া আমাদের নিকট অন্য কোনো জিনিস মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়, আর না আমরা কোনো চ্যালেঞ্জের সাথে আপস করতে প্রস্তুত। বিশেষ করে অনৈক্য, অনিষ্ট ও ফিতনা-ফাসাদের আন্তর্জাতিক উৎস তথা জাতিপূজা দেশপূজা, ইসলামী মৌলবাদ, সন্ত্রাস ও গোষ্ঠীগত দ্বন্দ্ব কোনো মূল্যেই বরদাশত করা হবে না।[৩]

আমেরিকার আইনে সন্ত্রাসবাদের সংজ্ঞা মুসলিম দেশ ও জাতিকে লক্ষ্য রেখে ঠিক করা হয়েছে এভাবে-

"পূর্ব পরিকল্পিত, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত সহিংসতা যার লক্ষ্য অসামরিক স্থাপনা ও ব্যক্তির ধ্বংস সাধন। এ নাশকতার পেছনে থাকে কোন জাতীয় ক্ষুদ্রগোষ্ঠী অথবা সুপ্ত এজেন্ট যাদের উদ্দেশ্যের মধ্যে অন্যতম হলো মানুষের দৃষ্টিকে তাদের ওপর নেয়ার চেষ্টা করা।"

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ইহুদিদের ইসরাইল রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার প্রয়াসকে দুনিয়াব্যাপী একটি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন হিসেবে গ্রহণ করা হচ্ছে। অথচ প্যালেস্টাইনে ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবিটি একটি ধর্মীয় দাবি, খোদার সাথে তাদের কথিত চুক্তির ভিত্তিতে তারা তা দাবি করছে। এ দাবি মোটেই রাজনৈতিক দাবি হতে পারে না। অন্য দিকে প্যালেস্টাইনিদের রাষ্ট্র-সংগ্রামকে একটি ধর্মযুদ্ধ হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে। তাদের সংগ্রামকে উপনিবেশবিরোধী বলা হচ্ছে কিন্তু জাতীয়তাবাদী মুক্তিসংগ্রাম হিসেবে দেখা হচ্ছে না। তাদের ভূমি দাবির আন্দোলন পুরোটাই রাজনৈতিক। কোনভাবেই ধর্মীয় অধিকার বা ধর্মীয় স্বাধীনতার পক্ষে উত্থাপিত ইহুদিদের যুক্তির বিপরীতে নয়। এছাড়া অনেকেরই অভিমত, সন্ত্রাসবাদ ইহুদিদের সৃষ্ট এবং তাদের অন্তঃস্থিত কৌশল। অথচ প্যালেস্টাইনিরা দখলদারদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। এমনকি এ পথে তারা তাদের নিজেদের প্রাণ পর্যন্ত উৎসর্গ করছে। প্রাণ উৎসর্গ করার এ ধরনকে অনেক মানুষ 'ইসলামী সন্ত্রাসবাদের' রূপ হিসেবে চিহ্নিত করে এবং যেসব তরুণ-তরুণী নিজের প্রাণ উৎসর্গ করে তাদেরকে নৃশংস মানুষ হিসেবে চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে প্রচার করা হয়।[৪]

---

৩ তদেক

৪ ইউনাইটেড স্টেটস, কোড ২৬৫৬ (এফ)

www.amarboi.org

আমরা মোটেই দাবি করি না যে, মুসলিমরা সন্ত্রাসী হতে পারে না বরং সন্ত্রাসবাদের সাথে ইসলামকে চিত্রিত করা নিয়ে আমাদের বিরোধিতা। ইসলাম এবং মুসলিমরাই সন্ত্রাসবাদের একমাত্র আলোচ্য হওয়ার এর বাইরে যারা সন্ত্রাসবাদে লিপ্ত তারা আড়াল হয়ে যাচ্ছে। প্যালেস্টাইন, কাশ্মীর ইস্যু যা মূলত তাদের নিজ ভূমির অধিকার আদায় এবং সম্পূর্ণভাবে একটি সেক্যুলার ইস্যু। অথচ প্যালেস্টাইনি আত্মনিবেদিত যোদ্ধাদের চিহ্নিত করা হচ্ছে ধর্মীয় উগ্রপন্থী হিসেবে। এরা ইসরাইলি নৃশংসতা এবং অমানবিকতার বিরুদ্ধে শেষ পথ হিসেবে যে আত্মোৎসর্গের পথে পা বাড়িয়েছে সে বিষয়টির প্রতি কারো কোন উপলব্ধি জাগ্রত হচ্ছে না। অবস্থাটি এমন হয়েছে যে, কে আসল নির্যাতনকারী আর কে নির্যাতিত তা নির্ণয় ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। উপনিবেশ আমলে সে সন্ত্রাস এবং সহিংসতা ছিল সে কথাও মানুষ ভুলে গেছে।

www.amarboi.org

পাশ্চাত্যের হীনরাজনৈতিক স্বার্থে অপবাদ

পাশ্চাত্য নিজের আয়নায় চেহারা না দেখে, কাচের ঘরে বসে ঢিল ছুড়ছে। যাদের ইতিহাস বলতে ছিল অজ্ঞতা, অন্ধকার আর অসভ্যতায় ভরা, যাদের সভ্য বানানোর দায়িত্ব পালন করেছে মুসলমানরা। মুসলমানদের জ্ঞানের আলোয় যারা অন্ধকার থেকে মুক্তি লাভ করেছে। তারা এতটাই প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়েছে ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে দ্বিধা করেনি। ওরা এখন ইসলামকে গণতন্ত্র ও মানবতাবিরোধী ও মধ্যযুগীয় এবং চরমপন্থী ও অসহিষ্ণু বলছে। অথচ এই সেদিন মাত্র ১৯৪৮ সালে ওরা জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে মানবাধিকার আইন পাস করান। অন্য দিকে সেই ৬১০ খ্রিষ্টাব্দে ইসলামের মহানবী (সা.) ঘোষণা করেছেন যে, বংশ, বর্ণ, জাতি নির্বিশেষে সব মানুষ সমান। শুধু ঘোষণা করা নয়, তাঁর এবং খিলাফতে রাশেদার আমল এই ঘোষণা বাস্তবায়নের স্বর্ণযুগ ছিল। অহঙ্কারে-অন্ধ ওরিয়েন্টালিস্টরা যুদ্ধবন্দীদের অধিকার সম্পর্কে বিশ শতকের মাঝামাঝি আইন বিধিবদ্ধ করেন, অথচ ৬২৪ খ্রিষ্টাব্দে ইসলামের মহানবী (সা.) বদর যুদ্ধের পর যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে বিধিনিয়ম নির্ধারণ করেন যে, বিজয়ী সৈনিকরা না খেয়েও যুদ্ধবন্দীদের খাওয়াবেন। মাত্র ১৮৬৩ সালে এসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দাসত্বপ্রথা বন্ধ হয়। এই বন্ধ করার আইন পাস করতে যে গৃহযুদ্ধ হয়েছিল, তাতে সোয়া ৬ লাখ মানুষ নিহত হয়। অথচ সাড়ে তের শ' বছর আগে ইসলামের নবী (সা.) দাসপ্রথা বিলুপ্তির সূচনা করেন এবং দাসরা মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত তার খাওয়া, পরা ইত্যাদি সংক্রান্ত অধিকার তার মালিকের সমপর্যায়ে হবে।[৫]

বর্তমান যুগে ইউরোপ স্বীয় হীনরাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার মানসে ইসলামের বিরুদ্ধে কতকগুলো অপবাদ রটনা করেছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় ও সবচেয়ে জঘন্য অপবাদ হলো এই যে, ইসলাম একটা রক্ত পিপাসু, হিংস্র ও নরখাদক ধর্ম। নিজের অনুসারীদেরকে সে হত্যা ও রক্তপাতের শিক্ষা দেয়। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, এ অপবাদের জন্ম হয়েছে ইসলামের সূর্য অস্তাচলে যাওয়ার অনেক পর। সত্য বলতে কী, এই উদ্ভট ধারণাটির প্রচার যখন আরম্ভ হয়েছে তখন ইসলামের তরবারিতে মরিচা ধরে গিয়েছিল। আর অপবাদ রটনাকারী ইউরোপের শাণিত তরবারি নিরীহ মানুষের রক্তে রঞ্জিত হচ্ছিল।

---

৫ আবুল আসাদ, খোলাফায়ে রাশেদা সেমিনার প্রবন্ধ।

www.amarboi.org

তাদের সামনে এ প্রশ্নও উত্থাপন করার প্রয়োজন ছিল যে, আজ ইউরোপীয় পণ্ডিত ও ইতিহাসবেত্তাগণ যে চুলচেরা তত্ত্বানুসন্ধান চালিয়ে ইসলামের তথাকথিত কলঙ্ক উদঘাটনে ব্যস্ত হয়ে পড়ছেন, সেটা আসলে শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা নয়তো? তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল যে, নিজেদের সাম্রাজ্যবাদী হত্যাযজ্ঞের ফলে বিশ্ববাসীর মনে যে আক্রোশ ও বিক্ষোভ ইউরোপীয়দের বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত হয়েছে সেই আকাশের গতি ইসলামের দিকে ফিরিয়ে দেয়াই এর উদ্দেশ্য কি না?

বস্তুত মানুষ যখন রণাঙ্গনে পরাজিত হয় তখন শিক্ষাঙ্গনও পরাভূত হয়, তরবারির কাছে পর্যুদস্ত হলে কলমের কাছেও করে আত্মসমর্পণ। এটা তার স্বাভাবিক দুর্বলতা। এ দুর্বলতার কারণেই প্রত্যেক যুগে পৃথিবীতে 'অসি আর মসি' এ দুটো শক্তি কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলেছে। যে হাতের তরবারি বিজয়ী হয়েছে, সেই হাতের লেখনীরও বিজয় সূচিত হয়েছে, অস্ত্রবলে বলীয়ান যারা তারাই চিন্তা ও আদর্শের জগতেও পরাক্রান্ত ও প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে। একই কারণে ইউরোপ জিহাদের ব্যাপারেও বিশ্ববাসীর চোখে ধুলো দিতে সক্ষম হয়েছে। আর বিশ্বের দাসমনোভাবসম্পন্ন জাতিগুলোও ইসলামী জিহাদ সম্পর্কে ইউরোপীয় দৃষ্টিভঙ্গিকে এমন অম্লান বদনে মেনে নিয়েছে যে, অমনভাবে তারা কোন ঐশী বাণীকেও বোধ হয় কখনো গ্রহণ করেনি।[৬]

গান্ধীজীর মত ব্যক্তিত্ব যিনি হিন্দু জাতির মধ্যে সবচাইতে পরিপক্ব বুদ্ধির অধিকারী, তিনিও এ প্রচারণা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বলতে থাকেন যে, ইসলাম এমন পরিবেশে জন্মলাভ করেছে যে, তার চূড়ান্ত শক্তির উৎস আগেও তরবারি ছিল এখনও তরবারিই আছে।'

১৯৯৬ সালের মার্চে মিসরের বন্দরনগরী শারম আল শেইখে বিরাট এক আন্তর্জাতিক সম্মেলন ডাকা হয় সন্ত্রাস নিয়ে আলোচনার জন্য, যার তৎকালীন নমুনা হিসেবে নেয়া হয় ইসরাইলি নাগরিকদের ওপর পরিচালিত তিনটি আত্মঘাতী বোমা হামলা। আমেরিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন, ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী শিমন পেরেজ, প্রেসিডেন্ট হোসনী মোবারক এবং চেয়ারম্যান ইয়াসির আরাফাতসহ বহু রাষ্ট্রনায়ক এতে অংশগ্রহণ করেন। পেরেজ তার বক্তৃতার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মনে এক ফোঁটা সন্দেহ ধারণেরও অবকাশ রাখেননি যে, এ সবের জন্য একমাত্র দায়ী হলো ইসলাম এবং ইরানের ইসলামী প্রজাতন্ত্র। প্রচারমাধ্যমেও তার প্রচারণায় তেমন সন্দেহ পোষণের ফাঁক রাখেনি।

---

৬ মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী, আল জিহাদ, ঢাকা ঃ আধুনিক প্রকাশনী।

www.amarboi.org

ইসলামের পুনর্জাগরণে পশ্চিমাদের হতাশা

পাশ্চাত্য তাদের সকল শক্তি নিয়োগ করেছে ইসলামের বিরুদ্ধে। বিশ্বব্যাপী মুসলিম পুনর্জাগরণের আন্দোলনসমূহ ১৯৩০ সালের পর থেকে তৃণমূল পর্যায়ে দারুল ইসলাম, তথা ইসলামকে রাজনৈতিক কর্মসূচিতে স্থান দিয়েছে। হাসান আল বান্না কর্তৃক সঠিক মিসরীয় মুসলিম ব্রাদারহুডের মতো সংগঠনসমূহ এবং তাদের প্রচারকরা যেমন, সৈয়দ কুতুব, আবুল আলা মওদূদী-র জামায়াতে ইসলামী ও মোহাম্মদ আল গাজালী, আল্লামা ইকবাল হচ্ছেন এর সাধারণ উদাহরণ। ফলে দিশেহারা পশ্চিমারা।

এই অগ্রগতি যা কি না মুসলিম বিশ্বে এবং সাধারণভাবে বলতে গেলে সমগ্র পৃথিবীতে 'মৌলবাদী হুমকি' বলে বিবেচিত হয়, তা ইসলামকে গত পঁচিশ বছরে গণমাধ্যমে সবচেয়ে আলোচিত বিষয়ে পরিণত করেছে।

অভিবাসনকারী মুসলিম এবং স্থানীয় মুসলিমরাই এই ভয়ের জন্ম দিয়ে থাকে, যাদের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে প্রায় সর্বত্রই। ১৯৯১ সালে পশ্চিমা সূত্রের দেয়া তথ্য অনুযায়ী আমেরিকা এবং জার্মানিতে এখন প্রায় ২০ লক্ষ মুসলিমের বসবাস। ব্রিটেনের মুসলিম জনসংখ্যা প্রায় ১০ লক্ষ আর ফ্রান্সের হচ্ছে ২৫ লক্ষ। মোট মুসলিম জনসংখ্যা হচ্ছে ৯৯০,৫৪৭,০০০ রক্ষণশীলভাবে তৈরি সংখ্যা যদিও, তবু এ সংখ্যাই অনেক বড় এবং দুশ্চিন্তার জন্ম দিয়েছে।[৭]

তাই Los Angeles, I Moscow থেকে শুরু করে Rome এবং Zagreb, পৃথিবীর সর্বত্রই মসজিদের উন্মেষ ঘটছে। উমাইয়া খলিফাদের এক কালের অবস্থান Cordobaতে, ১৯৯৪ সালে স্প্যানিশ মুসলিমরা Al-Andalusia-এর Averroes [আবু রুশদ] আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছে। Cordoba-র অদ্ভুত সুন্দর সেই পুরনো মসজিদের কাছেই, আবার মুয়াজ্জিনের আজান শোনা যাচ্ছে। স্পেনের মাটি থেকে শেষ মুসলিমটিকে বিতাড়িত করার পাঁচ শ' বছর পর এই ঘটনা- কী সাংঘাতিক উসকানি।

বর্তমানে সারা বিশ্বে যে ইসলামই একমাত্র বিস্তার লাভকারী ধর্ম-এ সব তারই উপসর্গ। দিল্লিতে বসে ১৯৩৪ সালে লেখা, Islam at the crossroad বইতে Muhammad Asad (মৃত্যু ১৯৯২) তখনি ইসলামের ঊর্ধ্বগতি সম্বন্ধে তাঁর অবাক করে দেয়া ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। Salafiyah ধারায় পশ্চিমের অনুকরণ না করে বা পশ্চিমের কাছে কৈফিয়ত না দিয়েই Asad পশ্চিমা সভ্যতার ক্ষয়িষ্ণু

---

৭ The Five Tracts of Hassan al-Banna

www.amarboi.org

(সোভিয়েট ইউনিয়নসহ) বস্তুবাদের বিপরীতে ইসলামকে এক পরিপূর্ণ এবং সুস্থ বিকল্প হিসেবে বর্ণনা করেন।

নাস্তিক ধর্মতান্ত্রিক পশ্চিম এবং একই পর্যায়ের নাস্তিক, অথচ কমিউনিস্ট প্রাচ্যের মাঝে বিশ্বজনীন দ্বন্দ্বের ফলশ্রুতিতে তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেকে অবশ্যম্ভাবী মনে করেছিলেন। তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে তাদের মাঝের বৈরীভাব উভয় পক্ষের মাঝে বিপর্যয় ডেকে আনবে-তাঁর ভাষায় "পশ্চিমা সভ্যতার বস্তুবাদী আত্মতৃপ্তি পশ্চিমা জগৎকে এমন ভয়ঙ্কর পর্যায়ে নিয়ে যাবে, যে এর জনসাধারণ আবারো আধ্যাত্মিকতার সত্য খুঁজতে শুরু করবে এবং তখন হয়তো ইসলামের সকল প্রচার সম্ভব হতে পারে।"

ধ্বংস হয়ে যাবার পরিবর্তে যখন পশ্চিমাজগৎ, দুই পরাশক্তির শিবিরে বিভক্ত হয়ে গেল, তখন মনে হয়েছিল, আগামী বহু দশক এরা ভারসাম্য রক্ষা করে চলবে। আর ঐ পটভূমিতে ষাট বছর পূর্বের Muhammad Asad-এর ভবিষ্যৎ কল্পচিত্রও অবাস্তব মনে হয়েছিল।

১৯৯০ সালের পর থেকে কমিউনিস্ট আদর্শ এবং ব্যবস্থার দেউলিয়াপনা দেখে, এবং আধ্যাত্মিক চেতনা তথা মূল্যবোধ সঙ্কটে আক্রান্ত পশ্চিমের বিপজ্জনক পাপাচার দেখে, আজ আমরা জানি যে Muhammad Asad-ই সঠিক ছিলেন-কেননা খ্রিষ্টধর্ম কার্যত নিজের মূল্যবোধের পরিবর্তনের এক ক্রান্তিলগ্ন অতিক্রম করছে। আর তথাকথিত "আধুনিকতা প্রকল্প" তো আমাদের চোখের সামনেই ভেঙে পড়ছে।[৮]

পশ্চিমা ধর্মতাত্ত্বিক এবং বৈজ্ঞানিকরা এরই মাঝে, তাদের ধ্যান-ধারণার ভিত্তি আদৌ বহাল রয়েছে কি না, তাই সন্দেহ করতে শুরু করেছেন।

যেমন মার্কিন রিপাবলিকান পার্টির প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী মি. প্যাট্রিক বুকানন* তাঁর 'পাশ্চাত্যের মৃত্যু' নামক গ্রন্থে লেখেন, '২০৫০ সাল পর্যন্ত আমেরিকার অবস্থা বর্তমান তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোর মতো হয়ে যাবে। সে সময় আসল ইউরোপীয়দের সংখ্যা কেবল ১০ শতাংশ হবে। তাদের মধ্যে আবার এক-তৃতীয়াংশ এমন হবে যাদের বয়স হবে ষাটের উর্ধ্বে। জাপানের অস্তিত্বও পশ্চিমাদের মতো নির্মূল হয়ে যাবে। কারণ জাপানে মানবজন্মের হার ইউরোপ-আমেরিকার মতোই ভয়াবহ আকারে হ্রাস পাচ্ছে। মি. বুকানন তাঁর গ্রন্থে বর্তমান সামাজিক ও নৈতিক দৃষ্টিকোণের আলোকে একটি জরিপ পেশ করেছেন,

---

৮ মুরাদ উইলফ্রেড হফম্যান, Islam 2000

www.amarboi.org

তাতে তিনি বলেছন, ২০৫০ সাল নাগাদ ইউরোপের জনসংখ্যা হ্রাস পেয়ে তা সর্বমোট ১৩৫ মিলিয়নে গিয়ে দাঁড়াবে। তার মধ্যে ২৩ মিলিয়ন জনসংখ্যা, হ্রাস পাবে জার্মানির। রাশিয়ার ৩০ মিলিয়ন এবং ইতালি ১৩ মিলিয়ন হ্রাস পাবে। রাশিয়ার জনসংখ্যা বিপুল পরিমাণে হ্রাস পাবে এবং সেখানে মুসলমানদের সংখ্যা উদ্বেগজনক হারে বৃদ্ধি পাবে।

জার্মানি উইল বিকাম অ্যা ইসলামী স্টেট

মুসলমানদের ক্রমবর্ধমান সংখ্যা বিবেচনা করে চ্যান্সেলর এঙ্গেলা মার্কেল মন্তব্য করেছেন, জার্মানি একদিন ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত হবে এবং ডয়েসল্যান্ডে ইসলামের সবুজ অর্ধচন্দ্র পতাকা উড়বে। চ্যান্সেলর এঙ্গেলা মার্কেলের উদ্ধৃতি দিয়ে দৈনিক ফ্রাঙ্কফার্টার আলজেমেইন জেইটাং এ 'জার্মানি উইল বিকাম অ্যা ইসলামী স্টেট' শিরোনামে এক খবরে বলা হয়, মুসলিম অভিবাসীরা কিভাবে জার্মানির রূপান্তর ঘটিয়েছে জার্মানরা তা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছে। তিনি বলেন, জার্মানদের দেশব্যাপী গির্জার চেয়ে আরো বেশি মসজিদের অস্তিত্ব মেনে নিতে হবে। এ দৈনিকের সঙ্গে আলাপকালে চ্যান্সেলর মার্কেল আরো বলেন, আমাদের দেশে পরিবর্তন ঘটতে যাচ্ছে এবং জার্মান সমাজকে মুসলিম অভিবাসীদের সঙ্গে মিলেমিশে বাস করতে হবে। অভিবাসীদের সঙ্গে মিলেমিশে বাস না করায় বছরের পর বছর আমরা নিজেদের সঙ্গে নিজেরা প্রতারণা করেছি। উদাহরণস্বরূপ, মসজিদগুলো আগের চেয়ে আমাদের শহরগুলোর আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হতে যাচ্ছে। জার্মানির কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বোর্ডের অন্যতম সদস্য বুন্ডেসব্যাঙ্ক থিলো সারাজিনের একটি মন্তব্যে সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোয় সে দেশে বিতর্ক শুরু হয়। তিনি অভিযোগ করেন, তুর্কি ও আরব অভিবাসীরা জার্মান সমাজে একাকার হতে পারেনি এবং মুসলমানদের উচ্চ জন্মহারে জার্মানি ভারাক্রান্ত হয়ে উঠছে। কিন্তু চ্যান্সেলর এঙ্গেলা মার্কেল তার সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেন। তার এ মন্তব্য হচ্ছে প্রথম আনুষ্ঠানিক স্বীকারোক্তি যে, অন্যান্য ইউরোপীয় দেশের মতো জার্মানিও একদিন ইসলামী দেশে পরিণত হবে। তিনি স্বীকার করেন, জার্মানি শিগগির ইসলামের একটি শক্ত ঘাঁটিতে পরিণত হবে। জার্মানিতে মুসলমানদের সংখ্যা ৫০ লাখ।[৯]

মি. বুকাননের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ইউরোপের জনসংখ্যা হ্রাসের ওপর নিয়ন্ত্রণ লাভের জন্য তার সামনে মাত্র দু'টি রাস্তাই খোলা আছে। এক. বেকারত্ব ও স্বাস্থ্যগত সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য তারা যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করছে তা

৯.সাপ্তাহিক সোনার বাংলা।

www.amarboi.org

নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এবং অবসরপ্রাপ্তদের পেনশন কমিয়ে দিতে হবে। দুই. আরব বিশ্ব থেকে লাখে লাখে আরবদের নিয়ে এসে ইউরোপে পুনর্বাসন করতে হবে, যাতে তাদের অর্থনৈতিক সচ্ছল অবস্থা বহাল থাকে।

মি. বুকানন ইসরাইল সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করে বলেছেন, ২০৫০ সাল নাগাদ ফিলিস্তিনিদের সংখ্যা ১৫ মিলিয়নে গিয়ে দাঁড়াবে। অর্থাৎ ইহুদিদের দ্বিগুণ হয়ে যাবে, যা তাদের কোমর ভাঙার জন্য যথেষ্ট। বর্তমানের ইন্তেফাদা আন্দোলনের কারণে যেভাবে ইসরাইলিরা তাদের বসতি ছেড়ে ফিলিস্তিন থেকে পলায়ন করছে তা আগামীতে আরো ভয়াবহ আকার ধারণ করবে।[১০]

আমেরিকায় ৩০ বছরের মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা ইহুদিদের ছাড়িয়ে যাবে বলে গত শতাব্দীর শেষের দিকে আশঙ্কা করা হয়েছিল। আঠারো বছর আগে আমেরিকার ম্যাসাচুসেট্স বিশ্ববিদ্যালয়ে এক সিম্পোজিয়ামে এই ইঙ্গিত দেয়া হয়। একটি গবেষণার ফলাফলের ওপর ১৯৮৮ সালের প্রথম দিকে অনুষ্ঠিত ওই সিম্পোজিয়ামে আমেরিকান মুসলমানদের সংখ্যা নিরূপণ করা হয়েছিল ৪৬ লাখ ৪৪ হাজার। ওই সময় আমেরিকায় ৬০০টি ইসলামিক সেন্টার ছিল। তৈরি হচ্ছিল বিশাল আকৃতির নতুন নতুন মসজিদ ও ইসলামিক বিদ্যালয়। গবেষণার উদ্ধৃত দিয়ে বলা হয় যে খ্রিষ্টান ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করা এবং নতুন মুসলমান অভিবাসীদের আগমন ও এদের মধ্যে উচ্চ জন্মহারের ফলে মুসলমানদের সংখ্যা ইহুদিদের ছাড়িয়ে যাবে এবং খ্রিষ্টানদের পরে মুসলমানরা হবে আমেরিকার দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্মীয় সম্প্রদায়।

টাইম ম্যাগাজিনের ওই লেখায় এটাও জানানো হয় যে স্থানীয়ভাবে মুসলমানদের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। মুসলমানদের প্রতি ধর্মীয় সহনশীলতাও বাড়ছে। যেমন মিশিগান রাজ্যের ডিয়ারবোর্নে মোট অধিবাসীদের ১০% থেকে ১৫% আরবীয়। এখানকার পাবলিক স্কুলসমূহে শুক্রবার সাপ্তাহিক ছুটি হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে এবং ক্যাফেটেরিয়ায় শূকরের মাংস পরিবেশন বন্ধ করা হয়েছে। মুসলিম ছাত্রীরা আলাদা ক্লাসে সাঁতার শিখতে পারে ও জিমনেসিয়ামে পা সমান লম্বা স্লাক্স পরতে পারে।

ইউরোপের কয়েকটি দেশে এখন বোরকা পরা তো দূরের কথা, মাথায় কোন ঘোমটা দেয়া নিষিদ্ধ। স্কুলে মেয়েদের স্কার্ফ পরা বন্ধ। কয়েকদিন আগে আটলান্টার ডগ্লাসভিল সিটিতে আদালত প্রাঙ্গণে ঢোকার সময় মাথা থেকে স্কার্ফ খুলে ফেলতে অস্বীকার করায় একজন কালো আমেরিকান মুসলিমকে গ্রেফতার

---

১০ নজরুল হাফীজ নদভী, পশ্চিমা মিডিয়ার স্বরূপ, ঢাকা।

www.amarboi.org

করে বিচারকের সামনে হাজির করা হলে তিনি ওই মহিলাকে আদালত অবমাননার দায়ে ১০ দিনের কারাবাসে পাঠিয়ে দেন। অথচ জর্জিয়ার অ্যাটর্নি জেনারেল উল্লেখ করেন থার্বাট বাকেরের মুখপাত্র কেলেই জ্যাকসন মন্তব্য করেন যে স্টেট আইনে স্কার্ফ পরা অনুমোদন বা নিষিদ্ধ করা হয়নি। ওয়াশিংটনভিত্তিক 'কাউন্সিল অন আমেরিকান-ইসলামিক রিলেশন' নামক একটি সংগঠন ফেডারেল কর্তৃপক্ষকে এ ব্যাপারে অনুসন্ধানের জন্য আবেদন করলে অবিশ্বাস্যভাবে ভ্যালেনটাইন মুক্তি পান। "আমি শুধু উপলব্ধি করলাম যে আমার মানবিক ও নাগরিক অধিকার কেড়ে নেয়া হলো" মন্তব্য করেন ভ্যালেনটাইন ।

বুশ ও ব্লেয়ারের এই যৌথ প্রচেষ্টার পরও মুসলমানদের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। এমনকি ২০০১ সালের ৯/১১ ঘটনার এক বছরের মধ্যেই আমেরিকাতে মুসলমানদের সংখ্যা ৩০ হাজার এবং ইউরোপে বিশ হাজারেরও অধিক বৃদ্ধি পায়। নির্মিত হচ্ছে নতুন নতুন মসজিদ। গত জুন মাসে বোস্টন শহরে নবনির্মিত মসজিদে ২,০০০ মুসলিম নামাজ আদায় করলেন। ইসরাইলের সমর্থকদের ও মিডিয়ার বিরোধিতা এবং আদালতে মামলা দায়েরের ফলে এই মসজিদ নির্মাণ সমাপ্তিতে বিলম্ব হয়। তাদের অভিযোগ ছিল যে মসজিদ চরমপন্থীদের সহায়তার জন্য দায়ী ।

এই অভিযোগ মানহানিকর অভিহিত করে এর বিরুদ্ধে বোস্টন ইসলাম সোসাইটি মামলা দায়ের করে জয়ী হয়। ফ্রান্সেও সত্তর দশকে ৫০টি নামাজের ঘর থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৩ সালে ১৫২৫ টিতে দাঁড়ায় এবং মসজিদ হিসেবে ব্যবহারের জন্য ১০০টি ভবন নির্মিত হয়। বর্তমানে উভয় মিলে আরো ৭০টি বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্রিটেনে গত ২০ বছরে মসজিদ ও নামাজের ঘরের সংখ্যা ৪০০ থেকে ১৬৯৯টিতে বৃদ্ধি পেয়েছে। বার্লিনে এই সংখ্যা ছিল ১৯৯৮ সালে ৬৬টি এবং ২০০৬ সালে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৭৬টি। দি ইকোনমিস্ট পত্রিকার মতে, পশ্চিমা দেশসমূহে মসজিদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ দুর্বল হয়ে পড়ছে।

পশ্চিমাদের ইসলামভীতি এখন প্রকাশ্য। এক দিকে নিজেরা জন্মনিয়ন্ত্রণ করছে আর অন্য দিকে মুসলমানদের নিয়েও তাদের উদ্বেগ উৎকণ্ঠার যেন শেষ নেই।

আল্লামা ইকবালের ইসলামের বিজয়গাঁথা রচনা

"চীন আমাদের আরব আমাদের,
ভারতবর্ষও আমাদেরই দেশ,
আমরা মুসলমান তাই সমগ্র
বিশ্বেই হচ্ছে আমাদের স্বদেশ।"

www.amarboi.org

ইসলাম নিয়ে পশ্চিমাদের উদ্বেগ

বিংশ শতাব্দীর প্রধান প্রধান রাজনৈতিক মতাদর্শের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল উদারনীতিবাদ, সমাজতন্ত্র নৈরাজ্যবাদ, মার্কসবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, সামাজিক গণতন্ত্র, রক্ষণশীলবাদ, জাতীয়তাবাদ ফ্যাসিজম খ্রিষ্টীয় গণতন্ত্র, বাণিজ্যতন্ত্র ইত্যাদি। এ সকল কিছুরই কিন্তু উদ্ভব ঘটেছে পাশ্চাত্য বিশ্বে। অথচ বিশ্ব এখন পশ্চিমাবলয়ের বাইরের পানে ছুটে চলেছে। পশ্চিমা সভ্যতার ধারক ও বাহক হিসেবে পরিচিত আদর্শগুলো বিশ্বের ওপর প্রভাব বিস্তারের প্রশ্নে দিন দিন শক্তিহীন হয়ে পড়ছে। আর ধর্মীয় ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক বিষয়গুলো তার স্থান দখল করে চলেছে। এভাবে অপাশ্চাত্য বিশ্ব তাদের আপন প্রভাব প্রতিপত্তি ও পরিচয় প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছে। ওয়েস্টফালিয়ন (Westphalia) অনুযায়ী আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে ধর্মনিরপেক্ষ করার বা অন্য ভাষায় আন্তর্জাতিক রাজনীতি থেকে ধর্মকে বাদ দেয়ার প্রচেষ্টা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়ে পড়ছে এবং পাশ্চাত্য সভ্যতা প্রায় নিঃশেষ হতে চলেছে।

ধর্মকে রাজনীতিমুক্ত করাতো দূরের কথা ধর্মের প্রভাব দিন দিন শক্তিশালী হয়ে উঠছে। বাংলাদেশেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। কেননা মুসলমানদের এখন বোকা বানিয়ে ধর্মান্ধতা, আর সাম্প্রদায়িকতার ধুয়া তুলে ধর্মবিমুখ করা অনেকটাই অসম্ভব। এত দিন ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ রাম-বামরা বাংলাদেশে কিছুটা সফল হয়েছে, কারণ রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলামী আদর্শের আলোকে সততার কোন নমুনা দৃষ্টান্ত ছিল না। কিন্তু বিগত দিনে ২০০১-২০০৬ পর্যন্ত সরকার পরিচালনায় বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর শীর্ষ দুই নেতার সফল মন্ত্রিত্ব ও নেতাকর্মীদের নিঃস্বার্থ ও নির্লোভ অংশগ্রহণের মাধ্যমে দেশের মানুষ সততা, দক্ষতা ও দেশপ্রেমের উজ্জ্বল নজির প্রত্যক্ষ করেছে। তাদের সফল নেতৃত্ব দেশের মানুষকে আশ্বস্ত করেছে যে আজও দুর্নীতি, অপরাজনীতি, ও অপসংস্কৃতিমুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তোলা সম্ভব। ইসলামী আন্দোলনের এই গ্যারান্টিপূর্ণ চ্যালেঞ্জ দেশে সেক্যুলারপন্থী গোটা শিবিরকে দিশেহারা করে তুলেছে। ফলে তারা বেছে নিয়েছে ইতিহাসের জঘন্যতম নির্যাতনের পথ। প্রতিনিয়ত চলছে হত্যা, গুম, জুলুম, নির্যাতন, গ্রেফতার, হামলা ও মামলা। গোটা দেশই এখন কারাগার। এখানে রিমান্ডের যা নির্যাতন ইরাকের আবুগারিব কারাগারকেও হার মানায়। পশ্চিমারা ইরাক ও আফগানিস্তানের মত এখানেও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের লেবাসে একই প্রেসক্রিপশন শুরু করেছে। দক্ষিণ এশিয়ার টাস্কফোর্সের নামে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মত এ দেশকে নিয়ন্ত্রণ করার এক গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত।

www.amarboi.org

অন্য দিকে তার স্থলে ধর্ম জোরদার হচ্ছে।

ধর্মের প্রভাব দিন দিন শক্তিশালী হচ্ছে তাই এডওয়ার্ড মরটিমার বলেন, ধর্ম ক্রমাগত আন্তর্জাতিক বিষয়াদির ওপর কর্তৃত্ব ও প্রভাব বৃদ্ধি করছে। বিশ্বে এখন বিভিন্ন মতাদর্শের মধ্য দ্বন্দ্ব-সংঘাতের আর তেমন সুযোগ নেই। কারণ, রাজনৈতিক মতাদর্শ এখন গৌণ বিষয়। কিন্তু তার স্থলে বিশ্ব বিভিন্ন সভ্যতার ও তার অন্তরস্থ ধর্ম ও সংস্কৃতির মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

টেবিল ৩.৩

প্রধান প্রধান ধর্মের ভিত্তিতে বিশ্বের জনসংখ্যা বিভাজন (শতকরা হিসাব)

ধর্ম	বছর				
	১৯০০	১৯৭০	১৯৮০	১৯৮৫ (প্রাক্কলিত)	২০০০ (প্রাক্কলিত)
পাশ্চাত্য খ্রিষ্টান	২৬.৯	৩০.৬	৩০.০	২৯.৭	২৯.৯
অর্থোডক্স খ্রিষ্টান	৭.৫	৩.১	২.৮	২.৭	২.৪
মুসলমান	১২.৪	১৫.৩	১৬.৫	১৭.১	১৯.২
ধর্মে অবিশ্বাসী	০.২	১৫.০	১৬.০	১৬.৯	১৭.১
হিন্দু	১২.৫	১২.৮	১৩.৩	১৩.৫	১৩.৭
বৌদ্ধ	৭.৮	৬.৪	৬.৩	৬.২	৫.৭
চীনা লৌকিকত্ব	২৩.৫	৫.৯	৪.৫	৩.৯	২.৫
ট্রাইভাল	৬.৬	২.৪	২.১	১.৯	১.৬
নাস্তিক	০.০	৪.৬	৪.৫	৪.৪	৪.২

Source : David B. Barrett, ed. World Christian Encyclopedia A comparative study of churches and religions in the modern world A.D. 1900-2000 (Oxford : Oxford University Press, 1982).[11]

১১ **David. bb. world, chi**

www.amarboi.org

ধর্ম : ভাষার চেয়ে ধর্ম অপেক্ষাকৃতভাবে বিশ্বজনীন চেতনায়নে যেন একটু এগিয়ে রয়েছে। বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে বিশ্বব্যাপী ধর্মীয় পুনরুত্থানের একটি প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায়। এ ধরনের পুনরুত্থানকে দু'ভাবে ব্যাখ্যা করা যায় এক, ধর্মীয় চেতনার বিকাশ এবং তার ফলাফল, দুই. ধর্মীয় মৌলবাদের উত্থান।

সমাজের আধুনিকায়ন হয়েছে দ্রুতগতিতে, সেইসঙ্গে ধর্ম দুটো তুলনামূলকভাবে পরিবর্তনের সাথে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে সমর্থ হয়েছে। অ্যাডাম স্মিথ কিংবা টমাস জেফারসন কেউ-ই মনস্তাত্ত্বিক, অর্থনৈতিক, নৈতিক এবং অন্যান্য সামাজিক চাহিদা : বিশেষ করে শহুরে জনগণ যারা প্রথম বা দ্বিতীয় প্রজন্মের শহুরে হয়েছে, তাদের উপর্যুক্ত প্রয়োজন মেটাতে পারেনি। যিশুখ্রিষ্ট সম্ভবত পারেননি, তবে এক্ষেত্রে তাঁর অনুসারীদের জন্য একটি উত্তম সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ধারণা করা যায়, সুদূর ভবিষ্যতে মোহাম্মদ জয়ী হয়ে বেরিয়ে আসবেন। আর সেটাই ইসলামী বিশ্ব।[১২]

হেনরি কিসিঞ্জার 'একবিংশ শতাব্দীর আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা' সম্পর্কে বলতে চেয়েছেন এভাবে : 'কমপক্ষে ছয়টি প্রধান শক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ, চীন, জাপান, রাশিয়া এবং সম্ভবত ভারত এবং সে সঙ্গে কিছু মধ্যম আকৃতির রাষ্ট্র হবে অনাগত ভবিষ্যতে বিশ্বের মূল নিয়ন্তা। কিসিঞ্জার কর্তৃক বিবৃত ছয়টি প্রধান শক্তির পাঁচটি দেশই কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন সাংস্কৃতিক ও সভ্যতার গণ্ডিভুক্ত। উপরন্তু রয়েছে কিছু ইসলামি রাষ্ট্র যাদের কুশলী অবস্থান, ব্যাপক জনসংখ্যা এবং তেল সম্পদের মালিকানা বিশ্বরাজনীতিতে তাদেরকে প্রভাবশালী করে তুলেছে। এই নতুন বিশ্বে আঞ্চলিক রাজনীতি নৃগোষ্ঠীকেন্দ্রিক প্রবণ। বিশ্বরাজনীতি বাস্তবে বিভিন্নধর্মী সভ্যতাকেন্দ্রিক। বৃহৎ শক্তিসমূহের পারস্পরিক শত্রুতা আসলে সভ্যতার সংঘাত দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে।

পাশ্চাত্য জগৎ আগামী পৃথিবীতে শক্তিশালী সভ্যতা হিসেবে বজায় থাকবে। তবে অবশিষ্ট সভ্যতার ওপর তার প্রভাব ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে। পাশ্চাত্য জগৎ অপাশ্চাত্য জগতের ওপর যতই তাদের মূলোবোধগুলো আরও বিস্তার করতে চাচ্ছে, ততই অপাশ্চাত্য জগতে এর গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্নের সৃষ্টি হচ্ছে। সেই সাথে তৈরি হচ্ছে প্রতিরোধ কনফুসীয় এবং ইসলামি সমাজ ক্রমাগত তাদের নিজস্ব অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করছে এবং পাশ্চাত্যের সঙ্গে ভারসাম্য সৃষ্টি করা, এমনকি পাশ্চাত্যকে প্রতিরোধ করার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

---

১২ শ্যামুয়েল পি. হান্টিংটন, দ্য ক্লাশ অব সিভিলাইজেশনস্ , অনুবাদ ড. মোহাম্মদ আবদুর রশীদ।

www.amarboi.org

পাশ্চাত্য আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলছে

সভ্যতাটি এখন অবক্ষয়ের পথের অবশ্যম্ভাবী পথযাত্রী। বিশ্ব রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামরিক ক্ষমতার দৃষ্টিতে পাশ্চাতের অংশীদারিত্ব আপেক্ষিকভাবে অন্য সভ্যতাসমূহের তুলনায় ক্রমহ্রাসমান। শীতলযুদ্ধ পাশ্চাত্যের বিজয় এনে দিয়েছে সত্য, কিন্তু তার চেয়েও কঠিন সত্য হল, যুদ্ধের ফলে পাশ্চাত্য আজ খুবই পরিশ্রান্ত। পাশ্চাত্য বিশ্ব আজ তার অভ্যন্তরীণ সমস্যা এবং চাহিদা মেটাতে হিমশিম খাচ্ছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি মন্থর হয়ে আসছে, জনসংখ্যা নিশ্চল হয়ে আছে, বেড়েছে বেকারত্ব, সরকারের বাজেট ঘাটতি প্রচুর, শ্রমনীতি উপেক্ষিত হচ্ছে বারবার। নিম্নহারে সঞ্চয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ পাশ্চাত্যের অনেক দেশের আজ সামাজিক পরিস্থিতি খণ্ডবিখণ্ডিত, নেশা এবং অপরাধ আজ নিত্যসঙ্গী, অর্থনৈতিক শক্তি দ্রুত পূর্বগোলার্ধের দিকে ঝুঁকে যাচ্ছে এবং রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তিও পাশ্চাত্যে হ্রাস পেয়ে পূর্বদিকেই যেন বাড়ছে। ভারত অর্থনৈতিক উন্নতির অগ্রবর্তী পর্যায়ে চলে যাওয়ার পথে। আর ইসলামি বিশ্ব ক্রমাগতই যেন পশ্চিমাবিদ্বেষী হয়ে উঠছে। পশ্চিমাদের উপদেশ, আদেশ আজ আর কেউ কর্ণপাত করতে চাইছে না; এতে করে পাশ্চাত্য নিজেও আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলছে। ১৯৮০-এর দশকের শেষের দিকে বিশ্বের ওপর মার্কিন প্রভাব হ্রাস সংক্রান্ত বিষয়টি নানারূপ বিতর্কের পর্যায়ে চলে যায়। ১৯৯০ এর দশকের মধ্যপ্রান্তে বিশ্বশক্তিসমূহের ভারসাম্যের অবস্থা নিম্নরূপভাবে বিশ্লেষিত হয় যা ওপরের বক্তব্যেরই সমর্থক; যথা

বহু গুরুত্বপূর্ণ স্থানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আপেক্ষিক ক্ষমতা দিন দিন দ্রুতগতিতে হ্রাস পাবে। তার অর্থনৈতিক ক্ষমতা, বিশেষ করে জাপান এবং চীনের তুলনায় আরও খারাপ এবং অবনতিশীল অবস্থার দিকে যাবে। সামরিক শক্তির ক্ষেত্রে বলা যায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ভারসাম্যের ক্ষেত্রে দেখা যায় বিপুলসংখ্যক আঞ্চলিক শক্তিসমূহ (সম্ভবত ইরান, ভারত এবং চীন) তরতর করে বেড়ে উঠছে এবং শক্তির ভারসাম্যে তাদের পাল্লা ভারী করছে, এ যেন কেন্দ্র দুর্বল হয়ে অঞ্চল শক্তিশালী হওয়ার মতো ঘটনা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কিছু কাঠামোগত শক্তিও অন্য জাতির হস্তগত হচ্ছে। তাছাড়া রাষ্ট্রহীন সংগঠন তথা আন্তর্জাতিক ও বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলোও ক্রমে শক্তিশালী হয়ে উঠছে। এই বলয়ের মাঝখানের সরু পথ দিয়ে জিহাদপন্থীদের উদয় হবে। তাই রুখতে হবে তাদের

www.amarboi.org

সকল শক্তি দিয়ে, জনগণের ধারণক্ষমতা তৈরিতে সূত্র হবে, গোয়েবলসীয় মাধ্যম হবে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া। এই পরিবেশ তৈরিতে একটি প্রচণ্ড ঝড়ের বেগে ধাক্কা দিয়ে তৈরি করে নিতে হবে আমাদের অবস্থান ।

পশ্চিমাদের মৌলবাদভীতি

এদের কাজের ওপর অস্পষ্ট ভীতির মতো ঝুলে থাকে মৌলবাদ নামের ধারণাটি প্রায়ই তারা এর উল্লেখ করে। অথচ এ কথাটির সাথে গাঢ় বর্তমানে অস্পষ্ট হয়ে যাওয়া সম্পর্ক রয়েছে হিন্দুত্ববাদ, খ্রিষ্টধর্ম, ইহুদি ধর্ম ও সংস্কৃতির। ইসলাম ও মৌলবাদের মধ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে সৃষ্ট সম্পর্ক পাঠকদের মনে এ ধারণাই নিশ্চিত করে যে, ইসলাম ও মৌলবাদ একই ব্যাপার। ইসলামের বিশ্বাস, এর প্রতিষ্ঠাতা ও অনুসারীদের সম্পর্কে সাধারণীকরণ এবং ইসলামকে কিছু রীতিনীতি ও ছাঁচে সঙ্কুচিত করে নিয়ে আসার এই যে প্রবণতা তা ইসলামের সাথে জড়িত প্রতিটি নেতিবাচক ব্যাপার সন্ত্রাস, আদিমতা, পূর্বানুকৃতি, ভীতিকর বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি বাড়িয়ে দেয়ার পেছনে অব্যাহত কারণ হিসেবে বর্তমান। এসব করা হচ্ছে অথচ 'মৌলবাদ'কে সংজ্ঞায়িত করা হয়নি, 'চরমপন্থী' 'মূলানুগ' কথাগুলোর পরিষ্কার অর্থ বা পটভূমি নির্দেশ করা হয়নি যেমন এভাবে বলা যে, মুসলমানদের ৫%, ১০% কিংবা ৫০% মৌলবাদী)।

১৯৯১ সাল থেকে আমেরিকান একাডেমি অব আর্ট এন্ড সায়েন্স তার ছাত্রছায়ায় গবেষণারত একদল গবেষক কর্তৃক 'মৌলবাদ' বিষয়ে আবিষ্কৃত মতামত প্রকাশ করছে ৫টি বিরাট খণ্ডে। যদিও ইহুদি ও খ্রিষ্টান ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্পর্কেও আলোচনা আছে, তবু আমার সন্দেহ ইসলামকে মাথায় রেখেই কাজটার সূচনা। সম্পাদকদ্বয় মার্টিন-ই ও স্টট এপলবাই। অনেক নামীদামি প্রাতিষ্ঠানিক গবেষক এতে অংশগ্রহণ করেন, যার মোট ফলাফল হলো মনোগ্রাহী একগুচ্ছ অভিসন্দর্ভের সমাহার।[১৩] কারণ অপসত্যের নিজস্ব সংজ্ঞা নেই। সুবিধাবাদীরা একে ধাওয়া করে বেড়ায় প্রতিনিয়ত।

'ইসলামী বিশ্বের অধিকাংশই সামাজিক বিভক্তির করায়ত্ত, বস্তুগত সমৃদ্ধির প্রশ্নে পশ্চিমের কাছে হীনম্মন্যতায় নিরাশ, পশ্চিমের সাংস্কৃতিক প্রভাবের কারণে মহাত্যক্ত, তার ক্ষোভ দ্বারা চালিত যাকে বার্নার্ড লুইস বলেছেন, 'ক্রোধের রাজনীতি'। তার বিষাক্ত পশ্চিমবিরোধিতা কেবল একটা কৌশল নয়।

---

১৩ এডওয়ার্ড ডব্লিউ সাঈদ, কাভারিং ইসলাম, ঢাকা ঃ সংবেদ প্রকাশনী।

www.amarboi.org

অথবা মুসলিমবিদ্বেষী ডানিয়েল পাইপের কথা ধরা যাক। তার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো প্রাচ্যতাত্ত্বিক হিসেবে তিনি ইসলামকে 'জানেন' মর্মস্পর্শীভাবে ভয়ঙ্কর এক ব্যাপার হিসেবে। তিনি দি ন্যাশনাল ইন্টারেস্টের বসন্ত ১৯৯৫ সংখ্যায় একটি 'ভাবনা খণ্ডে নিজেকে অভিব্যক্ত করেন এই শিরোনামে 'মধ্যপন্থী বলে কেউ নেই মৌলবাদী ইসলামের সাথে কারবার'। খণ্ডটির কোথাও তিনি মৌলবাদী ইসলামকে তার স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যের অপরাধ থেকে রেহাই দেননি।

ইসলাম এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে আরবদের সম্পর্কে এহেন দাবি তোলার আসল উদ্দেশ্য ইসলামের প্রধান প্রতিপক্ষ ইসরাইল ও আমেরিকা যা করছে তা আবডালে রাখা। এই দুই দেশ ব্যূহ ইসলামী দেশে বোমা মেরেছে ও দখলাভিযান চালিয়েছে (মিসর, জর্দান, সিরিয়া, লিবিয়া, সোমালিয়া, ইরাক), চারটি দেশের অনেকখানি আরব ইসলামী অঞ্চল দখল করেছে; জাতিসংঘে আমেরিকা প্রকাশ্যে সমর্থন করেছে এসব দখলদারিত্বকে। অধিকাংশ আরবদের বিবেচনায় ইসরাইল হলো ঔদ্ধত্য আঞ্চলিক পারমাণবিক শক্তি, প্রতিবেশীদের প্রতি একেবারেই শ্রদ্ধাবোধহীন; নিজের বোমাবর্ষণ ও মানুষ খুনের সংখ্যা ও পুনরাবৃত্তির ব্যাপারে, ঘরছাড়া করা নিঃসম্বল করার ব্যাপারে বিশেষত ফিলিস্তিনিদেরকে একেবারে নিরুদ্বেগ (মুসলমানের হাতে যত ইসরাইলি খুন হয়েছে তার তুলনায় ইসরাইলের হাতে খুন হওয়া মুসলমানের সংখ্যা অনেক গুণ বেশি) আন্তর্জাতিক আইনও ডজন ডজন জাতিসংঘ সিদ্ধান্ত অমান্য করে ইসরাইল পূর্ব জেরুসালেম ও গোলান হাইট নিজ সীমানাভুক্ত করে নিয়েছে, দক্ষিণ লেবানন দখল করে আছে ১৯৮২ সাল থেকে, ফিলিস্তিনিদেরকে জাতি দূরের কথা, নিম্ন মানবিক প্রাণী হিসেবে বিবেচনা করার নীতি গ্রহণ করেছে এবং যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যপ্রাচ্য নীতির ওপর তার নিজের প্রভাব এমনভাবে লেপে দিয়েছে যে এর ফলে বিশ কোটি আরব মুসলমানের স্বার্থ চাপা দিয়ে বড় হয়ে উঠেছে চল্লিশ লক্ষ ইহুদির স্বার্থ।[১৪]

১৯৯১ সালে যুক্তরাষ্ট্র যখন ইরাকের বিরুদ্ধে বেশ কিছু দেশের একটি জোটের নেতৃত্ব দেয় তখন সে বলে দখলদারিত্ব ও আগ্রাসন উল্টে দেয়ার কথা। ইরাক যদি মুসলিম দেশ না হতো এবং তেলসমৃদ্ধ এলাকাটিই দখল না করতো যাকে

---

১৪ Maxime Rodinson, The Modern World.

www.amarboi.org

মনে করা হয় যুক্তরাষ্ট্রের রিজার্ভ, তাহলে হয়তো গোটা অভিযানটিই ঘটতো না। যেমন ইসরাইল পশ্চিমতীর ও গোলান হাইট দখল করেছে, পূর্ব জেরুজালেম নিজ সীমানাভুক্ত করে নিয়েছে, বসতি স্থাপন করছে; কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র কখনো মনে করেনি ওখানে তার হস্তক্ষেপ দরকার। নিউইয়র্ক টাইমসের 'উইক ইন রিভিউ' এর চমকের কথা। এর ২১ জানুয়ারি, ১৯৯৬ তারিখে সংখ্যায় শিরোনাম ছিলো : 'লাল হুমকি শেষ : কিন্তু দোরগোড়ায় ইসলাম'।

১৯৮৭ সালে জুলাইয়ের ৬ তারিখের ইউএস নিউজ এন্ড ওয়ার্ল্ড রিপোর্ট। ওখানে লেখা হয়, ইসলামী বিশ্বের প্রায় সবখানে ক্ষমাহীন ও অপরিবর্তনীয় মৌলবাদ জনপ্রিয় আবেগে পরিণত হয়েছে। তা পশ্চিমা বিশ্বকে বেকায়দায় পেয়ে গেছে, বিশেষ করে যখন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ও ইসলাম ধর্মের মত্ত আবেগ এক হয়েছে ভয়ঙ্কর ফলাফল সৃষ্টির জন্য।[১৫] এর থেকে সাবধান না হলে মৃত্যু অনিবার্য।

১৫ তদেক

www.amarboi.org

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের অন্তরালে ইসলাম বিমুখতা

ধর্মনিরপেক্ষতা ইংরেজি (Secularism)-র বাংলা প্রতিশব্দ। Sceular রাষ্ট্র দর্শনের অপর নাম Secularism. Secular অর্থ ইহলৌকিক, পার্থিব, পরকাল বিমুখতা ইত্যাদি।

"র‍্যানডম হাউজ অব দ্যা ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ"-এ Secular বা ধর্মনিরপেক্ষতার সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, "যা ধর্ম সম্পর্কিত নয় (Not perlaining toor connceted with religious) এবং যা কোনো ধর্মবিশ্বাসের অন্তর্গত নয় (Not belonging to a religious order)। আর ধর্মনিরপেক্ষতার সংজ্ঞায় বলা হয়েছে এটি একটি রাজনৈতিক বা সামাজিক দর্শন যা সকল ধর্মবিশ্বাসকে নাকচ করে দেয় (Rejects all forms of religious faith)। Encyclopedia of Britanica-র সংজ্ঞাও অনুরূপ। অর্থাৎ যারা কোনো ধর্মের সংগে সম্পৃক্ত নন, কোনো ধর্মের অনুসারী নন; কোনো ধর্মে বিশ্বাসী নন এবং আধ্যাত্মিকতা ও পবিত্রতার বিরোধী তাদেরকেই বলা হয় ধর্মনিরপেক্ষ। চেম্বারস ডিকশনারির মতে, "Education should be independent of religion" অর্থাৎ ধর্মনিপপেক্ষতাবাদ হচ্ছে এমন এক বিশ্বাস যার রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষা ইত্যাদি ধর্মমুক্ত থাকবে।

Oxford Dictionary-তে Secularism means the doctrine that morality should by besed sotely of regard to the wellbeing of mankind in the present life to be exclusion of all consideration draw from belief in god or in future state.

অর্থাৎ ধর্মনিরপেক্ষতা এমন এক মতবাদ যা মনে করে আল্লাহ বিশ্বাস, পরকাল বিশ্বাস বিবেচনা থেকে মুক্ত থেকে মানবজাতির বর্তমান কল্যাণ চিন্তার উপর ভিত্তি করে নৈতিকতা গড়ে উঠবে।

প্রাচ্যবিদ ড. স্মিথের মতে-"The secular state is a state which guarantees of religion, deals with individuals as citizen irrest active of his religion is not constitutionally corrected to a particular religion nor does it seek either to promote or intyer fere with religion"

অর্থাৎ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলতে বুঝায় এমন এক রাষ্ট্র যা ধর্মীয় স্বাধীনতা দান করে ব্যক্তিকে ধর্ম নির্বিশেষে নাগরিক হিসাবে বিবেচনা করে এবং শাসনতান্ত্রিকভাবে রাষ্ট্রে কোনো ধর্মের সাথে সংযুক্ত থাকেনা- ধর্মের উন্নতিও চায় না, হস্তক্ষেপও করেনা। বস্তুত Secularism বলতে বুঝায় এমন মতবাদ, যা পারলৌকিক ধ্যানধারণা ও ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কহীনভাবে সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার কথা বলে। রাষ্ট্রের নীতি ও পরিচালনায় কোনোভাবেই ধর্মকে

www.amarboi.org

বিবেচনা করে না। মুসলিম বিশ্বে ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ইসলামমুক্ত শাসন। ইসলামকে ব্যক্তির জীবনে সীমাবদ্ধ রেখে সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনা করা। ইসলাম থেকে রাষ্ট্র ও রাজনীতি সম্পূর্ণভাবে পৃথক করা।

Secularism এর উৎপত্তি কোথায়

চার্চ ও রাষ্ট্রের দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মাধ্যমে ইউরোপে প্রথম Secular রাষ্ট্র দর্শনের প্রসার ঘটে। কয়েক শতাব্দী ব্যাপী বিভিন্ন দার্শনিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় কার্যকলাপের ফলশ্রুতিতে ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝিতে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ পূর্ণতা লাভ করে। এর বিকাশে সহায়তা করছে ইউরোপীয় রেনেসাঁ, শিল্প বিপ্লব, জাতীয়তাবাদের আবির্ভাব, ফরাসী বিপ্লব এবং বিভিন্ন দার্শনিকের (যেমন- ম্যাকিয়াভেলি, থমাস, হবস, জর্জ জের, মার্ক্স এঙ্গেলস, ভলটেয়ার প্রমুখ) নাস্তিক্য, বস্তুবাদী, সমাজতান্ত্রিক ইত্যাদি চিন্তাধারা।

মুসলিম বিশ্বেও রাজনীতি বরাবরই ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। পরবর্তীতে বিভিন্ন কারণে ক্রমান্বয়ে রাষ্ট্র ও ইসলামের বন্ধন দুর্বল হতে থাকে। তবুও অনেক বিচ্যুতি সত্ত্বেও আনুষ্ঠানিকভাবে রাষ্ট্র পরিচালনার ভিত্তি ছিল আল-ইসলাম। কিন্তু পশ্চিমা ঔপনিবেশিক শাসনের বিস্তার ও অভ্যন্তরীণ অবক্ষয়ের কারণে মুসলিম বিশ্বে Secular ভাবধারার প্রসার ঘটে। মোস্তফা কামাল-এর নেতৃত্বে Secular তুর্কী গঠনের মধ্য দিয়ে মুসলিম বিশ্বে আনুষ্ঠানিকভাবে Secular রাষ্ট্র গঠন প্রক্রিয়া শুরু হয়। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে রাষ্ট্রের যাবতীয় কার্যক্রমকে ইসলামমুক্ত করে তিনি ধর্মনিরপেক্ষতার গোড়াপত্তন করেন। আর পরবর্তী দশকগুলোতে মুসলিমবিশ্বের বিভিন্ন দেশ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে Secular রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

ধর্মহীনতার আরেক নাম ধর্মনিরেপেক্ষতাবাদ

আসলে ধর্মনিরপেক্ষতা নতুন কোনো বস্তু নয়। এটি মহানবী (সা.)-এর কাল থেকে অদ্যাবধি অব্যাহত একটি অতিশয় পুরনো কৌশল। আবু জেহেলরাও একটি প্রস্তাব নিয়ে আবু তালিবের কাছে গিয়েছিল, তার ভ্রাতুষ্পুত্র মুহাম্মদকে সম্মত করার দায়িত্ব গ্রহণের অনুরোধ নিয়ে। পিতৃব্য আবু তালিবের পেশকৃত প্রস্তাবের জবাবে মুহাম্মদ (সা.) কী বলেছিলেন তা আমাদের অজানা নয়। তায়েফ থেকে আগত কতিপয় গোত্রপতি সদ্য মুসলিম যখন রাসূল (সা.)-কে বলল, তায়েফবাসীরা সবাই মুসলমান হতে চায় না। তারা ইসলামের পূর্ণ অনুসারী হতে চায়। শুধু একটি ছোট প্রার্থনা, তারা তাদের পূর্ব পুরুষদের উপাস্য পুতুলটিকে নিজগৃহে রক্ষা করতে চায় তবে পূজার জন্য নয়, এমনিতেই

www.amarboi.org

নিতান্ত সংস্কারবশত। তায়েফবাসীদের এটা ছিল ধর্মনিরপেক্ষতা। কিন্তু রাসূল (সা.) কী বলেছিলেন? বলেছিলেন– তাদের মুসলমান হবার প্রয়োজন নেই, এভাবে মুসলমান হওয়া যায় না।

উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলোর মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ধর্মকে একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার বলে মেনে নিয়েছে এবং আমাদের দেশের ধর্মনিরপেক্ষবাদী হতবুদ্ধিজীবীরা, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের পক্ষে কুরআনের আয়াতকে হাদিস বলে চালিয়ে দেন- তোমাদের ধর্ম তোমাদের কাছে আর আমার ধর্ম আমার কাছে। এটা তাদের ধর্ম সম্পর্কে অজ্ঞতা ও ধর্মহীনতারই বহিঃপ্রকাশ মাত্র। অথচ পৃথিবীতে ইসলামই একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবনাদর্শ এবং এই ইসলামই যেহেতু অন্যান্য বিকৃত মতাদর্শগুলোর সম্মুখে একটি বলিষ্ঠ চ্যালেঞ্জ, আর তার মোকাবেলায় ধর্ম থেকে মানুষকে বিচ্ছিন্ন করা, বিরত রাখার মধ্য দিয়েই ধর্মরিপেক্ষতা তার অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে বলে তারা বিশ্বাস করে। অবস্থাটা এমন যে, এই পচা মতবাদের দোকানদাররা তাদের দোকানে যে মালামাল নেই তা অন্যকে বিক্রি করতেও দেবে না, এই সিদ্ধান্তেই তারা অটল। আর যেহেতু ইসলামই মানুষকে দিয়েছে সব কিছুর সমাধান। সুতরাং মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগকে আল্লাহ ও রাসূলের প্রভাবমুক্ত রেখে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ধর্মকে পরিত্যাগ করাই ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের মূল লক্ষ্য। এ মহান উদারতার খোলস পরেই মূলত ধর্মরিপেক্ষতাবাদ ইসলামের সাথে ঐতিহাসিক যুদ্ধে লিপ্ত। এই চিরন্তন লড়াই রাসূলে করীম (সা.)-এর সময়েও ছিল। যখন আল্লাহর নিকট থেকে প্রাপ্ত পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান মানব সমাজে কায়েমের আওয়াজ তুলেছেন ঠিক তখনই শাসকশ্রেণীর পক্ষ থেকে নানা অজুহাতে বিরোধীতা করা হয়েছে। হযরত ইব্রাহিম (আ.)-এর সাথে নমরুদের, মুসা (আ.)-এর সাথে ফেরাউনের এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সাথে আবু লাহাব-আবু জেহেলদের দ্বন্দ্ব ছিল চিরন্তন। আজও সেই লড়াই অব্যাহত রয়েছে এবং থাকবে। তাদের অনুসারীদের ভাষা এবং কৌশলের পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু ইসলামের উপর আঘাত হানছে সমান গতিতেই এবং আরো অতিমাত্রায়। তাইতো ইসলাম ও মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করতে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষটিকেও তারা রক্তাক্ত করতে দ্বিধাবোধ করেনি।[১৬]

---

[১৬] .ড. মুহাম্মদ রেজাউল করিম, জাতীয় জীবনে মূল্যবোধের অবক্ষয়। প্রফেসরস প্রকাশনী।

www.amarboi.org

সারা বিশ্বে পশ্চিমা মিডিয়ার বিষবাষ্প

পশ্চিমা প্রোপাগান্ডাকারীদের মধ্যে সর্বশীর্ষে রয়েছেন অন্যতম ইহুদি চিন্তাবিদ ও বুদ্ধিজীবী বার্নার্ড লুইস ও স্যামুয়েল হান্টিংটন, যারা 'Clash of Civilization (সভ্যতার দ্বন্দ্ব) তত্ত্ব বিশ্ববাসীর সামনে পেশ করেছেন। বিশ্ব জায়নবাদী গোষ্ঠী এই তত্ত্বকে মিডিয়ার নিকট অর্পণ করেছে। মিডিয়া বিভিন্ন ভাবে সিনেমা, ফিল্ম, নভেল, নাটক, বক্তৃতা-বিবৃতি ও গবেষণামূলক প্রবন্ধ-নিবন্ধের মাধ্যমে পাশ্চাত্যের মন-মস্তিষ্কে এ কথা মজবুতভাবে ঢুকিয়ে দেবার প্রাণান্তকর প্রয়াস চালিয়েছে যে, কমিউনিজমের পতনের পর পাশ্চাত্যের শত্রুতার গতিপথ এখন ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে রুখ করেছে।

স্নায়ুযুদ্ধ অবসানের পর থেকে অন্যায় মনোযোগ ঢেলে দেয়া হয়েছে ইসলামের দিকে। তখন গণমাধ্যমগুলো ইসলামের নেতিবাচক ছবিতে পূর্ণ। 'আমেরিকার কলেজ, নামকরা বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা অন্যান্য জায়গায় ছাত্রদের জিজ্ঞাসা করে দেখুন 'মুসলিম' শব্দটি শুনে ওদের মধ্যে কী চিন্তা জাগে। অনিবার্যভাবে প্রায় একই জবাব মিলবে: দাড়িঅলা, অস্ত্রধারী, উন্মত্ত সন্ত্রাসী– তাদের এক নম্বর শত্রু আমেরিকাকে ধ্বংস করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।' ক্যারাবেল উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করেন যে, এবিসির মর্যাদাময় ২০-২০ সংবাদ প্রোগ্রামও 'অনেক খণ্ড প্রকাশ করেছে। ওগুলোর আলোচনায় এ কথাই বলা হয় যে, ইসলাম আল্লাহর পথে নিবেদিত যোদ্ধাদের নিয়ে জিহাদে রত এক ধর্ম। বিশ্বব্যাপী মুসলিমসন্ত্রাসীদের শাখা-প্রশাখা সম্পর্কে একটি তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করে ফ্রন্টলাইন।' ক্যারাবের হয়তো ইঙ্গিত করেছেন জিহাদের ভীতি ছড়িয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে এমারসন কর্তৃক নির্মিত পিবিএস ফিল্ম জিহাদ ইন আমেরিকা'র কথা। এমনকি সেক্রেড রেজ বা ইন দি নেম অব গড জাতীয় উসকানিধর্মী শিরোনামের বিনোদনমূলক বইগুলো কথাও হয়তো নির্দেশ করে থাকবেন : এসব বই ইসলাম ও বিপজ্জনক অসহিষ্ণুতার সম্পর্ক আরো দৃঢ় ও অনিবার্য হিসেবে দেখায়। 'একই কথা বলা যায় মুদ্রণ প্রচারমাধ্যম সম্পর্কেও ক্যারাবেল বলেন, 'মধ্যপ্রাচ্যবিষয়ক প্রতিবেদনের সাথে সচরাচর একটি মসজিদ বা একদল নামাজরত মানুষের ছবি থাকবেই।[১৭]

লুইস সবচেয়ে জঘন্য চেহারায় হাজির হন তার 'দি রুটস অব মুসলিম রেইজ' এ। নামটাই ইঙ্গিতপূর্ণ। দি আটলান্টিক পত্রিকার সেপ্টেম্বর, ১৯৯০ সংখ্যায় লেখাটি ছাপা হয়। ঐ সংখ্যাটির প্রচ্ছদ তৈরি করেছেন যিনি তিনি লুইসের

১৭, এডওয়ার্ড ডব্লিউ সাঈদ, কাভারিং ইসলাম, ঢাকা ঃ সংবেদ প্রকাশনী।

www.amarboi.org

বক্তব্য খুব ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন মনে হয়। প্রচ্ছদে দেখা যায়, পাগড়ি মাথায়, অবশ্যই ইসলামী একটা মুখ, তীব্র ভ্রূকুটি সহকারে পাঠকের দিকে তাকিয়ে। তার চোখের তারায় আমেরিকার পতাকা, ভঙ্গিতে তীব্র ঘৃণা ও ক্রোধ। 'দি রুটস অব ইসলামী রেইজে গ্রহণযোগ্য যুক্তি নেই। এটি মানবীয় জ্ঞান-বিচ্যুত তর্কের মত ঐতিহাসিক সত্য নেই এতে।

১৯৯২ সালের এপ্রিলে ইকোনমিস্ট পত্রিকা তার প্রথম পাতায় ইসলামকে টার্গেট বানিয়ে একটি কার্টুন ছেপেছে, যাতে এক আরব ব্যক্তি বন্দুক নিয়ে একটি মসজিদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। একই তারিখে সাপ্তাহিক টাইম একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে, যাতে বলা হয়েছে, গোটা বিশ্বকে ইসলামের বিপদ থেকে সতর্ক থাকা উচিত। পত্রিকাটি তার কভার পৃষ্ঠায় মসজিদের মিনারার ছবি ছেপেছে, যার পাশে এক ব্যক্তি মেশিনগান নিয়ে দাঁড়িয়েছে। ১৯৯২ সালে অভিজ্ঞতার জন্য ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে প্রথমবার হামলার নাটক মঞ্চস্থ করার পর হলিউড 'প্রকৃত মিথ্যা' নামে একটি সিনেমা নির্মাণ করে, যার মূল কথা ছিল, আমেরিকায় একটি গোপন আরব মিলিশিয়া সক্রিয় রয়েছে। যাদের শ্লোগান 'মুসলমানদের স্বাধীনতা'। এই মিলিশিয়া আমেরিকায় বড় ধরনের সন্ত্রাসী হামলার পরিকল্পনা করছে। সেই পরিকল্পনার আওতায় তারা আমেরিকার বিমান অপহরণ করে নিউইয়র্কে অবস্থিত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কেন্দ্রে আত্মঘাতী হামলার জন্য আকাশে উড্ডয়ন করেছে। ইতোমধ্যে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থার এক অফিসার ও তার স্ত্রী তাদের আত্মঘাতী হামলার পরিকল্পনা সম্পর্কে অবগত হয়ে যান। তারা উভয়ে সন্ত্রাসীদের এই হামলা ব্যর্থ করে দেন। এভাবে তারা নিউইয়র্ককে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেন।

'মার্কিন প্রেসিডেন্টের বিমান অপহরণ' নামে দ্বিতীয় আরেকটি ফিল্মে বলা হয়েছে, ইসলামী রাষ্ট্র দাগেস্তানের কিছু লোক দীর্ঘ দিন ধরে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশকে হত্যার ষড়যন্ত্র করছে। সেই ষড়যন্ত্রের আওতায় তারা বুশকে হত্যার জন্য তাঁর বিমান অপহরণ করেছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের এ ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়ে গেছে।

ইসলাম ও মুসলমানের বিরুদ্ধে তথ্যসন্ত্রাস

ইসলাম ও মুসলমানের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী ঘৃণা, বিদ্বেষ, হিংসা ও শত্রুতা ছড়ানোর অংশ হিসেবে ১৯৯৮ সালে হলিউড আরেকটি ফিল্ম নির্মাণ করে। সেটি ছিল হলিউডের এ যাবৎকালে সবচেয়ে ব্যবসা-সফল ফিল্ম। তাতে দেখানো হয়েছে, শান্তি-নিরাপত্তার প্রবক্তা ও গোটা মানবতার কল্যাণকামী

www.amarboi.org

আদর্শ দেশ আমেরিকার সমাজব্যবস্থাকে ধ্বংস করার জন্য হিংসা-বিদ্বেষে ভরপুর মাবতার দুশমন মুসলমানরা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কেন্দ্রে সন্ত্রাসী হামলার মাধ্যমে এ কাজের সূচনা করেছে। গোটা দুনিয়ার যদি ভয় ও বিপর্যয়ের আশঙ্কা থাকে তাহলে সে আশঙ্কা মধ্যপ্রাচ্যের আরবদের থেকে।

মধ্য এশিয়ার মুসলিম দেশগুলোর বিরুদ্ধে পার্শ্ববর্তী রুশ ও পশ্চিমাপন্থী দেশগুলোকে উসকে দেয়া এবং ভারতকে এশিয়ার সুপার পাওয়ার হিসেবে সামনে অগ্রসর করার প্রচেষ্টা, যাতে এশিয়ার ইসলামী দেশগুলো এবং সেখানকার সক্রিয় ইসলামী সংগঠনগুলোকে নির্মূল করার পরিকল্পনা সহজেই বাস্তবায়ন করা যায় সেই পরিকল্পনারই অংশ হিসেবে বাংলাদেশে ইসলামী রাজনীতি বন্ধের বিরাট চক্রান্ত আর ধর্মবিমুখ পরবর্তী প্রজন্ম তৈরি করতে মহা আয়োজনে চলছে সেকুলার শিক্ষাব্যবস্থা বাস্তবায়নের জোর প্রচেষ্টা। এ দু'টি এই জনপদের জন্য মহা সঙ্কট ডেকে আনবে।

পশ্চিমা মিডিয়ার মাধ্যমে উল্লিখিত চারটি স্তম্ভকে সুদৃঢ় ও সুসংহত করতে আমেরিকা ও তার মিত্র দেশগুলো তাদের সকল শক্তি ব্যয় করছে।

উপসাগরীয় যুদ্ধের একতরফা সংবাদ পরিবেশনে মিডিয়া জগতে নতুন অধ্যায় রচিত হয়েছে। গোটা বিশ্বের পথনির্দেশকারী মেধাবী সাংবাদিকদের মার্কিন পেন্টাগনের একতরফা নতুন পলিসি শিহরিত করেছে যে, এ যুগেও মিডিয়া ও গণমাধ্যমের ওপর মার্কিন প্রতিরক্ষা দফতরের শতভাগ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব এবং যে যতই হাত-পা নাড়ুক কিংবা প্রতিবাদের ঝড় তুলুক, তার এই চিৎকার নীরব-নিভৃত পল্লীতে অসহায়ের রোদন ছাড়া আর কিছুই নয়। আর বাস্তবে এমনটিই হয়েছে এবং হচ্ছেও যে, গোটা বিশ্বের সকল সংবাদ প্রথমে আমেরিকায় পাঠানো হয়। তারপর সেখানে সেই সংবাদগুলো কেটে ছেঁটে নিজেদের আঙ্গিকে তৈরি করে গোটা বিশ্বে তা প্রচার-প্রসার করা হয়। এভাবেই বিশ্বায়নের রাস্তা সুগম করা হচ্ছে। বিশ্বায়ন আজ মিডিয়ার পথ ধরে ভয়ঙ্কর শক্তিশালী হয়ে উঠছে।[১৮]

সুচতুর ইহুদিরা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহকে নির্মূল করার জন্য নতুন কিছু টেকনিক গ্রহণ করেছে। সে টেকনিকগুলো হলো :

এক. মিডিয়ার ব্যাপক প্রচার-প্রোপাগান্ডার মাধ্যমে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিশ্ব-জনমত বিষিয়ে তোলা।

---

[১৮] নজরুল হাফীজ নদভী,পশ্চিমা মিডিয়ার স্বরূপ, ঢাকা।

www.amarboi.org

দুই. মুসলিম বিশ্বের, যশ, খ্যাতি ও উচ্চাভিলাষী কিছু সংখ্যক নেতৃবর্গের পাশ্চাত্যের বিরোধিতাকে মিডিয়ার ব্যাপক প্রচার-প্রোপাগান্ডার মাধ্যমে তাদের মুসলমানদের দৃষ্টিতে হিরো বানানো। এরপর তাদের দ্বারা স্থূলভাবে ইসলাম বিরোধিতার কাজ নেয়া এবং তাদের ক্রীড়নক হিসেবে ব্যবহার করে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহকে নির্মূল করা।

একবার আমেরিকান ব্রডকাস্টিং কোম্পানি (ABC)-এর এক প্রতিনিধি জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব ড. বুট্রোস ঘালিকে সোমালিয়া সম্পর্কে প্রশ্ন করেন। জবাবে ড. ঘালি বলেন, সোমালিয়ায় মার্কিন সৈন্য প্রেরণ এ কারণেই সম্ভব হয়েছিল যে, এ উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য একাধারে দীর্ঘ ১০ মাস মিডিয়া ও গণমাধ্যমকে উৎসর্গ করে দিয়েছিলাম। এর দ্বারা ড. ঘালি বোঝাতে চেয়েছেন, সোমালিয়ায় মার্কিন সামরিক হস্তক্ষেপ বিশ্ববাসীর সামনে গ্রহণীয় বানানোর জন্য সর্বপ্রথম মিডিয়ার মাধ্যমে সোমালিয়ায় ক্ষুধা ও দুর্ভিক্ষের কাহিনী দুনিয়াবাসীর কাছে ভয়াবহ আকার বানিয়ে পেশ করা হয়েছিল। ড. ঘালি বলেন, আমরা মিডিয়ার মাধ্যমে বিশ্ববাসীর সামনে কেবল এ সংবাদ ও চিত্রই পেশ করতে লাগলাম যে, সোমালিয়ার জনগণ ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও রোগ-শোকে মৃত্যুবরণ করছে। টেলিভিশন ও সংবাদপত্রগুলো ক্ষুধার্ত ও উলঙ্গ সোমালী জনগণের এমন করুণ ও মজলুম চিত্র দুনিয়াবাসীর সামনে পেশ করতে থাকে যাতে বিশ্ববাসী বুঝে, এই মরুভূমিতে না পানি আছে, না খাবার আছে, না মাথা গোঁজার ঠাঁই আছে, আর না আছে কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। সেখানকার জনগণ সকল মৌলিক প্রয়োজন থেকে বঞ্চিত। যদি কোথাও থেকে কোনো সাহায্য সহযোগিতা আসে তাও আবার অসভ্য ও জংলী মানুষগুলো সেগুলো নিয়ে পরস্পরে লড়াইয়ে লিপ্ত হয়। এভাবে অব্যাহত প্রোপাগান্ডার মাধ্যমে আগ্রাসনের পরিবেশ তৈরি হয়ে গেলে বিশ্ববাসীর বদ্ধমূল ধারণা হয়ে গেল যে, সেখানে বিদেশী হস্তক্ষেপ ছাড়া জনগণকে রক্ষার আর কোন পথ নেই।

আমরা আমাদের শত্রুদের হাতে এমন কোনো কার্যকর ও শক্তিশালী সংবাদপত্র থাকতে দেব না, যার মাধ্যমে তারা তাদের মতামত সক্রিয়ভাবে জনগণের সামনে উপস্থাপন করতে পারে। আর না আমরা তাদের এমন যোগ্য হতে দেব, যাতে তারা আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে কোনো সংবাদ সমাজ পর্যন্ত পৌছাতে পারে। আমরা এমন আইন প্রণয়ন করব, যাতে কোন প্রকাশক বা প্রেস মালিক আমাদের অনুমতি ছাড়া কোনো বিষয় ছাপতে পারবে না। এভাবেই আমরা আমাদের বিরুদ্ধে যে কোনো ধরনের ষড়যন্ত্র কিংবা শত্রুতামূলক প্রোপাগান্ডা সম্পর্কে অবগত হয়ে যাবো।

www.amarboi.org

আমাদের আয়ত্তে এমন সংবাদপত্র ও প্রকাশনা থাকবে, যা বিভিন্ন গ্রুপ, দল, পার্টি ও সম্প্রদায়কে সমর্থন দেবে। এসব দল, পার্টি ও সম্প্রদায় গণতন্ত্রের প্রবক্তা কিংবা বিপ্লব সমর্থক হোক। এমনকি আমরা এমন সংবাদপত্রের পৃষ্ঠপোষকতাও করব, যা অনৈক্য, বিপথগামিতা, যৌন সুড়সুড়ি, নৈতিক অবক্ষয়, স্বৈরাচারী রাষ্ট্র ও জালেম স্বৈর শাসকদের প্রতিরোধ ও সমর্থন করবে। আমরা যখন যেখানে ইচ্ছা জাতিগোষ্ঠীসমূহের চেতনা উত্তেজিত করব আবার যখন ভাল মনে করব তখন ঠাণ্ডা করে দেব। এর জন্য সত্য-মিথ্যা উভয়েরই আশ্রয় নেব। আমরা এমনভাবে সংবাদগুলো উপস্থাপন করব যাতে জাতি-গোষ্ঠী ও সরকারসমূহ তা গ্রহণ করতে বাধ্য হবে। বিরাট ধুমধাম ঢাক-ঢোল পিটিয়ে কোনো পদক্ষেপ নেয়া থেকে খুব সতর্কতা অবলম্বন করব। আমাদের লিটারেচার ও সংবাদপত্রগুলো হিন্দুদের দেবী বিষ্ণুর মতো হবে, যার শত শত হাত রয়েছে। আমাদের প্রেস প্রকাশনার মৌলিক কাজ হবে বিভিন্ন প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও কলামের মাধ্যমে জনমত গঠন করা। আমরা ইহুদিরা এমন সম্পাদক, পরিচালক, সাংবাদিক ও রিপোর্টারদের সাহস জোগাবো এবং উৎসাহ দেব, যারা হবে দুশ্চরিত্র এবং যাদের অতীত অপকর্ম ও দুষ্কর্মের রেকর্ড রয়েছে। ঠিক একই পদ্ধতি গ্রহণ করব দুশ্চরিত্র রাজনীতিক লিডার ও স্বৈরাচারী শাসকদের ক্ষেত্রেও।

এদের আমরা খুব কভারেজ দিয়ে বিশ্ববাসীর সামনে হিরো বানিয়ে উপস্থাপন করব, কিন্তু আমরা যখন উপলব্ধি করতে পারব, তারা আমাদের হাত থেকে বের হয়ে যাবার চেষ্টা করছে, তখন আমরা তাদের এমন শিক্ষা দেব যা অন্যদের জন্যও শিক্ষণীয় হবে। আমরা সংবাদ সংস্থার মাধ্যমে ইহুদি প্রচারমাধ্যমগুলো নিয়ন্ত্রণ করব। আমরা বিশ্ববাসীকে যে রঙ দেখাব, তাদের তাই দেখতে হবে। অপরাধ সংক্রান্ত সংবাদগুলো অসাধারণ গুরুত্বের সাথে বিস্তারিতভাবে প্রকাশ করবে, যাতে পাঠকের মেধা মনন প্রস্তুত হয়ে সেও অপরাধীর সহমর্মী হয়।

১৯৭৯ সালের ১৬ এপ্রিল টাইম ম্যাগাজিনে একটা আর্টিকেল এসেছিল। যেখানে ছিল মাত্র দেড়শো বছরের মধ্যে ৬০ হাজার এরও বেশি বই লেখা হয়েছে ইসলামের বিপক্ষে। টাইম ম্যাগাজিনের এ আর্টিকেল অনুযায়ী আপনি যদি হিসাব করেন তাহলে দেখবেন, প্রত্যেক দিন ইসলামের বিপক্ষে একাধিক বই লেখা হয়েছে। আজকে বিশেষভাবে মুসলমানদের টার্গেট করছে মিডিয়া। যেমন দরুন, যদি কোন মুসলমান মহিলা হিজাব পরেন, তাকে টার্গেট করা

www.amarboi.org

হবে। একই সাথে গির্জার নানকদের দেখেন তারাও একই রকম পোশাক পরেন, মুখ আর হাত বাদে পুরো শরীর ঢাকা। মানুষ তাদের শ্রদ্ধা করে কেন? পার্থক্যটা কোথায়? যদি কোন মুসলমান দাড়ি রাখে, তার মানে হচ্ছে সে একজন সন্ত্রাসী। কিন্তু শিখরাও দাড়ি রাখে, তাতে কোন সমস্যা নেই। ওরা পাগড়ি পরে, তাতেও সমস্যা নেই। একজন শিখ কোর্টে মামলা করেছেন। তিনি ছিলেন কানাডিয়ান, আর তিনি কেস করছেন এ কারণে যে, কানাডিয়ান আর্মিতে পাগড়ি খুলবে না বলে এবং তিনি মামলায় জিতেছিলেন। আর এখানে দেখি যদি কোন মুসলমান দাড়ি রাখেন মানুষ তখন অন্য কিছু ভাবে। দাড়ি কী ক্ষতি করতে পারে। একটা টুপি কী ক্ষতি করতে পারে?

ইন্ডিয়ার একজন বিখ্যাত সমালোচক অরুণ শুরী একটা বই লিখেছেন, 'দ্যা ওয়ার্ল্ড অব ফতোয়া'। তিনি তার বইতে কুরআনের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন যে, সূরা তাওবায় ৯ নম্বর পারার ৫ নম্বর আয়াতে আছে, তার মতে কুরআন বলছে, যদি কোন কাফেরের (হিন্দু) সাথে দেখা হয়, তাকে মেরে ফেল, তার বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে রাখ। তাহলে ভেবে দেখেন, যদি কোন সাধারণ হিন্দু, একজন নিরীহ হিন্দু এটা পড়ে, ওহ! কুরআন বলে, যদি কোন হিন্দুর সাথে দেখা হয় তাকে মেরে ফেল। তাহলে তক্ষুনি তার একটা প্রতিক্রিয়া হবে। লোকটা তখন ইসলামের বিপক্ষে চলে যাবে। প্রকৃতপক্ষে সমস্যা হচ্ছে, হাতেগোনা কিছু লোক তাদের নিজেদের উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে চাচ্ছে। কারণ তারাই 'দ্যা ওয়ার্ল্ড অব ফতোয়া'র মতো বইগুলো লিখেছে। [১৯]

চিন্তা করুন, প্রায় চল্লিশ বছর আগে আমেরিকার সাথে যখন ভিয়েতনামের যুদ্ধ চলছিল, তখন যদি আমেরিকার আর্মি জেনারেলরা বা আমেরিকার প্রেসিডেন্ট যুদ্ধের ময়দানে আমেরিকান সৈন্যদের বলতেন যে, আমার সেনারা, তোমরা ভয় পেয়ো না। যেখানেই কোন ভিয়েতনামিকে দেখবে মেরে ফেল, এটা তারা বলেছেন সাহস দেয়ার জন্য। কিন্তু এখন যদি কেউ উদ্ধৃতি দেয় যে, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বলেছেন, কোন ভিয়েতনামিকে দেখলেই তোমরা মেরে ফেলবে। এখন কথাগুলো হাস্যকর হবে। সব কিছুরই একটা কারণ থাকে। তাই শানে নুযুল কে কুরআন সবচেয়ে বেমী গুরুত্ব দিয়েছে।

---

১৯ ডা. জাকির নায়েক, ইসলাম ও সন্ত্রাসবাদ।

www.amarboi.org

সমরকৌশলী রাসূল (সা.) ও আজকের পৃথিবী

আজকের সময়ে এ কথা না যত সহজে কতিপয় ইতিহাস বিকৃতকারী ও মিথ্যাবাদী ব্যক্তিরা বলে ফেলেন যে, মুহাম্মদ (সা.) এর তলোয়ারের জোরে ইসলামের বিজয় ও সম্প্রসার হয়েছে কিন্তু একটু তাকিয়ে দেখেন না যারাই শান্তি, স্বস্তি, মানবতা মনুষ্যত্ব আর নিরাপত্তার কথা বলে শ্লোগান দিচ্ছে, তারা কী করছে আর মানবতার বন্ধু মুহাম্মদ (সা.) এর পরিচালিত আন্দোলন কতটুকু শান্তি স্বস্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে ইতিহাসের নিরিখে এবার দেখা যাক সেই কাহিনী।

রাসূল (সা.) এর সামরিক পদক্ষেপগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, বদর থেকে মক্কা বিজয় পর্যন্ত (খয়বর বিজয়সহ) মোট পাঁচটি বড় আকারের যুদ্ধ হয়েছে। বাস্তবিক পক্ষে এই সব ক'টা যুদ্ধই ছিল আত্মরক্ষামূলক। তন্মধ্যে প্রথম তিনটি তো হয়েছে– শত্রুরা আগ্রাসন চালিয়ে মদিনার ওপর হানা দেয়ার কারণে। মদিনা থেকে সৈন্য নিয়ে গিয়ে নিজ উদ্যোগে রাসূল (সা.) বড়জোর দুটো অভিযানই চালিয়েছেন : একটা মক্কা বিজয়ের (হোনায়েন যুদ্ধসহ) অভিযান অপরটা খয়বর বিজয়ের অভিযান।[২০]

আর এই দুটো অভিযানেই চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়ে গিয়েছিল সময়ের দিক দিয়ে দেখলে বদরের যুদ্ধ থেকে মক্কা বিজয় পর্যন্ত মোট ছয় বছরের ব্যবধান। রাসূল (সা.) তাঁর মহান শিক্ষামূলক, প্রচারমূলক, গঠনমূলক ও সংস্কারমূলক কাজে মোট ২৩ বছর সময় কাটিয়েছেন। এর মধ্যে মাত্র ছ'টা বছর ছিল এমন, যখন শিক্ষামূলক কাজের পাশাপাশি বিরোধীদের যুদ্ধংদেহি মনোভাব ও আচরণের মোকাবেলাও করতে হয়েছে। সর্বাধিক অতিরঞ্জিত করেও যদি অনুমান করা হয়, তবুও মনে হয়, সব ক'টা যুদ্ধে সর্বমোট ১৫ হাজারের চেয়ে বেশি লোক রাসূল (সা.) এর মোকাবেলায় আসেনি এবং তাদের মধ্য থেকে মাত্র ৭৫৯ জীবনকে পথ থেকে সরানোর মাধ্যমে আরবের কয়েক লক্ষ মানুষ সম্পূর্ণরূপে শুধরে যায়। দশ বছর ইতিহাসে অত্যন্ত ক্ষুদ্র সময়। এত অল্প সময়ে আরবের ন্যায় মরুভূমিকে মানুষের জীবনের সঠিক কল্যাণের লক্ষ্যে একটা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পরিণত করা, ইতস্তত ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসবাসকারী, চরম উচ্ছৃঙ্খল হিংস্র ও দাঙ্গাবাজ গোত্র ও ব্যক্তিবর্গকে এর আওতাভুক্ত করা, তারপর তাদেরকে সুমহান নৈতিক শিক্ষা দানে সাফল্য অর্জন করা এবং শুধু শিক্ষা দেয়া নয়, বরং সমগ্র মানবজাতির জন্য তাদেরকে শিক্ষক ও উস্তাদে পরিণত করা সম্ভবত রাসূল (সা.) এর নবুওয়তের সবচেয়ে বড় বাস্তব ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অলৌকিক প্রমাণ।

---

২০ নঈম সিদ্দিকী, মানবতার বন্ধু মুহাম্মদ (সা.), শতাব্দী প্রকাশনী।

www.amarboi.org

সুতরাং এ বিষয়টি সকল সন্দেহ ও বিতর্কের উর্ধ্বে যে, ইসলামের বিপ্লবী আন্দোলনের সাথে জাহেলিয়াতের দ্বন্দ্ব সংঘাতের নিষ্পত্তিতে যুদ্ধ বিগ্রহের যতটুকু অবদানই থাকুক না কেন, জনমতের অবদানই ছিল সর্বাধিক এবং জনমতের অঙ্গনই ছিল নিষ্পত্তির অসল অঙ্গন। কিছুটা আধ্যাত্মিক ভাষায় যদি বলি তবে বলা যায়, মানুষের হৃদয় জয় করাই ছিল রাসূল (সা.) এর আসল বিজয় ও আসল সাফল্য। আরবের লক্ষ লক্ষ নর-নারীকে তিনি যদি জয় করে থাকেন, তবে তাদের হৃদয়ই জয় করেছেন এবং তা করেছেন যুক্তি ও চরিত্রের অস্ত্র দিয়ে। এ বিষয়টা যে, সর্বাধিক থেকে নিত্যনতুন প্রতিবন্ধকতার মুখেও অল্প দিনের মধ্যে দশ বারো লক্ষ বর্গমাইল এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিপুলসংখ্যক আদম সন্তানকে ইসলামের অনুসারী বানানো কিভাবে সম্ভব হলো? আসল ব্যাপার হলো, দাওয়াত যদি সত্য ও সঠিক হয়, আন্দোলন যদি মানবকল্যাণের লক্ষ্যে পরিচালিত হয় এবং এর পতাকাবাহীরা যদি ত্যাগী ও নিষ্ঠাবান হয়, তবে বিরোধিতা ও প্রতিরোধ বিপ্লবী কাফেলার জন্য অধিকতর সহায়ক হয়ে থাকে। প্রত্যেক বাধা এক একটা পথপ্রদর্শক হয়ে আসে। এই জন্যই যদিও সংখ্যালঘু দিয়েই সত্যের সূচনা হয়ে থাকে কিন্তু তা সংখ্যাগুরুকে জয় করে থাকে।

প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের চিত্র

অথচ আমরা যদি প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের চিত্রের প্রতি লক্ষ্য করি তাহলে দেখা যায়- প্রথম বিশ্বযুদ্ধে সামরিক ও বেসামরিক মিলিয়ে কমপক্ষে দেড় কোটি লোক নিহত হয়েছে। তাদের মধ্যে ৯০ লাখ ছিল সামরিক এবং ৭০ লাখ বেসামরিক। ত্রিপক্ষীয় আঁতাত হারায় ৫০ লাখের বেশি সৈন্য এবং সেন্ট্রাল পাওয়ার্স ৪০ লাখের বেশি। সামরিক মৃত্যু ৮৯,৫১,৩৪৬ বেসামরিক ৬৬,৪৪,৭৩৩ মোট ১,৫৫,৯৬,০৭৯ আহত ২,২৩,৭৯,০৫৩।[২১] আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর জার্মানির পোল্যান্ড আক্রমণের মধ্য দিয়ে সূচনা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বলি হয় অগণিত মানুষ, তা জনগণের জন্য নিয়ে আসে অকথ্য দুঃখ-দুর্দশা আর লাঞ্ছনা। এ যুদ্ধে নিহত হয় ৫ কোটিরও বেশি মানুষ। বৈষয়িক ক্ষয়ক্ষতির হিসাব দাঁড়ায় প্রায় ৪ লক্ষ কোটি ডলার। ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয় অসংখ্য শহর আর গ্রাম, বিলুপ্ত হয়ে যায় মানবপ্রতিভার বহু মহান সৃষ্টি। ক্ষত রোগ আর অনাহারের দরুন বিকলাঙ্গ হয়ে পড়ে কোটি কোটি মানুষ।[২২] তাহলে এখান থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় কারা রক্ত পিপাসু আর কারা রক্তের মর্যাদা রক্ষা করতে চেয়েছে বর্তমান সভ্যতার কে অঙ্গুলি দিয়ে সে হিসাব কষে দিয়েছে।

---

২১ সাহাদত হোসেন খান, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, ঢাকা ঃ আফসার ব্রাদার্স।
২২ ভিক্তর মাৎসুলেনকো, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, সাহিত্য প্রকাশনালয়।

www.amarboi.org

www.amarboi.org

দ্বিতীয় অধ্যায়

মানুষ আল্লাহর মনোনীত প্রতিনিধি

পৃথিবীতে মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব নিয়েই এসেছে। মানুষ নিছক কোন প্রাণী নয় যে তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য এখানেই পূরণ হয়ে যাবে। প্রকৃতির নিয়মানুসারে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত এখানে অবস্থান করবে। এবং এখানেই মৃত্যু বরণ করবে এবং নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। কিন্তু তার আজাব বা শাস্তির স্থান এটা নয় যেমনটা খ্রিষ্টান পাদ্রিরা মনে করে। প্রতিদানের ক্ষেত্রও এটা নয় যেমনি জন্মান্তরবাদীরা মনে করে। চারণ ক্ষেত্র বা বিনোদন কেন্দ্রও এটা নয় যেমনটা বস্তুবাদীরা মনে করে, আবার দ্বন্দ্ব ও সংগ্রাম ক্ষেত্রও নয় যেমনটি ডারউইন ও মার্কসবাদীরা মনে করে।[২৩]

দুনিয়া মুমিনের জন্য পরীক্ষাগার

দুনিয়া মূলত মুমিনের জন্য একটি পরীক্ষাগার। এখানে বয়স বা আয়ুষ্কাল হলো পরীক্ষার সময়, দুনিয়ার ক্ষমতা ও যোগ্যতা এবং সুযোগ সুবিধা তার মর্যাদা ও অবস্থান হলো পুঁজি। আর অন্যান্য মানুষের সাথে তার যে সম্পর্ক বিদ্যমান তার সবই মূলত অসংখ্য পরীক্ষাপত্র। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে যে যত দায়িত্ব বা ক্ষমতার অধিকারী তার পরীক্ষাপত্র সংখ্যা ও জবাবদিহিতাও তত বেশি।

এখন মূল কথাটি হচ্ছে মানুষ নিজের ব্যাপারে কী ভাবছে? সে যদি নিজেকে বহুসংখ্যক ইলাহের বান্দা মনে করে তাহলে তার জবাবদিহি করতে হবে না। যদি এমন চিন্তা লালন করে তাহলে তার কর্মতৎপরতা হবে উচ্ছৃঙ্খল বা অসামাজিক। এ ক্ষেত্রে সেই লোকটি শুধু একাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে তা নয় বরং

---

২৩ সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী, তাফহীমুল কুরআন, ঢাকা ঃ আধুনিক প্রকাশনী।

www.amarboi.org

দুনিয়ার জীবনে তার সাথে সম্পর্কিত অন্য সবাই তার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। দুনিয়ার জীবনে জুলুম নির্যাতন বে-ইনসাফি, অনাচার-দুরাচারের শিকার হবে। উন্মত্ত হিংস্র সিংহ যেমনি কোন জনপদের জন্য ভয়ানক এই মানুষগুলোও তেমনি ভয়ানক মানবসমাজ ও সভ্যতার জন্য। আর মানুষ যদি নিজেকে এক আল্লাহর বান্দাহ এবং তারই কাজে জবাবদিহিতার অনুভূতিকে লালন করে তাহলে তার কর্ম হবে এর সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি পরকালেই শুধু সফল বা উত্তীর্ণ হবেন না বরং দুনিয়ায় তার সাথে সম্পর্কিত প্রত্যেকটি ব্যক্তির নিকট থেকে কল্যাণ ছাড়া কিছুই পাবে না। এই কৃতজ্ঞতা ও কল্যাণের পথ এবং অকৃতজ্ঞতা ও অকল্যাণের পথ আল্লাহ মানুষকে পৃথক পৃথক করে দেখিয়েছেন। আল্লাহ বলেন,

إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا

"আমি তাকে (চলার) পথ দেখিয়ে দিয়েছি, সে চাইলে (আল্লাহর) কৃতজ্ঞ হবে, না হয় কাফের হয়ে যাবে।" (সূরা দাহর-৩)

আর যে পথই সে অবলম্বন করবে তার জন্য নিজেই দায়ী থাকবে। সূরা বালাদে বলা হয়েছে-আমি তাকে দু'টি পথ (অর্থাৎ ভাল ও মন্দ পথ স্পষ্ট করে দেখিয়ে দিয়েছি। সূরা সামসে এভাবে এসেছে– 'শপথ মানুষের প্রবৃত্তির আর যে সত্তার যিনি তাকে (সব রকম ব্যক্তিকে) ও অভ্যন্তরীণ শক্তি দিয়ে শক্তিশালী করেছেন। আর পাপাচার ও তাকওয়া পরহেজগারির। মানব সমাজকে সুসভ্য করার কারিগর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। নবী রাসূলগণ তারা সকলেই ছিলেন তাদের কালের সেরা মানুষ। আর সর্বকালের শ্রেষ্ঠ মানুষ ছিলেন আমাদের প্রিয়নবী মুহাম্মদ (সা.)। কিন্তু একটি দাওয়াতকে কেন্দ্র করে আল্লাহ তা'য়ালা সকল আম্বিয়ায়ে কেরামকে পাঠিয়েছেন, আর একটি বিপ্লবী আহবানকে কেন্দ্র করেই মূলত পৃথিবীর এই শ্রেষ্ঠ মানুষগুলোর বিরোধিতা করেছিল তাদের জামানার লোকেরা। শুধু বিরোধিতাই করেনি ইতিহাসের জঘন্যতম আচরণ করতেও তারা দ্বিধা করেনি।

মুমিনের জানমাল আল্লাহ খরিদ করেছেন

কিন্তু হাজারো বিরোধিতার পরও যে পরিবর্তনের কথা বলে তারা মানুষকে একত্রিত করেছেন আমরা খুব সূক্ষ্মভাবে লক্ষ্য করলে দেখতে পাব, তারা সঙ্ঘবদ্ধ সমাজ পরিবর্তন উদ্যোগটি সম্পূর্ণ করছেন ব্যক্তিসত্তার আমূল পরিবর্তনের মাধ্যমে। ইসলাম নিজের পরিবর্তনের মাধ্যমে জাতির পরিবর্তন নিশ্চিত করতে চায়। এ ক্ষেত্রে ছিল না কোনো রকমের শক্তি প্রয়োগ স্বযত্নে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় বদলে যাওয়ার দিকটি প্রাধান্য দিয়েছেন।

www.amarboi.org

কেননা ব্যক্তি থেকে পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্রের উৎপত্তি। বলতে গেলে রাষ্ট্রের উৎপত্তিস্থল ব্যক্তি থেকেই। এই পরিবর্তনের কাজে তিনি এত বেশি সফল হয়েছেন এজন্য যে তার নিজের চরিত্রের আকর্ষণ গোটা পৃথিবীকে আকৃষ্ট করেছিল। আল্লাহ বলেন, নিশ্চয়ই রাসূল (সা.)-এর জীবনাদর্শের মধ্যে রয়েছে তোমাদের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ। لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَ

এই দুনিয়া মানুষের জন্য কোন আরাম-আয়েশের জায়গা নয়। এখানে ভোগ বিলাসে মত্ত হয়ে আনন্দ-উল্লাস করার জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়নি। এবং এখানে কষ্টের মধ্যেই তার জন্ম হয়েছে। আর মুহাম্মদ (সা.)কে যে যেসব বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছে সেগুলো সমগ্র মানবজাতির সামনে এই সত্যটির সপক্ষে সাক্ষী হিসেবে পেশ করা হয়েছে।

الم - أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ -

"আলিফ-লাম-মীম। মানুষ কি মনে করে যে, তারা একথা বলেই অব্যাহতি পেয়ে যাবে যে, আমরা বিশ্বাস করি এবং তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না?"[২৪]

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়-আমি একজন ছাত্র এমনটি দাবি করার সাথে যেমনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার সম্পর্ক ঠিক তেমনি, আমি ঈমানদার এর সাথেও পরীক্ষার ব্যাপারটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মুমিনরা তো প্রাণের কথা ভাবেই না, এ তো কখন না কখন চলে যাবেই। চিরকাল থাকার জন্য কেউই এ পৃথিবীতে আসেনি। কাজেই এ দুনিয়ায় কিভাবে প্রাণ বাঁচিয়ে চলতে হবে এটা চিন্তার নয়। বরং আসল চিন্তার বিষয় হলো ঈমানকে কিভাবে বাঁচানো যাবে কিভাবে থাকা যাবে আল্লাহর আনুগত্যের গণ্ডির মধ্যে। যদি দুনিয়ায় প্রাণ বাঁচানোর জন্য ঈমান হারিয়ে ফেলে তাতো বিরাট এক ব্যর্থতা। তাহলে সে ঈমানের মূল্য কী? আর ঈমান বাঁচাতে যদি দুনিয়ায় প্রাণ বিসর্জিত হয় তাহলে এ এক মহা সফলতা। এতো ফলাফলের আকাশ-পাতাল পার্থক্যই শুধু নয়– এতে প্রাণ সৃষ্টির সার্থকতা পরিগ্রহ হবে। এমন মৃত্যু গৌরবের। এই মৃত্যুকে অভিনন্দন। সুতরাং প্রাণের জন্য উৎসর্গীত ঈমান আর ঈমানের জন্য উৎসর্গীত প্রাণ বড়ই ব্যবধান। এটি কখনও এক হতে পারে না। আর মুমিন ব্যক্তি যদি এই ঈমান ও নেকির পথে চলতে গিয়ে পার্থিব সকল নেয়ামত থেকেও বঞ্চিত হয় এটি পার্থিব দৃষ্টিতে

২৪ সূরা আনকাবুত, ১-২

www.amarboi.org

ব্যর্থতার হলেও আল্লাহর কাছে তার বিনিময় যদি জান্নাতই হয় তাহলে ঐ ব্যক্তি থেকে আর সফল কে হতে পারে? আল্লাহ বলেন-

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

আল্লাহ্ ক্রয় করে নিয়েছেন মুসলমানদের থেকে তাদের জান ও মাল এই মূল্যে যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা যুদ্ধ করে আল্লাহ্র রাহে: অতঃপর মারে ও মরে। তওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআনে তিনি এ সত্য প্রতিশ্রুতিতে অবিচল। আর আল্লাহ্র চেয়ে প্রতিশ্রুতি রক্ষায় কে অধিক? সুতরাং তোমরা আনন্দিত হও সে লেনদেনের ওপর, যা তোমরা করছ তাঁর সাথে। আর এ হলো মহান সাফল্য।[২৫]

যারা সব রকমের সমস্যা সঙ্কট বিপদ-আপদ, ক্ষতি ও কষ্টের মোকাবেলায় ঈমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে, যারা স্বেচ্ছায় ঈমান আনার বিপদ নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে আর কাফের ফাসিকদেরকে নিজেদের সামনে ফুলে ফেঁপে উঠতে দেখেছে এবং তাদের ধন-দৌলত ও ক্ষমতা প্রতিপত্তির দিকে ভুলেও নজর দেয়নি। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে আল্লাহর সন্তুষ্টিই তাদের উদ্দেশ্য।

সংঘবদ্ধ জীবন ছাড়া ইসলাম নেই

নিজেদের সহায়-সম্পত্তি, বংশ-পরিবারের ওপরও ভরসা করেনি। নিজের রবের ওপর ভরসা করেছে। এবং ঈমানের খাতিরে প্রত্যেকটি বিপদ সহ্য করেছে এবং প্রয়োজনে প্রত্যেকটি শক্তির সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার জন্য তৈরি হয়ে যায়। সময় এলে বাড়িঘর ছেড়ে বের হয়ে পড়ে। তারা নিজেদের রবের প্রতি এতটুকু আস্থা রাখে যে, ঈমান ও নেকির ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার প্রতিদান আল্লাহর কাছে কখনো নষ্ট হবে না বরং তার প্রতিদান হবে জান্নাত।

তারা তাদের মাবুদের সাথে তামাম জিনিসের বিনিময় করে শুধু একটি বাক্যের ভিত্তিতে "রাদিয়া আল্লাহু আনহুম অরাদু আন্হ"। পৃথিবীর সকল শক্তি মিলে যেমনি একটি প্রাণী হত্যা করতে পারে না, ঠিক তেমনি সবাই মিলেও একটি প্রাণীকে বাঁচাতে পারবে না। সারা পৃথিবীর সবাই একজনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেও তাকে যেমনি অসম্মানিত করতে পারে না, ঠিক গোটা পৃথিবীর একসাথ হয়ে চেষ্টা করেও কাউকে লাঞ্ছনার হাত থেকে বাঁচাতে পারবে না।

আল্লাহ বলেন-

---

২৫ সূরা তওবা, ১১১ আ:

www.amarboi.org

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

বলুন ইয়া আল্লাহ! তুমিই সার্বভৌম শক্তির অধিকারী। তুমি যাকে ইচ্ছা রাজ্য দান কর এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা রাজ্য ছিনিয়ে নাও এবং যাকে ইচ্ছা সম্মান দান কর আর যাকে ইচ্ছা অপমানে পতিত কর। তোমারই হাতে রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ। নিশ্চয়ই তুমি সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাশীল। তুমি রাতকে দিনের ভেতরে প্রবেশ করাও এবং দিনকে রাতের ভেতরে প্রবেশ করিয়ে দাও। আর তুমিই জীবিতকে মৃতের ভেতর থেকে বের করে আন এবং মৃতকে জীবিতের ভেতর থেকে বের কর। আর তুমিই যাকে ইচ্ছা বেহিসাব রিজিক দান কর।

কিন্তু এসব কিছুর মাঝেও এ বিপ্লবী ঘোষণায় অটল ও অবিচল থাকতে আহবান করলেন। আল্লাহ বলেন,

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ- وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে সুদৃঢ় হস্তে ধারণ কর; পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। আর তোমরা সে নেয়ামতের কথা স্মরণ কর, যা আল্লাহ্ তোমাদিগকে দান করেছেন। তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে। অতঃপর আল্লাহ্ তোমাদের মনে সম্প্রীতি দান করেছেন। ফলে, এখন তোমরা তাঁর অনুগ্রহের কারণে পরস্পর ভাই ভাই হয়েছ। তোমরা এক অগ্নিকুণ্ডের পাড়ে অবস্থান করছিলে। অতঃপর তা থেকে তিনি তোমাদেরকে মুক্তি দিয়েছেন। এভাবেই আল্লাহ নিজের নিদর্শনসমূহ প্রকাশ করেন, যাতে তোমরা হেদায়েতপ্রাপ্ত হতে পার। আর তোমাদের মধ্যে এমন একটা দল থাকা উচিত যারা আহবান জানাবে সৎকর্মের প্রতি, নির্দেশ দেবে ভাল কাজের এবং বারণ করবে অন্যায় কাজ থেকে, আর তারাই হলো সফলকাম।[২৬]

এই সংঘবদ্ধ জীবন ছাড়া ইসলাম নেই আর এই সংঘবদ্ধতার আদলে একটি আদর্শকে কেন্দ্র করেই মূলত গড়ে ওঠে আন্দোলন বা সংগঠন। এটি যেমনি

২৬ সূরা আল-ইমরান, ১০৩-১০৪।

www.amarboi.org

একদিনে হঠাৎ করে গড়ে ওঠে না, তেমনি আবার চাইলেই তা নিঃশেষ করাও সম্ভব নয়। পৃথিবীর সকল আদর্শবাদী আন্দোলন মানুষকে সংগঠিত করেছে নিঃশ্বাস, ত্যাগ আর উৎসর্গ তার শ্লোগানে। যদিও মানবরচিত আদর্শের মোড়কে এই আন্দোলনগুলোর একটি অংশের নিকট স্বার্থের বিষয়টি ছিল পরিষ্কার আর অপর বিরাট অংশের আন্দোলনে নিঃস্বার্থতা, আত্মত্যাগের পেছনে কোন ব্যক্তির নেতৃত্বের প্রতি অগাধ ভালবাসা, আবেগ ও আদর্শের বাস্তবায়ন ও পরবর্তী প্রজন্মের মুক্তি ইত্যাদি বিষয় কাজ করেছে। যেমন ফরাসি বিপ্লব, রুশ বিপ্লব, শ্রেণী-সংগ্রাম, মুক্তি আন্দোলন ইত্যাদি।

কিন্তু ইসলামী আন্দোলন এ সকল কিছু থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। আবার বলতে গেলে এই সকল মুক্তি আন্দোলন থেকে আরো অনেক ধাপ এগিয়ে। এই আন্দোলন ব্যক্তি, জাতি, দেশ ও ভাষার জাতীয়তাবাদের খোলসমুক্ত। তাদের ভালবাসার ভিত্তি আল্লাহ ও রাসূল। আদর্শ হচ্ছে শাশ্বত বিধান আল ইসলাম। মুক্তির টার্গেট দেশ জাতির গণ্ডি পেরিয়ে বিশ্বমানবতার। তাদের এ ভালবাসার চৌহদ্দি নদী-সাগর পেরিয়ে মহাসাগরের মত উদার। যারা বিশ্বমানবতার মুক্তি টার্গেট বানিয়েছে তারা কি বাড়ির দারোয়ান কিংবা প্রতিবেশীর বিরোধিতাই অধৈর্য, ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত। না তাদের মনজিল বহু থেকে বহু দূরে অনেক কণ্টকাকীর্ণ পথ পরে। তারা কি অপ্রচারের সামান্য ভাষায় ক্ষিপ্ত, ক্রুদ্ধ, না তাদের পূর্বসূরিদের ইতিহাস আরো অনেক বেশি সংজ্ঞাপন্ন। কিন্তু তারা সঙ্কটাপন্ন সকল কিছুকে অতিক্রম করে এ জমিনে আল্লাহর দ্বীন কায়েমে বদ্ধপরিকর।

তাইতো আমাদের প্রিয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের কণ্ঠে-
আবুবকর উস্‌মান উমর আলী হায়দর
দাঁড়ি যে এ তরণীর, নাই ওরে নাই ডর!
কাণ্ডারী এ তরীর পাকা মাঝি মাল্লা,
দাড়ি-মুখে সারি গান-লা শরীক আল্লাহ্!

www.amarboi.org

মানুষের মর্যাদা দিয়েছে ইসলাম

আজকের এ সভ্যতায় মানুষের মর্যাদা যতটুকু এখনও অবশিষ্ট, তা মূলত ইসলামে কারণে পাওয়া এবং ইসলাম সেই সংরক্ষণের রক্ষাকবচ এই সভ্যতার উত্তাল তরঙ্গের মাঝে বিশ্ব মানবতার জন্য রহমত নিয়ে যিনি আবির্ভূত হলেন। আল্লাহর বাণী-

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ

আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্যে রহমতস্বরূপই প্রেরণ করেছি। মানুষ যখনি বুঝতে পারল তিনি মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য একজন সাহসী যোদ্ধা, নিঃস্বার্থ পথিক ও লোভ-লালসামুক্ত অভিযাত্রী, তখনই তারা জীবন বাজি রেখে সে আদর্শের দিকে ছুটে গেল। সে আদর্শের সুঘ্রাণে মোহিত হয়ে অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে সমবেত হয়েছে ইসলামের সুমহান পতাকাতলে। এই মহান আদর্শ তাদের অন্তঃকরণকে করেছে শাণিত। জীবন উৎসর্গ করতে হয় পাগলপারা। তাদের কাছে পার্থিবতা হলো মূল্যহীন আর ত্যাগেই খুঁজে পেল সুখ। অধিকার রক্ষা করাকে বানাল নিজের দায়িত্ব। এ যেন লোহার আকর্ষণে চুম্বক যেমন একমুখী, ঠিক তেমনি গোটা মানব সভ্যতা মুহাম্মদ (সা.) মুখী হয়ে গেল। "মহানবী মুহাম্মদ (সা.) কর্তৃক সংঘটিত বিপ্লব ছিল একটি প্রচণ্ড অগ্নিস্ফুলিঙ্গ যা দিল্লি থেকে গ্রানাডা এবং দুনিয়া থেকে আসমান পর্যন্ত যে অবমানবতা ও অসত্যের আবর্জনা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল, তা চোখের নিমেষে পুড়ে ছারখার করে দিল।" জর্জ বার্নার্ড শ তাঁর "Getting Marred' গ্রন্থে লিখেছেন- "If all the world was to be united under one leader then Muhammad (S.M) would have been the best fitted man to lead the people of various needs dogmas and ideas to peace and happiness."

"যদি সমগ্র বিশ্বের ধর্ম, সম্প্রদায়, আদর্শ ও মতবাদসম্পন্ন মানবজাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে কোন নায়কের শাসনাধীনে আনীত হতো, তা একমাত্র মুহাম্মদই (সা.) সর্বাপেক্ষা সুযোগ্য নেতারূপে তাদের শান্তি ও সমৃদ্ধির পথে পরিচালিত করতে পারতেন।"

ঐতিহাসিক ড. গ্রেফটাউলি "Asib Civilization" গ্রন্থে লিখেছেন, "ইসলামের যে উম্মি নবীর ইতিবৃত্ত বহু আশাজনক। তৎকালের কোন বৃহৎ শক্তি যে জাতিকে নিজের আওতায় আনতে পারেনি, সে উচ্ছৃঙ্খল জাতিকে তিনি তাঁর আওতায় বশীভূত করেছেন।"

www.amarboi.org

Ernold Twinoby বলেছেন, মুহাম্মদ (সা.) ইসলামের মাধ্যমে মানুষের মধ্যকার বর্ণ, বংশ এবং শ্রেণীগত পার্থক্য সম্পূর্ণরূপে খতম করে দিয়েছেন। কোন ধর্মই এর চেয়ে বড় সাফল্য লাভ করতে পারেনি যে সাফল্য মুহাম্মদ (সা.) এর ধর্মের ভাগ্যে জুটেছে। আজকের বিশ্ব যার অভাবে অশ্রুপাত করছে সে অভাব কেবলমাত্র মুহাম্মদী সাম্যনীতির মাধ্যমেই মেটানো সম্ভব। মানুষের মধ্যকার বর্ণ, বংশ, গোত্র ও শ্রেণীগত পার্থক্যকে চুর্ণ করে একমাত্র মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে মানুষের মূল্যায়ন একমাত্র তিনিই প্রবর্তন করেছিলেন।

শ্রেষ্ঠ ধর্ম ইসলাম যে গ্রহণ করলো সে আর ছাড়তে জানলো না, যে বুঝলো সে আর কখনও কেটে পড়ল না। কারণ সেই অসভ্য উচ্ছৃঙ্খল নির্যাতিত বনি আদমগুলো ফিরে পেয়েছে তাদের অধিকার ও মর্যাদা। নারী-পুরুষ, মনিব-ভৃত্য, মালিক-শ্রমিক, ধনী-গরিব, আরব-অনারব, বন্দী-স্বাধীন, ছোট-বড়, পিতা-মাতা, স্বামী-স্ত্রী, এক কথায় প্রত্যেকেই বুঝে পেয়েছে তাদের স্ব স্ব অধিকার। এই ভাবে কেটে যেতে শুরু করে অমানিশার ঘোর অন্ধকার। সোনার পরশে মুগ্ধ হলেন আবু বকর, ওমর, ওসমান, আলী (রা.)সহ অনেকেই। যারা রাসূলের (সা.) ইন্তিকালের পরও সমাজ এবং সভ্যতার প্রত্যেকটি মানুষকে তাদের ন্যায্য অধিকার বুঝিয়ে দিতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। আজ অবধি মানুষ যতটুকু অধিকার পাচ্ছে, এটি তারই ধারাবাহিকতা মাত্র।

তিনি শুধু মুসলমানদেরই স্বীকৃত কোন নেতা ছিলেন না। তিনি ছিলেন অতীত, বর্তমান এবং অনাগত ভবিষ্যতের একমাত্র পথপ্রদর্শক। স্থান-কাল-বর্ণ-গোত্র কোন কিছুই তাকে স্পর্শ করতে পারেনি। তিনি কেমন; এটা শুধুমাত্র তাকে দিয়েই মূল্যায়ন করা সম্ভব। আর এই উম্মি মহামানবের সম্পর্কে বিশ্বের মহাজ্ঞানীরা যেসব মন্তব্য করেছেন তা আরো বিস্ময়কর। অবশ্য এ বক্তব্য দিয়ে তারা সত্য গ্রহণ না করে ইতিহাসে নিজেদের টিকিয়ে রাখার কৌশলটিও নিয়েছে।

১৯৭৮ সালে আমেরিকায় 'The Hundred Ranking of the most influential person in history' নামক একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি দারুণ আলোড়ন সৃষ্টি করে। কারণ গ্রন্থটির প্রণেতা আমেরিকার M.H. Heart নিজে খ্রিষ্টান, তাই হযরত ঈসা (আ.) এর নাম সর্বাগ্রে থাকার কথা। কিন্তু তা না করে সর্বাগ্রে স্থান দিয়েছেন মুহাম্মদ (সা.)কে। তার কারণ সম্পর্কে লেখক লিখেছেন, 'He was the only successful on both the religion and secular levels.' তিনিই একমাত্র ধর্ম ও ধর্মনিরপেক্ষ উভয় দিক দিয়েই কৃতকার্য।

www.amarboi.org

মাইকেল হার্ট ছিলেন পাশ্চাত্যের শীর্ষস্থানীয় মনীষী। তার অসংখ্য ভক্ত ছিল। গ্রন্থটি প্রকাশের পর অনেকে তাকে এ বলে চিঠি লিখেছিল, মাইকেল তুমি পাগল হলে নাকি যে ইসলামের নবী মুহাম্মদ (সা.) কে তোমার বইয়ে সর্বাগ্রে স্থান দিয়েছ? উত্তরে মাইকেল হার্ট লিখলেন, 'প্রিয় বন্ধুরা, আসলে আমি পাগল হইনি, যার নাম আমি সর্বাগ্রে স্থান দিয়েছি সমগ্র পৃথিবী তাঁর জন্য পাগল হয়েছে'।

টমাস কার্লাইল মন্তব্য করেন, "The revolution brought by Prophet Muhammad (S.M) was a great spark of fire which withen a twinkly of an eye burnt out all the rubishes of inhumanities and untruth that erected their heads from Delhi of Granada and from earth to sky."

সিকি শতাব্দীর ন্যায় ক্ষুদ্র সময়ে এ শিক্ষা এক অভাবনীয় পরিবর্তন সাধন করেছিল। এর বদৌলতে তৎকালীন আরব জাতির ন্যায় একটি নরখাদক ও হিংস্র স্বভাবের মানবগোষ্ঠীর মনে মানুষের জীবনের প্রতি পূর্ণ সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ এবং শান্তি ও শৃঙ্খলার প্রতি অটুট আনুগত্যবোধ জন্মলাভ করেছিল। হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) এর ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়েছিল যে, কাদেসিয়া থেকে সানআ পর্যন্ত একটি মেয়ে একাকিনী ভ্রমণ করবে এবং কেউ তার জান-মাল ও ইজ্জতের ওপর হামলা চালাবে না অথচ এই অঞ্চলে ২৫ বছর পূর্বে বড় বড় কাফেলাও নির্ভয়ে চলতে পারতো না। অতঃপর যখন সভ্য জগতের অর্ধেকেরও বেশি অংশ ইসলামী রাষ্ট্রের আওতাভুক্ত হলো এবং ইসলামের নৈতিক প্রভাব বিশ্বের চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লো তখন ইসলাম মানবজাতির অন্যান্য ত্রুটি-বিচ্যুতির ন্যায় হিংস্রতা ও নৃশংসতারও মূলোৎপাটন করে। আজকের সভ্য দুনিয়ায় মানুষের প্রাণের প্রতি মর্যাদাবোধ যতখানি গুরুত্ব লাভ করেছে, তা ইসলামের এই সর্বাত্মক বিপ্লবের একটা গৌরবময় অবদান। ইসলামের মহান শিক্ষা বিশ্বের নৈতিক পরিমণ্ডলে এ বিপ্লব এনেছিল। অথচ ইসলামের অনুপস্থিতিতে অন্যথায় যে অন্ধকার যুগে এ শিক্ষা অবতীর্ণ হয়েছিল, তাতে প্রকৃতপক্ষে মানুষের প্রাণ-সত্তার কোন দামই ছিল না। এ প্রসঙ্গে আরবদের হিংস্রতা ও প্রতিহিংসাপরায়ণতার কথা বিশ্ববাসীর জানাই আছে। কিন্তু যেসব দেশ সে সময় পৃথিবীর সভ্যতা, কৃষ্টি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের পাদপীঠ ছিল, সেগুলোর অবস্থাও তেমন ভালো ছিল না। রোমের কোলোসিয়াম (Colosseum)- এর কাহিনী আজও ইতিহাসের পাতায় সংরক্ষিত। তরবারির খেলা (Gladiatory) ও রোমক আমির-ওমরাহদের অন্যান্য আমোদ প্রমোদের প্রয়োজনে হাজার হাজার মানুষের জান উৎসর্গ হয়ে যেত। অতিথি ও বন্ধুবান্ধবের মনোরঞ্জনের জন্য দাসদেরকে হিংস্র জন্তু দিয়ে খাইয়ে দেয়া হতো,

www.amarboi.org

জন্তু-জানোয়ারের মত জবাই করা হতো। কিংবা আগুনে পুড়িয়ে আমোদ করা হতো। এশিয়া ও ইউরোপের অধিকাংশ দেশেই এসব অবাধে চলতো। কোথাও এসবকে নিন্দনীয় মনে করা হতো না। কয়েদি ও দাসদেরকে বিভিন্ন উপায়ে নির্যাতন করে হত্যা করা সে সময়কার একটা সাধারণ ব্যাপার ছিল। শুধু অজ্ঞ ও হিংস্র স্বভাবের ওমরাহগণই নয়, গ্রিস ও রোমের বড় বড় দার্শনিক ও পণ্ডিত পর্যন্ত বিনা অপরাধে নরহত্যার কতিপয় অমানুষিক পন্থা সমর্থন করতেন ও বৈধ মনে করতেন। এরিস্টটল ও প্লেটোর ন্যায় নীতিবাগিশ মনীষীদ্বয় গর্ভপাতকে দূষণীয় মনে করতেন না। ফলে সমগ্র গ্রিস ও রোমে গর্ভপাত বৈধ হয়ে গিয়েছিল। পিতা নিজের সন্তানকে হত্যা করলে আইনত তা অপরাধ হতো না বরঞ্চ রোমক আইন রচয়িতারা সন্তানের ওপর পিতার এমন সীমাহীন ক্ষমতার বিধান থাকায় নিজেদের আইন নিয়ে গর্বিত ছিলেন।[২৭] অন্য একটি পণ্ডিতগোষ্ঠী (Stoicks) এর মতে আত্মহত্যা কোন খারাপ কাজ ছিল না। একে তারা এতটা সম্মানজনক বলে পরিচিত করে তুলেছিলেন যে, লোকেরা বড় বড় জনসমাবেশ আহ্বান করে তার মধ্যেই আত্মহত্যা করতো, এমনকি প্লেটোর মত পণ্ডিত ব্যক্তিও একে পাপ মনে করতেন না। তাছাড়া স্বামীর পক্ষে স্ত্রীকে হত্যা করা গৃহপালিত জন্তু জবাই করার মতোই আইনসিদ্ধ ব্যাপার ছিল। গ্রিস আইনে এর জন্য কোন শাস্তির বিধান ছিল না। এ ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি অগ্রসর ছিল ভারত। এখানে পুরুষের লাশের ওপর জ্যান্ত স্ত্রীকে পুড়িয়ে দেয়া শুধু বৈধই ছিল না। বরং ধর্মত তার ওপর জোর দেয়া হতো। শুদ্রের প্রাণের কোন মূল্যই ছিল না। শুদ্র ব্রহ্মার পা থেকে সৃষ্টি হয়েছে বলে ব্রাহ্মণের জন্য তার রক্ত বৈধ ছিল। বেদের শব্দ শোনা শুদ্রের জন্য এত বড় পাপ ছিল যে, তার কানে গলানো সীসা ঢেলে তাকে হত্যা করা শুধু বৈধই ছিল না, জরুরিও ছিল। 'বিসর্জন' প্রথা অনুসারে পিতামাতা তাদের প্রথম সন্তানকে গঙ্গা নদীতে ভাসিয়ে দিত এবং একে নিজেদের জন্য মহাপুণ্যের কাজ মনে করতো। উপরি উক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সকল ধর্মই নিজেদের সুযোগ সুবিধার দিকটি চিন্তা করে মানুষের মর্যাদা দিয়েছে, করেছে মানুষের মধ্যে শ্রেণী বিভাগ। একমাত্র ইসলামই এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। ঘোষণা করে মানুষ হচ্ছে সৃষ্টির সেরা জীব আশারফুল মাখলুকাত।

---

২৭ মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদূদী, আল জিহাদ, ঢাকা ঃ আধুনিক প্রকাশনী।

www.amarboi.org

ইসলামের রাজনৈতিক শিক্ষা

ইসলাম মানবজীবনের এমন একটা পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা যার অংশ রাজনৈতিক ব্যবস্থা বিশ্বজুড়ে বিদ্যমান। কিন্তু একথা সুস্পষ্ট হয়নি যে, রাজনৈতিক ব্যবস্থা ইসলামী জীবন বিধানের কিরূপ অংশ এবং কতখানি গুরুত্বপূর্ণ। কেননা যাকে আমরা রাজনীতি বলি, তা মানবজীবনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। বিশেষ করে বর্তমানকালে তার ব্যবহার ও প্রভাব এতখানি বেড়ে গেছে যে, জীবনের ছোটখাটো ব্যক্তিগত ব্যাপারে এবং সমস্যাও পুরোপুরি তার আওতার বাইরে রয়ে যায়নি। বরং গোটা জীবনটাই যে রাজনৈতিক চাদর দিয়ে মোড়ানো। আল্লাহ মানুষের 'রব' এবং 'ইলাহ', যার 'রবুবিয়ত' ও 'উলুহিয়াতের মধ্যে বাদশাহী ও হুকুম শাসন করার অধিকারও শামিল আছে। এর স্পষ্ট অর্থ এই যে, মানুষের প্রকৃত শাসনকর্তা এবং আইনপ্রণেতা একমাত্র আল্লাহ তায়ালা। এটা তাঁর সর্বস্বীকৃত ও গুরুত্বপূর্ণ গুণাবলির অন্যতম। যতক্ষণ পর্যন্ত এ গুণাবলির প্রতি মানুষের প্রত্যয় না জন্মাবে তাকে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়নকারী বলে স্বীকারই করা যাবে না।

আল্লাহর সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতেই মানুষের রাজনৈতিক জীবন

এ কথা একটা স্থিরীকৃত এ কথা সত্য যে মানুষের সত্যিকার শাসক,সর্বময়কর্তা ও আইনপ্রণেতা আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ নেই, তাহলে এ আসলে অন্য দিক দিয়ে এ কথারই নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যে আল্লাহ তায়ালার অদ্বিতীয় সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতেই মানুষের রাজনৈতিক জীবন গড়ে তুলতে হবে।[২৮] আল্লাহ বলেন-

اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ

তুমি কি জান না যে, আল্লাহ্‌র জন্যই নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের আধিপত্য? আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের কোন বন্ধু ও সাহায্যকারী নেই।[২৯]

وَهُوَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُوْلُ كُنْ فَيَكُوْنُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ

তিনিই সঠিকভাবে নভোমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন। যেদিন তিনি বলবেন : হয়ে যা, অতঃপর হয়ে যাবে। তাঁর কথা সত্য। যেদিন শিঙ্গায় ফুৎকার করা হবে, সেদিন তাঁরই আধিপত্য হবে। তিনি অদৃশ্য বিষয়ে এবং প্রত্যক্ষ বিষয়ে জ্ঞাত। তিনিই প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ।[৩০]

---

২৮ মাওলানা সদররুদ্দীন ইসলাহী, ইসলামের পূর্ণাঙ্গ রূপ।
২৯ সূরা বাকারা, ১০৭
৩০ সূরা আল-আনআম, ৭৩

www.amarboi.org

মানুষ যেহেতু আল্লাহর প্রতিনিধি সুতরাং আল্লাহ এই প্রতিনিধির মাধ্যমে সেই আইন মোতাবেক রাষ্ট্র, সমাজ পরিচালনার নির্দেশ প্রদান করেছেন। মানুষ যখন রাষ্ট্র পরিচালনায় আল্লাহর আইন বাদ দিয়ে নিজেদের তৈরি করা আইন দিয়ে মানুষকে শাসন কররেত চেয়েছে তখনই রাষ্ট্রের সকল পর্যায়ে গণ্ডগোল ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে। মানুষ যখনই ক্ষমতার উৎস জনগণ আর সার্বভৌমত্বের মালিক নিজে হয়ে বসেছে তখনই আল্লাহর আইন তাদের নিকট খেল-তামাশায় পরিণত হয়েছে। আর এই সুড়ঙ্গপথে ধর্মনিরপেক্ষতার শ্লোগান নিয়ে শয়তান প্রবেশ করে ধর্ম ও রাষ্ট্র আলাদা করার অপপ্রয়াস চালাচ্ছে। মানুষ যেহেতু আল্লাহর প্রতিনিধি সুতরাং আল্লাহ এই প্রতিনিধির মাধ্যমে সেই আইন প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদকেই বান্দার অনিবার্য কাজ বানিয়ে দিয়েছেন।

নবী-রাসূলদের জীবনে রাজনীতি

আল্লাহ যুগে যুগে, দেশে দেশে মানবসমাজের মধ্যে থেকে কিছু লোককে নবী ও রাসূল হিসেবে বেছে নিয়েছেন। যখনই কোন জাতির মধ্যে অন্যায়, অনাচার ও চারিত্রিক অবণতি প্রকটরূপ ধারণ করে, তখনই সেই সমাজের সংস্কার সংশোধনের জন্য তেমনি শক্তিশালী ও বলিষ্ঠ চরিত্রের অধিকারী সংস্কারকদের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। এই প্রয়োজনের কারণেই অসংখ্য নবী-রাসূলের আগমন। সভ্যতার ক্রমবিকাশের ধারায় যখন ধীরে ধীরে জাতি ও সমাজ উন্নতির পথে ব্যাপকতর করে মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন দাবি অনুযায়ী বিভিন্নভাবে বিভিন্ন নবী ও রাসূল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিলেন।

আল্লামা ইবনুল কাইয়েম রাজনীতির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন: এটা এমন এক বিধিব্যবস্থা যা কল্যাণকর কার্য এবং সামগ্রিক অবস্থার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা সম্পন্ন করার জন্য বিধিবদ্ধ করা হয়েছে।

অধ্যাপক লাস্কির ভাষায়, "কোন রাষ্টতত্ত্বই উহার সমসাময়িক অবস্থার প্রেক্ষিতে ছাড়া বোধগম্য হয় না।" তাই নবীজীবনের রাজনীতিকে বুঝতে হলে সমসাময়িক ইতিহাস সামনে থাক প্রয়োজন।

আমরা কুরআনে মাধ্যমে এবং তাঁদের সমসাময়িক অবস্থার চিত্র এবং তাদের রাজনৈতিক চিন্তা ও দর্শন সম্পর্কে একটি ধারণা পেতে পারি। অধ্যাপক জন সেলি বলেছেন, "রাষ্ট্রবিজ্ঞান ব্যতীত ইতিহাসের আলোচনা নিষ্ফল এবং ইতিহাস ব্যতীত রাষ্ট্রবিজ্ঞান ভিত্তিহীন।"

History without political science has on fruit and political science without history has no root.

www.amarboi.org

পৃথিবীর প্রথম মানুষ আর প্রথম নবী হযরত আদম (আ.)। তিনিই ছিলেন মানবসভ্যতার প্রথম ব্যক্তি। তখন সে সমাজটা গড়ে উঠেছিল তার কেন্দ্র ছিলেন তিনি নিজেই। তাই তাঁকে মানুষের জন্য আদি পিতা ও আদি শিক্ষাগুরুই বলা বেশি যুক্তিযুক্ত।

এরপর হযরত নূহ ও হযরত হুদ (আ.) তাঁরা তখনকার সমাজের লোকদের দাওয়াত দিচ্ছিলেন, "হে আমার কওম! তোমরা আল্লাহর এবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন উপাস্য নাই।" কিন্তু সমাজের লোকেরা তাদেরকে উপহাস করল। এই যে সমাজে বৈধ শৃঙ্খলা আনার প্রচেষ্টা, এটাকে শুধুমাত্র সংস্কারমূলক কাজ মনে হলেও তখনকার অবস্থান প্রেক্ষাপটে তাঁদের জন্য ঐ কাজটি ছিল এক বিরাট রাজনৈতিক কার্যকলাপ। আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী Almond I Colman এর মতে তাদের ঐ আন্দোলন রাজনৈতিকও ছিল। Almond & Colman বলেন, Political system is the legitimate order maintaining or transforming system in the society. রাজনৈতিক ব্যবস্থা হচ্ছে সমাজের বৈধ শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বা পরিবর্তন আনয়নকারী ব্যবস্থা। এই সূত্র মতে আদমের পর থেকে হযরত ইব্রাহিম, হযরত ইসমাইল ও হযরত লূত (আ.) প্রমুখের কথা। তাঁদের কাজ শুরু হয়েছিল আজ থেকে চার হাজার বছর আগে। আজকের রাষ্টবিজ্ঞানীরা রাজনৈতিক চিন্তাধারার যে প্রাচীর যুগ (খ্রিষ্টপূর্ব ৪৬৯ থেকে ২৬ অব্দ) ঠিক করেছেন তার আগে তারা রাজনৈতিক কার্যকলাপে নিজেদেরকে জড়িয়ে ছিলেন আল্লাহর নির্দেশে। আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মতে রাজনৈতিক কার্যকলাপ বলতে শুধুমাত্র সরকারি ক্ষমতার অধিকারীরাই নয় বরং সরকারি ক্ষমতার অধিকারীকে সংশোধন, তাদের কাজকর্মের সমালোচনা এবং সরকারি নীতির ভ্রান্তি প্রকাশ করে জনগণকে সচেতন করাও রাজনীতির অংশ। এই জন্য আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানে বিরোধী দলকে importent part of the government বলা হয়।

আর এই কাজগুলোকে যথেষ্ট দক্ষতার সাথে একই কালে ঐ নবীগণ চালিয়ে গেছেন, আর তাদের নেতৃত্বে ছিলেন হযরত ইব্রাহিম (আ.)। তিনি তখনকার সমাজের জনসাধারণকে বাদশাহির ভ্রান্ত নীতির দিকে নজর দিতে আহবান জান্নাচ্ছিলেন; ভ্রান্তনীতির সংশোধনের কথা বলেছিলেন। বাদশাহ নমরূদের সাথে তার সংঘর্ষ শুরু হলো। পরিণতিতে দেশদ্রোহিতার অপরাধে তাঁকে আগুনে পোড়ানোর চক্রান্ত করা হলো। ব্যর্থ হলো বাদশাহ। শেষ পর্যন্ত তাঁকে দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য করা হলো। আল্লাহর খলিল বাবেল ছেড়ে চলে গেলেন হারসে, সেখান থেকে মিসরে। মিসরের বাদশাহ তার ওপর জুলুম নির্যাতন চালালো। পরে তিনি এলেন ফিলিস্তিনে। এই যে এক দিকে বাদশাহ, অন্য

www.amarboi.org

দিকে নবী আর তাদের মধ্যে সংঘাত ও দ্বন্দ্বের ইতিহাস এটাকে শুধুমাত্র তাবলিগের ইতিহাস বললে সত্যের প্রতি অবিচার করা হবে বরং এটা ছিল মিথ্যার ওপর সত্যের বিজয়ের রাজনৈতিক ইতিহাস।

এবার দৃষ্টি ফেরানো যাক হযরত ইউসুফ (আ.) এর দিকে যিনি ছিলেন হযরত ইবরাহিম (আ.) এর প্রপৌত্র। তিনি তো চরিত্র মাধুর্য জ্ঞনের বদৌলতে লাভ করলেন মিসরের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা। নবুওয়তি কাজের সাথে সাথে চালালেন মিসরের শাসনকার্য অতি যোগ্যতার সাথে। এরপর হযরত মূসা ও হারুনের সাথে ফেরাউনে সংঘাতের ইতিহাস, হযরত শামুয়ের (আ.) তাঁর অনুসারী বাদশাহ তালুতের সাথে যালিত রাজ জারুতের দ্বন্দ্ব সংগ্রাম, জর্ডান নদীর তীরে উন্মুক্ত রণাঙ্গনে রাজা জালুতকে হযরত দাউদ (আ.) কর্তৃক হত্যা ও পরে রাজ্য শাসন, তাঁর পুত্র সোলেমান (আ.) এর রাজ্য শাসন, আল্লাহর ভাষায়, "সোলেমান ছিলেন উত্তম ও খাঁটি বান্দা।" এসব নবীর কার্যকলাপ কী বলা হবে? প্রকৃতপক্ষে নবুওয়তির বিভিন্ন কার্যকলাপের একটি উল্লেখ্যযোগ্য অংশই হলো রাজনৈতিক কার্যকলাপ। সুতরাং দেখা যায় যে, নবীদের আগমন ঘটেছিল আল্লাহর দ্বীন তথা আল্লাহর আইন সমাজের বুকে বাস্তবায়নের জন্য। এই আইন বাস্তবায়নের জন্য তাদেরকে বিভিন্ন পদ্ধতি ও কলাকৌশলের সাথে রাজনৈতিক কার্যকলাপ চালিয়ে যেতে হয়েছে যোগ্যতার সাথে। অতএব বলা চলে, সকল নবীর জীবনই ছিল রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত। তাদের মর্যদা ছিল রাসূল হিসেবে অনেক উর্ধ্বে। কিন্তু রাজনীতিবিদ হিসেবেও তাঁরা ছিলেন স্ব স্ব যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ যোগ্য ব্যক্তিত্ব, যোগ্য রাজনীতিবিদ। তাঁরা নবুওয়তির শক্তির অধিকারী হওয়ার সাথে সাথে অধিকারী হয়েছিলেন রাজনৈতিক ক্ষমতার। আলফ্রেডরি থ্রোজিয়ার ভাষায়- Power is the ability to make decisions influencing the behaviour of man মানুষের আচরণকে প্রভাবিত করার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার দক্ষতাই ক্ষমতা। আর এই ক্ষমতাকেই বলা হয় রাজনৈতিক ক্ষমতা। সমস্ত নবী রসূলগণই এই রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের ভাষায় তাঁরা ছিলেন সম্মোহনী নেতৃত্বের (Charismatic) অধিকারী।

হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জীবনে রাজনীতি

নবীদের জীবনের ইতিহাস থেকে সুস্পষ্ট হলো যে, তাঁদের জীবন ছিল আদর্শ ও ইনসাফের রাজনৈতিক জীবন, প্রতারণার রাজনীতি তাঁদেরকে স্পর্শ করতে পারেনি। যে দ্বীন প্রতিষ্ঠার ধারা শুরু হয়েছিল হযরত আদম (আ.) থেকে, তার পূর্ণতা এল হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর মাধ্যমে। অন্যসব নবীর জীবনে

www.amarboi.org

রাজনৈতিক ধারাও পূর্ণতা পেলো রাসূলের মাধ্যমে। তিনি সর্বযুগের সর্বকালের শ্রেষ্ট মানুষ। একইভাবে তিনি সর্বযুগের সর্বকালে আদর্শ রাজনীতিবিদ।

তাঁর দায়িত্ব সম্পর্কে আল্লাহর ঘোষণা : "তিনি সেই সত্তা যিনি তার রাসূলকে হেদায়েত ও দ্বীনে হকসহ পাঠিয়েছেন, যেন তিনি আর সব দ্বীনের ওপর একে (দ্বীনে হককে) বিজয়ী করে তুলেন। এ ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা পর্যবেক্ষক হিসেবে যথেষ্ট।" (আল ফাতেহ) রাসূলের এই দায়িত্বের কথা আল্লাহ তায়ালা কুরআনে সূরা তওবার ৩৩ নং আয়াতে এবং সূরা ছফের ৯ নং আয়াতে উল্লেখ করেছেন। এ আয়াতে তিনটির মূল বক্তব্য হচ্ছে আল্লাহ তাঁর রাসূলকে সত্য সঠিক জীবনবিধান অর্থাৎ ইসলাম সহকারে পাঠিয়েছেন, আর তার দর্শনের চরম লক্ষ্য হচ্ছে জীবন বিধানকে অন্য সকল বিধানের ওপর বিজয়ী করা।

রসূলের এই তের বছরের কার্যকলাপ শুধুমাত্র জীবনের কোন দিক মাত্রে সংস্কার ছিল না। বরং ছিল জাহেলিয়াতের বিরুদ্ধে সম্পর্ণ ইসলামী বিপ্লব। তাই রেসালাতের এ কাজটি ছিল আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভাষায় রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যে তথা ব্যক্তির কল্যাণ সুনিশ্চিতকরণ, জাতির কল্যাণ আনয়ন ও মানবজাতির কল্যাণ সাধন এর সমাঞ্জস্যশীল। সুতরাং বলা চলে রাসূল এক ব্যক্তি সত্তাই ছিলেন না, তিনি যেন ছিলেন এক আদর্শ রাষ্ট্র, এক আদর্শ নেতৃত্বের অধিকারী।

সমাজ ও রাষ্ট্রের নেতৃত্ব যদি বাতিলপন্থীদের হাতে থাকে তবে ইসলাম বিজয়ী আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। তাই ইসলামী আদর্শের বিজয় মানেই নেতৃত্বের পরিবর্তন এবং নেতৃত্বের পরিবর্তন প্রচেষ্টাই চরম রাজনীতি। অধ্যাপক পেটেল বলেন, "যদি পূর্ণ জ্ঞান হয় এবং যদি সত্যকে উপলব্ধি করা যায় এবং যদি কেবল মুষ্টিমেয় ব্যক্তিই এই জ্ঞানের অধিকারী হয়, তাহলে জ্ঞানী ব্যক্তির হাতেই শাসনব্যবস্থা অর্পণ করা বাঞ্জনীয়।" এ বাঞ্জনীয় কর্তব্য রাজনৈতিক কার্যকলাপ ছাড়া সম্ভব নয়। রাসূলের জীবনই তাই রাজনৈতিক কার্যকলাপশূন্য জীবন মনে করা একটি মারাত্মক ভুল ছাড়া কিছুই নয়। তাই রাসূলের এই দ্বীনে হক প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম তথা ইসলামী রাজনীতিকে রাসূল থেকে যারা আলাদা করে দেখতে চায় তারা হয় ইসলামী আন্দোলন বুঝে না, নয়ত দ্বীন প্রতিষ্ঠার এই সংগ্রামী পথে চলার সাহস রাখে না।

এ কাজ সম্পন্ন করার জন্যই প্রয়োজন রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতার। বর্তমান সমাজবিজ্ঞানীগণ রাষ্ট্রকে একটি সামাজিক নিয়ন্ত্রণের ধরন (A Form social control) মনে করেন। মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করাও এর অন্যতম উদ্দেশ্যে। রাষ্ট্র যেসব বিধিবিধান প্রণয়ন করে তার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য অনুযায়ী মানুষের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করা। তাই আল্লাহর দেয়া বিধান অনুযায়ী মানুষের সঠিক দিক নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজন ইসলামী রাষ্ট্রের।

www.amarboi.org

আর ইসলামই কেবলমাত্র একটি আধুনিক রাষ্ট্রের জন্য প্রয়োজনীয় সকল দিক ও বিভাগ নিশ্চিত করতে সক্ষম। এবার আসুন তা দেখে নিই, আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে ইসলামী রাষ্ট্রের নমুনা।

আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোকে ইসলামী রাষ্ট্রের নমুনা

রাষ্ট্রের সংজ্ঞা নির্ধারণ খুব সহজ নয়। তবুও কয়েকটি প্রামাণ্য সংজ্ঞার উদ্ধৃতি দিয়ে বিষয়টি সহজভাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করব। গানার বলেন, আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিভাষায় রাষ্ট্র হলো এমন একটি জনসমাজ, যা সংখ্যায় অল্পাধিক বিপুল, যা স্থায়ীভাবে কোন নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ড অধিকার করে থাকে, যা বাইরের কোন শক্তির নিয়ন্ত্রণ থেকে স্বাধীন অথবা প্রায় স্বাধীন এবং যার এমন একটি সংগঠিত সরকার আছে যার প্রতি প্রায় সকলেই স্বভাবত আনুগত্য স্বীকার করে।" "The state is a community of persons more or less mumerous, permanently occupying a definite portion of territory, independent of external control and possessing an organised government of which the great body of inhabitants render habitual obedience")। উড্রো উইলসন (Woodrow Wilson) রাষ্ট্রের সংক্ষিপ্ত একটি সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, "কোন নির্দিষ্ট ভূ-ভাগের মধ্যে আইনের মাধ্যমে সংগঠিত জনসমূহকে রাষ্ট্র বলে।" "A state is a people organised for law withim a definite territory."

ম্যাক আইভার (Mac Iver) বলেন, "রাষ্ট্র এমন একটি সংঘ, যা সরকারের ঘোষিত আইন অনুসারে কার্য করে। সরকার আইন ঘোষণা করার এবং তা পালন করবার শক্তির অধিকারী। ঐ শক্তির সাহায্যে সরকার নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের মধ্যে সামাজিক শৃঙ্খলার বাহ্যিক ও সার্বজনীন অবস্থা বজায় রাখে।" "The state is an association which acting through low as promulgated by a govermnment endowed to this end with coercive power, maintaining within a community territorially demarcated, the universal external condition of social order"। অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হ্যারল্ড লাস্কি (Harold Laski) রাষ্ট্র সম্বন্ধে বলেছেন, "আধুনিক রাষ্ট্র ভূখণ্ডে অবস্থিত এমন এক সমাজ, যে শাসকগোষ্ঠী ও শাসিত-এ দু'ভাগে বিভক্ত এবং নিজের নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের মধ্যে অবস্থিত অন্য সকল সংস্থার ওপর প্রাধান্য দাবি করে।" "The modern state is a territorrial society divided into government and subjects, claiming within its alloted physical area supremacy over all other institutions."

www.amarboi.org

উপরিউক্ত যে-কোন সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে আমরা রাষ্ট্রের মৌলিক উপাদান পাই-জনসমষ্টি, ভূমি, সরকার এবং সার্বভৌম ক্ষমতা। রাষ্ট্রগঠনে এদের প্রত্যেকটি একান্ত প্রয়োজনীয়।[৩১]

ধর্ম ও রাষ্ট্রকে আলাদা করতে গিয়ে আল্লাহর আইন নির্বাসনে

এখানে আধুনিক রাষ্ট্রের যতগুলো শর্ত আছে আল্লাহর দেয়া জীবনব্যবস্থার মধ্যে সম্পূর্ণটাই উপস্থিত। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা ধর্ম ও রাষ্ট্রকে আলাদা করতে গিয়ে আল্লাহর আইনকে নির্বাসনে পাঠিয়ে নিজেরাই প্রভুর আসনে বসেছে।

এজন্য ধর্ম ও রাষ্ট্রের প্রাচীন বিতর্কে ইকবাল ধর্মহীন রাষ্ট্রের (Secular State) প্রবল বিরোধিতা করেছেন। তাঁর মতে মার্টিন লুথার খ্রিষ্টবাদের ভয়ানক শত্রু, কেননা তিনিই ধর্ম ও রাষ্ট্রকে দু'টি বিভিন্ন ও পরস্পরবিরোধী বস্তু বলে ঘোষণা করেছেন। যিনি সারা দুনিয়ার সব সৃষ্টি করেছেন আবার তার পরিচালনার জন্য নির্দিষ্ট আইন ও নিয়মকানুনও ঠিক করে দিয়েছেন।

ইউরোপে যে জীবন দর্শনের প্রভাবে ধর্ম ও রাজনীতিকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে, তার মূলে রয়েছে জড় ও আত্মার (Matter and Spirit) দ্বৈতবাদ। এই ভ্রান্ত দর্শনই মানবতার কাফেলাকে বস্তুবাদের (Materialism) উষর মরুতে বিভ্রান্ত ও দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ঘুরে মরতে বাধ্য করেছে। ইকবালের দৃষ্টিতে ধর্ম ও রাষ্ট্র দেহ ও আত্মার সমতুল্য-এদের পারস্পরিক নিবিড় সংযোগ জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে অপরিহার্য আর এদের পারস্পরিক বিরোধ বিচ্ছেদের নিশ্চিত পরিণতি ধ্বংস। ইকবালের রাষ্ট্র দর্শনের দেহ ও প্রাণ-জড় ও আত্মা দু'টি অবিচ্ছিন্ন মৌলিক উপাদান। 'গুলশানে রাজই জাদিদ' গ্রন্থে তিনি বলেছেন :[৩২]

পশ্চিমী দর্শন গড়ে উঠলো
বস্তু ও আত্মার দ্বৈতবাদের ওপর।
পাশ্চাত্যের হীন রাজনৈতিক
দৃষ্টিতে তার
রাষ্ট্র ও ধর্ম হলো স্বতন্ত্র।
পশ্চিমের অন্ধ অনুকরণে
এই জাতি হলো বিভ্রান্ত
ধর্ম ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক সে হলো বিস্মৃত।

---

৩১ ড. এমাজউদ্দীন আহমদ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কথা,ঢাকা ঃ বিবিসি।
৩২ মাওলানা আব্দুর রহীম, ইকবালের রাজনৈতিক চিন্তা, ঢাকা ঃ, খায়রুন প্রকাশনী।

www.amarboi.org

অন্যথায় মানবতার উত্থান চরমভাবে ব্যর্থ হতে বাধ্য। ইকবালের দৃষ্টিতে আধুনিক সভ্যতা যে রাষ্ট্রনীতি উপস্থাপিত করেছে তা একটি বল্গাহীন দৈত্য ছাড়া কিছু নয়। যারই ওপর করাল দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হয়, তাই জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে যায়।

আমার দৃষ্টিতে বর্তমান রাষ্ট্রনীতি

ধর্মের প্রভাবমুক্ত,

শয়তানের ক্রীতদাসী, নীচ প্রকৃতি,

আত্মা তার মৃত।

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

তিনিই সে সত্তা যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য যা কিছু জমিনে রয়েছে সে সমস্ত। তারপর তিনি মনোসংযোগ করেছেন আকাশের প্রতি। বস্তুত তিনি তৈরি করেছেন সাত আসমান। আর আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে অবহিত।[৩৩]

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ

তোমরা যে বিষয়েই মতভেদ কর, তার ফয়সালা আল্লাহ্র কাছে সোপর্দ। ইনিই আল্লাহ্ আমার পালনকর্তা আমি তাঁরই ওপর নির্ভর করি এবং তাঁরই অভিমুখী হই।[৩৪]

'বালে জিব্‌রিল' গ্রন্থে 'দুনিয়া ও সিয়াসত' শীর্ষক যে কবিতা তিনি লিখেছেন, তাকে ধর্ম ও রাষ্ট্রের এই সূক্ষ্ম ও জরুরি সম্পর্কের প্রতি তিনি সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন :

ধর্ম ও রাষ্ট্র যেদিন হলো স্বতন্ত্র

সর্বত্র কায়েম হলো লালসার আধিপত্য।

রাষ্ট্র ও ধর্ম উভয়েই. হলো ব্যর্থতার সূচনা,

এই স্বাতন্ত্র্যই হলো সভ্যতার অদূরদর্শিতার প্রমাণ। ইকবালের রাজনৈতিক মান দিতে হবে।

আল্লাহ বলেন-

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ

---

৩৩ সূরা বাকারা, ২৯

৩৪ সূরা আশশুরা, ১০

www.amarboi.org

হে মানুষ, তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ স্মরণ কর। আল্লাহ্ ব্যতীত এমন কোন স্রষ্টা আছে কি, যে তোমাদেরকে আসমান ও জমিন থেকে রিজিক দান করেন? তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। অতএব তোমরা কোথায় ফিরে যাচ্ছ? ।[৩৫]

لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى

নভোমণ্ডলে, ভূমণ্ডলে, এতদুভয়ের মধ্যবর্তী স্থানে এবং সিক্ত ভূগর্ভে যা আছে, তা তাঁরই।[৩৬] وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

তাঁর কাছেই অদৃশ্য জগতের চাবি রয়েছে। এগুলো তিনি ব্যতীত কেউ জানে না। স্থলে ও জলে যা আছে, তিনিই জানেন। কোন পাতা ঝরে না; কিন্তু তিনি তা জানেন। কোন শস্যকণা মৃত্তিকার অন্ধকার অংশে পতিত হয় না এবং কোন আর্দ্র ও শুস্ক দ্রব্য পতিত হয় না; কিন্তু তা সব প্রকাশ্য গ্রন্থে রয়েছে।[৩৭]

আল্লাহ বলেন-

وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ

নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সব তাঁরই। সবাই তাঁর আজ্ঞাবহ।[৩৮]

তিনি বলেন,

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্। তিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর আরশের ওপর অধিষ্ঠিত হয়েছেন। তিনি পরিয়ে দেন রাতের ওপর দিনকে এমতাবস্থায় যে, দিন দৌড়ে রাতের পেছনে আসে। তিনি সৃষ্টি করেছেন সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্র দৌড় স্বীয় আদেশের অনুগামী। শুনে রেখ, তাঁরই কাজ সৃষ্টি করা এবং আদেশ দান করা। আল্লাহ্, বরকতময় যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক।[৩৯]

يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ

---

৩৫ সূরা ফাতির,৩
৩৬ সূরা ত্বাহা, ৬
৩৭ সূরা আনআম,৫৯
৩৮ সূরা রোম,২৬
৩৯ সূরা আরাফ, ৫৪

www.amarboi.org

তারা বলছিল আমাদের হাতে কি কিছুই করার নেই? তুমি বল, সবকিছুই আল্লাহ্‌র হাতে।[৪০]

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই, তিনি জীবিত, সবকিছুর ধারক। তাঁকে তন্দ্রাও স্পর্শ করতে পারে না এবং নিদ্রাও নয়। আসমান ও জমিনে যা কিছু রয়েছে, সবই তাঁর। কে আছ এমন, যে সুপারিশ করবে তাঁর কাছে তাঁর অনুমতি ছাড়া? দৃষ্টির সামনে কিংবা পেছনে যা কিছু রয়েছে সে সবই তিনি জানেন। তাঁর জ্ঞানসীমা থেকে তারা কোন কিছুকেই পরিবেষ্টিত করতে পারে না, কিন্তু যতটুকু তিনি ইচ্ছা করেন। তাঁর সিংহাসন সমস্ত আসমান ও জমিনকে পরিবেষ্টিত করে আছে। আর সেগুলোকে ধারণ করা তাঁর পক্ষে কঠিন নয়। তিনিই সর্বোচ্চ এবং সর্বাপেক্ষা মহান।[৪১] يُدَبِّرُ

الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ

তিনি আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত সমস্ত কর্ম পরিচালনা করেন, অতঃপর তা তাঁর কাছে পৌঁছবে এমন একদিনে, যার পরিমাণ তোমাদের গণনায় হাজার বছরের সমান।[৪২]

মেকিয়াভেলির ধর্মবিবর্জিত রাজনীতি

আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্পূর্ণরূপে ধর্ম ও নৈতিক মূল্যবোধবিবর্জিত। আর ইউরোপে এই ধর্মবিবর্জিত রাজনীতির প্রবর্তক হচ্ছেন মেকিয়াভেলি। মেকিয়াভেলি স্পষ্ট কণ্ঠে বলেছেন : নাগরিকগণ ইচ্ছা করলে ব্যক্তিগতভাবে কোন ধর্ম ও নৈতিক বিধান পালন ও অনুসরণ করে চলতে পারে; কিন্তু রাষ্ট্রকে তার উর্ধ্বে থাকতে হবে। রাষ্ট্রকে সুদৃঢ় ও স্থায়ী হয়ে থাকার এবং উত্তরোত্তর শক্তি ও প্রতিপত্তি পরিবর্ধনের জন্য প্রতিনিয়ত চেষ্টানুবর্তী থাকতে হবে। সেজন্য তাকে যে কোন পন্থা ও উপায় অবলম্বন করতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হওয়া চলবে

---

৪০ সূরা আল-ইমরান, ১৫৪
৪১ সূরা বাকারা, ২৫৫
৪২ সূরা সাজদা, ৫

www.amarboi.org

না। অবশ্য রাজনৈতিক স্বার্থোদ্ধারের জন্য ধর্ম ও নৈতিকতার দোহাই দেয়া যদি কিছুমাত্র উপকারী হয়, তবে তা করতেও কোন বাধা থাকতে পারে না। বস্তুত এই ধোঁকাবাজি, প্রতারণা ও সুযোগ সন্ধানী কর্মপন্থাকেই ইকবাল 'মেকিয়াভেলি রাষ্ট্রনীতি' বলে অভিহিত করেছেন।

আল্লামা ইকবাল এই ফরাসি দার্শনিককে সম্পূর্ণরূপে 'বাতিলপন্থী' বলে অভিহিত করেছেন : আল্লাহ্ বলেন,

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

যা কিছু আকাশসমূহে রয়েছে এবং যা কিছু জমিনে আছে, সব আল্লাহ্রই। যদি তোমরা মনের কথা প্রকাশ কর কিংবা গোপন কর, আল্লাহ্ তোমাদের কাছ থেকে তার হিসাব নেবেন। অতঃপর যাকে ইচছা তিনি ক্ষমা করবেন এবং যাকে ইচছা তিনি শাস্তি দেবেন। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে শক্তিমান।[৪৩]

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

বলুন ইয়া আল্লাহ! তুমিই সার্বভৌম শক্তির অধিকারী। তুমি যাকে ইচছা রাজ্য দান কর এবং যার কাছ থেকে ইচছা রাজ্য ছিনিয়ে নাও এবং যাকে ইচছা সম্মান দান কর আর যাকে ইচছা অপমানে পতিত কর। তোমারই হাতে রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ। নিশ্চয়ই তুমি সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাশীল।[৪৪]

ইকবাল কোন রাষ্ট্রকেই নৈতিক নিয়ম-বিধান হতে মুক্ত দেখতে প্রস্তুত নহেন। তাঁর মতে রাষ্ট্রকে অবশ্যই নৈতিক বিধানের অধীন ও অনুগত হতে হবে। অন্যথায় মানবতার চরম বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী। ইকবালের মতে মানবতাকে এ ধ্বংসের হাত হতে রক্ষা করতে পারে একমাত্র ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা।

The Reconstruction of Religious Thought in Islam গ্রন্থে ইকবাল বলেন :

Islam as a polity, is only a practical means of making this principle (of Tawhid) a living factor in the intellectual and emotional life of mankind. It demands loyalty to God and not to thrones. And since God is the ultimate spiritual basis of all life, loyalty to God actually amounts to man's loyalty to his own ideal nature.

---

৪৩ সূরা বাকারা, ২৮৪

৪৪ সূরা আল-ইমরান, ২৬

www.amarboi.org

"এই (তওহীদ বা আল্লাহ্‌র একত্ব) নীতিকে মানুষের চিন্তাজগতে ও ভাবজগতে জীবন্ত রূপ দেয়াই কার্যত ইসলামের সমাজ ও রাষ্ট্রবিধানের সবচেয়ে বড় কাজ। ইসলাম দাবি করে একমাত্র আল্লাহর আনুগত্য, কোন সিংহাসনের প্রতি আনুগত্য নয়। আর যেহেতু আল্লাহই সমগ্র জীবজগতের আধ্যাত্মিক অভিব্যক্তির মূল, আল্লাহ্‌র প্রতি আনুগত্য বস্তুত মানুষের আপন আদর্শ প্রকৃতির প্রতি আনুগত্যের নামান্তর।"

এমনকি এক শ্রেণীর আলেম নামধারী লোক যে কেবলমাত্র ধর্মীয় দিকের ওপরই গুরুত্বারোপ করেন, কিন্তু ধর্মের ভিত্তিতে গোটা সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন না– ইকবাল তাদেরকেও তীব্র ভাষায় বিদ্রূপ করেছেন।

ইসলামের পূর্ণাঙ্গ রাজনৈতিক ব্যবস্থা

ইসলামের যদি একটা পূর্ণাঙ্গ রাজনৈতিক ব্যবস্থা থাকে, তাহলে একথা সাক্ষ্য দেবে যে, প্রকৃত এবং পরিপূর্ণ ইসলাম রাজনীতি ব্যতিরেকে কল্পনাই করা যায় না। যেমন ধরুন, কোন একটি স্বাস্থ্যবান এবং পূর্ণাঙ্গ দেহের ধারণা যদি করতে চান, তাহলে তার কোন একটা সুস্পষ্ট অঙ্গ, যথা মাথা, হাত অথবা পা তার থেকে পৃথক করে কিছুতেই করতে পারেন না।

যদি সরকারি ক্ষমতা ব্যতীত দ্বীনের অগণিত হুকুম মওকুফ হয়ে যায় এবং তার বাস্তবায়ন অসম্ভব হয়ে পড়ে, অথচ শরীয়তের কোন অংশ পরিত্যাগ করা কুফরী মনোভাবেরই পরিচায়ক, ইসলামকে মেনে নেয়া হয় না, তাহলে তার পরিষ্কার অর্থ এই যে, রাজনীতি ইসলামের একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ। কেননা এর যে গুরুত্ব আছে তা তো অবধারিত। উপরন্তু তার ওপরই অন্যান্য অনেক অংশের কোন কোন দিক নির্ভরশীল।

এসব দিক লক্ষ করে হযরত ওমর (রা.) যে কথাগুলো বলেছিলেন তা একটা সুস্পষ্ট সত্যেরই অভিব্যক্তি: "জামায়াত ব্যতীত ইসলাম হতে পারে না এবং ইমারত (রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা) ব্যতীত জামায়াত কোন জামায়াত নয়।"

খ্যাতনামা তাবেয়ী হযরত কা'বুল আহবারের (র.) কথা বলতে হয় : ইসলাম, সরকার এবং জনসাধারণ-এ তিনের দৃষ্টিতে যথাক্রমে শামিয়ানা, তার খাম্বা এবং খুঁটির ন্যায়। ইসলাম হচ্ছে শামিয়ানা, সরকার তার খাম্বা এবং জনসাধারণ হলো খুঁটি। এর যে কোন একটি অপর দু'টি ব্যতীত সঠিক অবস্থায় থাকতে পারে না।–(আল আকদুল ফরীদ : ১ম খণ্ড)

www.amarboi.org

মোটকথা রাজনীতি ও রাষ্ট্রশক্তির ধারণা থেকে যদি ইসলামকে পৃথক করে দেখা যায়, তাহলে ইসলাম আর সে ইসলাম থাকে না যা আল্লাহর প্রেরিত, কুরআনে বর্ণিত এবং রাসূলে খোদার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। ইসলামকে তার সঠিক রূপে দেখা তখনই সম্ভব, যখন তাকে রাষ্ট্রশক্তির সিংহাসনে সমাসীন করে দেখা যাবে।

এতদূর পর্যন্ত আলোচনার পর বাস্তব সত্যের আর একটা বিপ্লবী দিক সামনে আসছে। তা হচ্ছে এই যে, ইসলাম রাজনৈতিক ক্ষমতাকে দুনিয়ার নয়, বরঞ্চ আখেরাতের সম্পদ বলে অভিহিত করে। এটা অপছন্দনীয় এবং অবাঞ্ছিত নয়। বরঞ্চ ভোগ্য ও বাঞ্ছিত বলে ঘোষণা করে। ইসলাম এর প্রতি উদাসীন নয়। বরঞ্চ তার অনুসন্ধানকারী, তার জন্য আগ্রহশীল ও স্পৃহান্বিত। তার কারণ এই যে, যতক্ষণ তার হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা না থাকে, সে তার আপন উদ্দেশ্য পূরণ করতে পারে না।

জিহাদের স্থায়ী শর্ত হলো দার আল ইসলাম। দার আল হারব দার আল ইসলাম-এ বিলীন হওয়া পর্যন্ত এ জিহাদ চলবে। সুতরাং ইসলামী রাষ্ট্রে ইসলাম প্রচারের অন্যতম হাতিয়ার হলো জিহাদ আর ইসলামী রাষ্ট্রের সম্প্রসারণেও জিহাদ অন্যতম মাধ্যম।[৪৫]

যখন রাষ্ট্রক্ষমতার মূলে ধর্মীয় বিধান মূল চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে তখনই সমাজের বর্বরতা ও নৈরাজ্য দমন করা সম্ভব। ড. পেটেল বলেন, "রাষ্ট্রনৈতিক ক্রমবিকাশের প্রাচীনতম ও সবচেয়ে সঙ্কটপূর্ণকালে ধর্মই শুধু বর্বরসুলভ নৈরাজ্য দমন করতে এবং ভক্তি ও আনুগত্য শিক্ষা দিতে পারতো।" রাষ্টনীতি কি এক নায়কতন্ত্র, গণতন্ত্র না রাজতন্ত্র মেনে চলবে তার আলোচনার বিষয় আলাদা। তবে যে ধারাই চলুক না কেন, যদি ঐ রাষ্ট্রনীতি দ্বীনকে এড়িয়ে চলে তবে তার মাধ্যমে যে মানবিক কল্যাণ হতে পারে না, এটা চরম সত্য।

ইকবাল তাই বলেছেন :

জালালে বাদশাহী হো ইয়া জমহুরী তামাশা হো,
জুদা হো দ্বীন সিয়াসত সে তো রাহজাতি হায় চেংগেজী।

---

৪৫ সন্ত্রাসবাদ ও ইসলাম, ঢাকা ঃ বিআইআইটি।

www.amarboi.org

হোক না রাজনীতি রাজতন্ত্র বা গণতন্ত্রের রূপে। যদি এই রাষ্ট্রনীতি থেকে দ্বীনকে আলাদা করে দেয়া হয় তবে ঐ রাষ্ট্রনীতিতে শুধুমাত্র চেংগীজী বর্বরতাই অবশিষ্ট থাকে।

অতঃপর, যে রাষ্ট্রনীতি দ্বীনকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেবে, সেই রাষ্ট্রনীতি-ই আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী দ্বীন হিসেবে প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমাজে সার্বিক ইনসাফ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। দ্বীন ও রাষ্ট্র আলাদা কোন সত্তা নয়। ইসলাম দ্বীন ও রাষ্ট্রকে অপারেশন করে আলাদা করে দিলে দেহের মৃত্যু ঘটবে। আল্লাহর রাসূল (সা.) স্পষ্টভাবে এরশাদ করেছেন : রাষ্ট ও দ্বীন দু'টি জমজ শিশু। আর আল্লাহ আমাকে জামায়াত, শ্রবণ, আনুগত্য, হিজরত ও জিহাদের নির্দেশ দিয়েছেন।

www.amarboi.org

তৃতীয় অধ্যায়

জিহাদের শাব্দিক অর্থ ও পরিচয়

জিহাদকে আজ বিভিন্ন রঙে, ঢঙে ও অপব্যাখ্যার আবরণ দিয়ে ঢেকে ফেলা হচ্ছে। জিহাদ আরবি শব্দ, যার অর্থ : কঠোর প্রচিশ্রম ও চরম কষ্টের মাধ্যমে কথা ও কাজের শক্তি ও সামর্থ্যের দ্বারা সর্বাত্মক প্রচেষ্টা ও সাধনা। মানুষের সার্বিক শক্তি ও সামর্থ্যকে বিলিয়ে দেয়ার অর্থ হলো প্রখ্যাত আরবি ভাষার বিশ্বকোষ প্রণেতা বলেন, ১ : অর্থ শক্তি সামর্থ্য ক্ষমতা। এমনি বলা হয় .. কঠোর পরিশ্রম এবং চরম কষ্ট।

ইবন আরাফ অর্থ সাধ্য সামর্থ্য, শক্তি, ক্ষমতা মর্যাদা।... অর্থ কাঙ্ক্ষিত সফলতায় পূর্ণতা অর্জন। এ থেকেই আল্লাহর ঘোষণা অর্থাৎ সামর্থ্য দ্বারা চেষ্টা করেছে ও এ ব্যাপারে চরমভাবে সাধনা করেছে। হাদিস শরীফে উল্লেখ আছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকট সেই চরম পরীক্ষা থেকে আশ্রয় চাই যা অসহ্য।

হাদিসে আরো উল্লেখ আছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন :

'মক্কা বিজয়ের পর কোনো হিজরতের প্রয়োজন নেই, কিন্তু জিহাদ ও (তার) সঙ্কল্প অব্যাহত থাকবে।'

প্রখ্যাত লেখক ও ভাষাবিদ আবদুল বাকী রমাদুন শব্দের অর্থ প্রসঙ্গে বলেন :

'জিহাদ অর্থ দুশমনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য কথা এবং কাজের মাধ্যমে নিজের যাবতীয় শক্তি সামর্থ্যই সুযোগ ও সম্পদের দ্বারা সর্বোত্তম প্রচেষ্টা চালানো।

জিহাদ, পবিত্র যুদ্ধ। অথবা তদরুপ অথবা এর কাছাকাছি এর রকম বলে চালিয়ে দেয়া প্রচেষ্টা চলছে অনবরত। নিম্নে দেখুন-

jihad-Islamic term, Arabic for 'battle; struggle; holy war for the religion'. The word is used in two ways, a spriritual struggle, and as holy war. It is mentioned in the Koran as a verb:

www.amarboi.org

Koran sura9: Repentance[41] March ye then, light and heavy, and fight [jāhidū] strenuously with your wealth and persons in God's way; that is better for you if ye did but know!

"Jihad is not confined to the carrying of arms and the confrontation of the enemy. The effective word, the good article, the useful book, support and solidarity - together with the presence of sincere purpose for the hoisting of Allah's banner higher and higher - all these are elements of the Jihad for Allah's sake."

আল্লামা শেখ ইবরাহীম মুস্তফা লিখেছেন : অর্থ পরিশ্রান্ত প্রচেষ্টা, যেমন বলা হয় তিনি কোনো বিষয়ে চেষ্টা করেছেন। পবিত্র কুরআন মজিদে উল্লেখ আছে তারা আল্লাহর নামে কসম করে তাদের কার্যাবলি বৈধতা প্রমাণের জন্য প্রাণান্তকর চেষ্টা করেছ। কুরআন মজিদে বলা হয়েছে তারা তাদের চেষ্টা সাধনা ছাড়া আর কিছুই পাবে না।

বিখ্যাত ভাষাবিদ মাজদুদ্দীন ফিরোজাবাদী তাঁর 'আল কামুস আল মুহীত' অভিধানে বলেন : অর্থ : সাধনা, পরিশ্রম অর্থাৎ তোমার উদ্দেশ্যে পৌঁছার সর্বাত্মক চেষ্টা। অর্থাৎ বিরত থাক, আর পরিশ্রম পূর্ণ প্রচেষ্টা চালানো।

তার তৎপরতা পরিশ্রান্ত অবস্থায় তার উদ্দেশ্যের সফলতায় পৌঁছেছে।

ভাষাবিদ ড. রুহী আল বালাবাক্কী বলেন অর্থ : To strive endeavour, Try hard, Make every effort, to fight (for), To struggle (against), Contend (against) (, Battle (against) ; To wage holy ware or jehad (against)'

বিখ্যাত ভাষাবিদ মুহাম্মদ আলাউদ্দিন আল আযহারী বলেন : সে কাজে অনেক চেষ্টা করেছে। সে লোকটিকে পরীক্ষা করেছে। রোগে তাকে ক্ষীণ ও দুর্বল করেছে। দুধের সবটুকু মাখন বের করেছে। খাবার খেতে আগ্রহী হয়েছে। ইসলাম ধর্ম রক্ষার্থে এবং আল্লাহর দীন প্রচার করার মানসে সর্বাত্মক চেষ্টা বা যুদ্ধ করা। যে জিহাদ করে বা মুজাহিদ।[৪৬]

সুতরাং জিহাদের শাব্দিক পরিচয়ে আমরা দেখতে পাই যে, জিহাদ হলো : কঠোর পরিশ্রম ও কষ্টের মাধ্যমে কথা ও কাজের, শক্তি ও সামর্থ্যের সর্বাত্মক সাধনা। চেষ্টা ও কষ্টকর সাধনার মাধ্যমে উদ্দেশ্য হাসিলে শেষ প্রান্তে পৌঁছা। জিহাদ হলো : আল্লাহর ইচ্ছা ও সন্তুষ্টি হাসিলের লক্ষ্যে তাঁর পথে চরম চেষ্টা। জিহাদ হলো দুশমনের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য কথা এবং কাজের মাধ্যমে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো।

---

[৪৬] ড. মুহাম্মদ নজীবুর রহমান, ইসলামে জিহাদের বিধান, ঢাকা ঃ আধুনিক প্রকাশনী।

www.amarboi.org

জিহাদের পারিভাষিক অর্থ ও পরিচয়

জিহাদকে যখন আল্লাহর পথের সাথে সম্পৃক্ত করা হয় তখন তার অর্থ হয় :

'আল্লাহর বিধানকে বিজয়ী করার জন্য আল্লাহদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা, প্রস্তুতি গ্রহণ করা এবং এ জন্য নির্ধারিত কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা।

সুতরাং ইসলামে কে আল্লাহর পথের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে, যার কারণে গোত্রের জন্য লড়াই, শ্রেণীর জন্য লড়াই, জাতির বা দেশের জন্য লড়াই, দুনিয়াবী কোনো স্বার্থ, লোভ অথবা প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণের জন্য লড়াই থেকে তা সম্পূর্ণভাবে আলাদা পরিচিতি লাভ করেছে।

BRITANNICA তে বলা হয়েছে Jihad In Islam, the central doctrine that calls on believers to combat the enemies of their religion. According to the QURAN and the HADITH, jihad is a duty that may be fulfilled in four ways: by the heart, the tongue, the hand, or the sword. The ways of the tongue and hand call for verbal defense and right actions. The jihad of the sword involves waging was against enemies of Islam. Believers contend that those who die in combat become martyrs and guaranteed a place in paradise. In the4 20th and 21st centuries the concept of jihad has sometimes been used as an ideological weapon in the effort to combat Western influences and secular governments and to establish an ideal Islamic society.

শরীয়াতের পরিভাষায় বলা হয় : আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে ইসলামের বিজয়ের জন্য মু'মিনের জান ও মাল দিয়ে সর্বাত্মক সংগ্রাম সাধনা চালানো।

ইসলামী পরিভাষায় জিহাদের পরিচয় ও আল্লাহর পথে ...এর বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট করে বর্ণনা করা হয়েছে পবিত্র কুরআন মজিদের নিম্নোক্ত আয়াতে:

الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا

'যারা মু'মিন তাঁরা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে এবং যারা কাফির তারা তাগুতের পথে সংগ্রাম করে। সুতরাং তোমরা শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করো, শয়তানের কৌশল অবশ্যই দুর্বল।[৪৭]'

৪৭ সূরা নিসা,৭৬

www.amarboi.org

সুতরাং আল্লাহর দীন বিজয়ের জন্য আল্লাহর পথে সংগ্রাম সাধনাই হলো ইসলামী পরিভাষায় কুরআনিক পরিচিতির শব্দ। রাসূলুল্লাহ (সা.) জিহাদ সম্পর্কে যা বলেছেন তা থেকেও জিহাদের পারিভাষিক পরিচয় আরো স্পষ্টভাবে জানা যায়। হাদিসে এসেছে।

'নবী করীম (সা.) এর নিকট এক বেদুঈন এসে জিজ্ঞেস করলো : হে আল্লাহর রাসূল কোনো ব্যক্তি গনিমতের জন্য যুদ্ধ করে, কেউবা নামের জন্য। আর কেউবা উচ্চ পদ পাওয়ার জন্য যুদ্ধ করে। অন্য এক বর্ণনায় : কেউ সাহসিকতা দেখানোর জন্য, আর কেউ নিজ দেশ বা জাতির জন্য যুদ্ধ করে, এদের মধ্যে কে আল্লাহর পথে জিহাদ করে? রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধানকে বিজয়ী করার জন্য সংগ্রাম করে, সেই আল্লাহর পথে জিহাদ করে।'

হানাফী মাযহাবে শরীয়াতের পরিভাষায় জিহাদ হলো সত্য দীনের দিকে আহ্বান জানানো আর এই দাওয়াত প্রত্যাখ্যান ও বাধাদানকারীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা। আবদুল্লাহ ইবন কামাল বলেন, জিহাদ হলো আল্লাহর দীন বিজয়ী করার জন্য যাবতীয় শক্তি ও সামর্থ্য দিয়ে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সর্বাত্মক সংগ্রাম চালানো।

মালেকী মাযহাবের অনুসারী ইবন আরাফা জিহাদ সম্পর্কে বলেন, যাদের সাথে চুক্তি নেই এমন আল্লাহদ্রোহীদের বিরুদ্ধে আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করার জন্য সর্বাত্মক সংগ্রাম করা। আর জিহাদ হলো আল্লাহদ্রোহীদের বিরুদ্ধে নিজের যাবতীয় শক্তি ও সম্পদ ব্যয় করে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এবং প্রয়োজনে নিজ জীবন উৎসর্গ করে হলো সর্বাত্মক সংগ্রাম করা।

অতএব, জিহাদের পারিভাষিক অর্থে যে পরিচয় পাওয়া গেল তা হলো, ইসলামে সংগ্রাম সাধনা হবে আল্লাহর পথে, নিছক সংগ্রাম সাধনা তো পৃথিবীর প্রত্যেকটি জীবই করছে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ লক্ষ্য হাসিলের জন্য পূর্ণ শক্তি, সামর্থ্য ও সম্পদ দ্বারা চেষ্টা সাধনা করছে। কিন্তু মুসলমান আসলে একটি বিপ্লবী দলের নাম, যারা জীবন ও ধন-সম্পদ প্রয়োগ করে দুনিয়ার সকল আল্লাহদ্রোহী কাফির, মুশরিক, যালিম, ফাসিক ও শয়তানী শক্তির ধারক-বাহকের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক সংগ্রাম সাধনা করে। বস্তুত এ উদ্দেশ্যে দেহ ও আত্মার সকল শক্তি নিয়োগ করে আল্লাহর আইনকে বিজয়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার সার্বিক সংগ্রাম সাধনাই হলো জিহাদ।

ডা. জাকির নায়েকের মতে-জিহাদের অর্থ সম্বন্ধে শুধুমাত্র অমুসলমানদের মাঝেই নয়, এমনকি মুসলমানদের মাঝেও ভুল ধারণা আছে। বেশির ভাগ মানুষই,

www.amarboi.org

মুসলমান হোক আর অমুসলমানই হোক, তারা মনে করে যে, কোন মুসলমান যুদ্ধ করুক যে কোন যুদ্ধ, যে কোন কারণেই করুক না কেন সেটা যে কোন ব্যক্তিগত ব্যাপারে হতে পারে, রাজনৈতিক ব্যাপারে হতে পারে, দেশের ব্যাপারে হতে পারে, ভাষাগত ব্যাপারে হতে পারে, যে কোন কারণেই মুসলমানরা যুদ্ধ করলেই সেটা হলো জিহাদ। অমুসলমানরা এমনকি মুসলমানরাও একটি বড় ভুল করে যে, যে কোন মুসলমান যুদ্ধ করলেই তাকে জিহাদ নাম দেয়। এই জিহাদ শব্দটা এসেছে আরবি শব্দ 'জাহদাহ' থেকে যার মানে হলো চেষ্টা করা পরিশ্রম করা, উদ্যমী হওয়া। ইসলামিক অভিধান অনুযায়ী জিহাদ অর্থ কারো অসৎ প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সর্বশক্তি দিয়ে লড়াই করা। জিহাদের অর্থ হলো চেষ্টা করা। সমাজের উন্নতি করা। এর মানে যুদ্ধক্ষেত্রে আত্মরক্ষা করাকেও বোঝায়। এর অর্থ অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করা। জিহাদ যে মূল শব্দ 'জাহদাহ' থেকে এসেছে তার অর্থ চেষ্টা করা, পরিশ্রম করা। উদাহরণস্বরূপ, যদি কোন ছাত্র চেষ্টা করে পরীক্ষায় পাস করার জন্য তাকে আরবিতে বলে সে জিহাদ করছে। আমরা বলি সে চেষ্টা করেছ। সে পরীক্ষায় পাসের জন্য পরিশ্রম করছে। যদি কোন চাকরিজীবী চেষ্টা করে, পরিশ্রম করে, তার মনিবকে খুশি করার জন্য সে ভাল কাজ দিয়েই করুক আর খারাপ কাজ দিয়ে করুক, সেটাই হলো জিহাদ।[৪৮]

একজন চাকরিজীবী তার সর্বশক্তি দিয়ে মনিবকে খুশি করার চেষ্টা করে যাচ্ছে, সেটাই হচ্ছে জিহাদ। জিহাদ মানেই সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা করা। কোন রাজনীতিবিদ যদি ভোট পাওয়ার জন্য চেষ্টা করে, সেটা ভালোভাবে হোক আর খারাপভাবেই হোক, সেটাকেই আরবিতে বলা হচ্ছে জিহাদ।

৪৮ ডা. জাকির নায়েক, ইসলাম ও সন্ত্রাসবাদ।

www.amarboi.org

জিহাদের প্রয়োজনীয়তা

আল্লাহ মানুষকে এ পৃথিবীতে যে উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছেন সে সম্পর্কে মানুষ আজ সবচেয়ে অচেতন। মানুষের নিকট যেন তার সৃষ্টির প্রাসঙ্গিকতাই মূল হয়ে দাঁড়িয়েছে। যারা সারা পৃথিবী শাসন করত তারা আজ প্রজা হয়ে বেঁচে থাকার আনন্দেই দিশেহারা। যারা গোটা পৃথিবীর আলো জ্বালিয়েছে তারা আজ অন্ধকারে হাবুডুবু খাচ্ছে। তারা আজ পতিপক্ষের প্রচারণাই যেন কাবু। আর পশ্চিমাদের ঠিক করে দেয়া 'নিয়ন্ত্রিত ইসলাম' পালনেই অভ্যস্ত। পশ্চিমাদের দেয়া সামান্য সুবিধাই যেন সে বলেই উঠে, আমি মুসলমান কোন অসুবিধা নেই, সবাই আমাকে ভাল বলে, কিন্তু জিহাদের এই বিড়ম্বনা যদি না থাকত তাহলে তো আমি কারোই শত্রু হতাম না।

আল্লাহদ্রোহী দুনিয়ায় আজ অত্যাচার, নিপীড়ন, প্রতারণা, হঠকারিতা ও দুর্ধর্ষতার সীমা ছেড়ে গেছে, নিপীড়িত মানুষের সকরুণ ফরিয়াদে আকাশ বাতাস দলিত মথিত ও তিক্ত-বিষাক্ত।

এ অবস্থার প্রধান কারণ হলো আল্লাহর পথে জিহাদের হক আদায় করে মুসলমান দুনিয়াব্যাপী সক্রিয় হতে পারেনি। দ্বীনে হক একটি বিশ্বব্যাপী বিপ্লবী ঘোষণা। মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে, এমনকি নিজের প্রবৃত্তির দাসত্ব থেকেই মুক্তি দানই এ ঘোষণার সার কথা। এক আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার সর্বাত্মক সাধনা চালানোই হলো আল্লাহর পথে জিহাদ। জিহাদের মাধ্যমেই মানবতা তার জীবন ও প্রাণের পবিত্রতা ও মহত্ত্ব রক্ষা করতে পারে। আল্লাহর পথে এ জিহাদ পরিচালনা ছাড়া মানুষ তার জীবনের নিরাপত্তা, মালিকানার মান-ইজ্জতের নিরাপত্তা ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা রক্ষা করতে পারে না। মানুষ জিহাদ ছাড়া তার মৌলিক অধিকারসমূহ, যেমন মতামত প্রকাশের অধিকার, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার অধিকার, বিবেক ও বিশ্বাসের স্বাধীনতার অধিকার রক্ষা ও প্রতিষ্ঠা করতে পারে না।

Imam Hasan al-Banna, sayed-The Muslim world today is faced with tyranny and injustice. Indeed oppression and hardship is not just limited to the Muslim world, rather many non-Muslim states are subject to oppression at the hands of the world's leading military and economic powers. Anyone who cares can only be saddened and hurt by the pain and suffering that accompanies so many faces. Islam has allowed jihad as a means to prevent oppression, yet the Muslims have forgotten this for too long.

www.amarboi.org

Though jihad may be a part of the answer to the problems of the ummah, it is an extremely important part. Jihad is to offer ourselves to Allah for His Cause. Indeed, every person should according to Islam prepare himself/herself for jihad and every person should eagerly and patiently wait for the day when Allah will call them to show their willingness to sacrifice their lives. We should all ask ourselves if there is a quicker way to heaven. It is with this in mind that this booklet is being published.

It may be asked of ourselves and others here as to why we remain in this country while there is so much opportunity for reward. It is our understanding that today's problems does not require the one solution whether this be jihad, working for the khilafah, purifying ourselves etc. but rather our situation today requires action on all fronts. Everybody has a role to play in today's great jigsaw, those who are attempting to establish the Islamic state have to continue doing so focusing their minds onto such a project, those who are faced with tyranny at the hands of neighbouring armies have to defend themselves with their lives and those that have the opportunity of giving Islam to the world should do so..

আল্লামা ইকবাল তাই দুঃখ করে বলেছেন-

মোল্লা লাভ করেছে মসজিদে সিজ্‌দাহর স্বাধীনতা,

নির্বোধ সে, একেই সে মনে করে ইসলামের আযাদী।[৪৯]

জিহাদ আত্মরক্ষামূলক লড়াই নয়

ইসলামী জিহাদকে আত্মরক্ষামূলক লড়াই আখ্যা দেয়ার কোনোই সঙ্গত কারণ নেই। এটা শুধু পাশ্চাত্য দেশীয় বিভ্রান্তকারী লেখকদের আক্রমণে প্রভাবিত চিন্তাবিদদেরই অপকীর্তি। ইসলামের সাথে মুসলমানদের সম্পর্ক শিথিল হয়ে আসার দরুন তারা গৌরব ও শ্রেষ্ঠত্ব হারিয়ে দুর্বল ভূমিকা গ্রহণ করে এবং এ সুযোগেই ইসলামবিরোধী পাশ্চাত্য লেখক মহল ইসলামী আদর্শের প্রতি আক্রমণের পর আক্রমণ চালায়। আর তাদের আক্রমণের তীব্রতা অনুভব করেই দুর্বলমনা একদল মুসলমান গবেষক ইসলামী জিহাদকে 'আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ' হিসেবে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস পায়। আল্লাহর মহান অনুগ্রহে একদল

৪৯ তদেক, পৃ: ৩৭

www.amarboi.org

দৃঢ়চেতা মুসলমান এসব অপ্রপ্রচার থেকে মুক্ত হয়ে সদর্পে ঘোষণা করেছেন যে, মানুষকে আল্লাহ ছাড়া অপর সকল কর্তৃত্বের গোলামি থেকে পরিপূর্ণরূপে মুক্তিদান এবং দীনকে শুধু এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করাই ইসলামী জিহাদের লক্ষ্য।

ইসলামী জিহাদের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করে স্বয়ং আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেছেন -

فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (-) وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا

'সুতরাং যারা পরকালের বিনিময়ে পার্থিব জীবন বিক্রি করে তারাই আল্লাহর পথে সংগ্রাম করার যোগ্য, আর কেউ আল্লাহর পথে সংগ্রাম করলে সে নিহত হোক অথবা বিজয়ী হোক অচিরেই আমি তাকে মহাপুরস্কার দান করবো। তোমাদের কী হলো যে, তোমরা সংগ্রাম করছো না আল্লাহর পথে, অসহায় নর-নারী এবং শিশুদের জন্য, যারা বলে, হে আমাদের রব! এই জনপদ যার অধিবাসী জালিম, তাদের (আয়ত্ত) থেকে আমাদেরকে অন্যত্র নিয়ে যাও, তোমার নিকট হতে কাউকে আমাদের অভিভাবক কর এবং তোমার নিকট হতে কাউকে আমাদের সহায় কর।[৫০]"

قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

যুদ্ধ কর ওদের সাথে, আল্লাহ্ তোমাদের হস্তে তাদের শাস্তি দেবেন। তাদের লাঞ্ছিত করবেন, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের জয়ী করবেন এবং মুসলমানদের অন্তরসমূহ শান্ত করবেন। এবং তাদের মনের ক্ষোভ দূর করবেন। আর আল্লাহ্ যার প্রতি ইচ্ছা ক্ষমাশীল হবে, আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। তোমরা কি মনে কর যে, তোমাদের ছেড়ে দেয়া হবে এমনি, যতক্ষণ না আল্লাহ্ জেনে নেবেন

---

৫০ সূরা নিসা,৭৪-৭৫

www.amarboi.org

তোমাদের কে যুদ্ধ করেছে এবং কে আল্লাহ্, তাঁর রসূল ও মুসলমানদের ব্যতীত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করা থেকে বিরত রয়েছে। আর তোমরা যা কর সে বিষয়ে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত।[৫১]

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

বল, তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই তোমাদের পত্নী, তোমাদের গোত্র তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় কর এবং তোমাদের বাসস্থান-যাকে তোমরা পছন্দ কর-আল্লাহ্, তাঁর রাসূল ও তাঁর রাহে জেহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা কর, আল্লাহ্র বিধান আসা পর্যন্ত, আর আল্লাহ্ ফাসেক সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না।[৫২] (সূরা তওবা-২৪)

أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ

তোমরা কি হাজীদের পানি সরবরাহ ও মসজিদুল-হারাম আবাদকরণকে সেই লোকের সমান মনে কর, যে ঈমান রাখে আল্লাহ্ ও শেষ দিনের প্রতি এবং যুদ্ধ করেছে আল্লাহ্র রাহে, এরা আল্লাহ্র দৃষ্টিতে সমান নয়, আর আল্লাহ্ জালেম লোকদের হেদায়েত করেন না। যারা ঈমান এনেছে, দেশ ত্যাগ করেছে এবং আল্লাহ্র রাহে নিজেদের জান ও মাল দিয়ে জেহাদ করেছে, তাদের বড় মর্যাদা রয়েছে আল্লাহ্র কাছে আর তারাই সফলকাম।[৫৩] (তওবা ১৯-২০)

All Muslims Must Make Jihad-Jihad is an obligation from Allah on every Muslim and cannot be ignored nor evaded. Allah has ascribed great importance to jihad and has made the reward of the martyrs and the fighters in His way a splendid one. Only those who have acted similarly and who have modeled themselves upon the martyrs in

---

৫১ সূরা তওবা, ১৪-১৬
৫২ সূরা তওবা,২৪
৫৩ সূরা তওবা, ১৯-২০

www.amarboi.org

their performance of jihad can join them in this reward. Furthermore, Allah has specifically honored the Mujahideen with certain exceptional qualities, both spiritual and practical, to benefit them in this world and the next. Their pure blood is a symbol of victory in this world and the mark of success and felicity in the world to come.

মানুষের ওপর মানুষের প্রভুত্বের উৎখাত

মানুষের ওপর মানুষের প্রভুত্বকে উৎখাত করে, বিশ্বব্যাপী জুলুম ও নির্যাতনের মূলোচ্ছেদ করে আল কুরআন ও আল হাদিসের ভিত্তিতে ভ্রাতৃত্ব, সমতা ও ন্যায়ের সৌধের ওপর এক আদর্শ ইসলামী সমাজ গড়ে তোলার মহান সংগ্রাম সাধনার জন্য প্রথমত প্রয়োজন হয় দাওয়াত ও তাবলিগের, জিহাদ, অতঃপর এ পথে অগ্রসরমান লোকদের বিরুদ্ধে বাধাদানকারীদের হামলা থেকে বাঁচার জিহাদ, দুনিয়ায় পরাক্রমশালী জালেম, ও আল্লাহদ্রোহী শক্তির মূলোৎপাটনের জিহাদ, ইহুদি, খ্রিষ্টান ও মুশরিক শক্তি যারা দুনিয়া থেকে আল্লাহর নূরকে নির্বাপিত করত ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে তাদের বিষদাঁত ভেঙে দেয়ার জিহাদ, ইসলামী বিধান প্রতিষ্ঠা ও বাস্তবায়নের পথে সামাজিক বিশৃঙ্খলা, হত্যা, রাহাজানি, ডাকাতি, ও নির্যাতনের দ্বারা যারা আল্লাহর দুনিয়াকে অস্থির করে তোলে তাদের প্রতি আল্লাহর ইনসাফ কার্যকরী করার জিহাদ, সর্বোপরি দুনিয়ায় একমাত্র আল্লাহর শরীয়তি বিধান কার্যকরী করা ও সঠিক মানে অবিকৃত রাখার জিহাদ।

তাই বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের ফাতেহা-ই-দোয়াজ-দহম [তিরোভাব] কবিতায়

"গুম্বজে কে রে গুমরিয়া কাঁদে মস্‌জিদে মস্‌জিদে?
মুয়াজ্জিনের হুঁশ্ নাই, নাই জোশ চিতে, শোষ হৃদে!
বেলালেরও আজ কণ্ঠে আজান ভেঙে যায় কেঁপে কেঁপে,
নাড়ি-ছেঁড়া এ কি জানাজার ডাক হেঁকে চলে ব্যেপে ব্যেপে!
উস্‌মানের আর হুঁশ নাই কেঁদে কেঁদে ফেনা উঠে মুখে,
আলী হাইদর ঘায়েল আজি রে বেদনার চোটে ধুঁকে!
আজ ভোঁতা সে দু'ধারী ধার
ঐ আলীর জুলফিকার!

www.amarboi.org

জিহাদের মর্যাদার কারণ

ভাববার বিষয় যে, আল্লাহর পথে জিহাদের এত মর্যাদা ও মাহাত্ম্য কেন? জিহাদকারীদেরকে কেন বারবার বলা হয় যে, তারাই সফলকাম ও উচ্চমর্যাদার অধিকারী, আর যারা জিহাদে ফাঁকি দিয়ে ঘরে বসে থাকে, তাদের প্রতি কেনই বা এত হুঁশিয়ারি? এ প্রশ্নের মীমাংসার জন্য সেইসব আয়াতের ওপর একটু দৃষ্টি বুলিয়ে নেয়া দরকার যাতে জিহাদের হুকুম, তার মাহাত্ম্য ও জিহাদ থেকে পালানোর দোষ বর্ণিত হয়েছে। এসব আয়াতের কোথাও সাফল্য ও মাহাত্ম্যের অর্থ ধন-সম্পদ ও রাজ্য লাভ বলা হয়নি।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

মুমিনগণ, আমি কি তোমাদেরকে এমন এক বাণিজ্যের সন্ধান দেব, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে মুক্তি দেবে? তা এই যে, তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং আল্লাহ্র পথে নিজেদের ধন-সম্পদ ও জীবনপণ করে জেহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্যে উত্তম; যদি তোমরা বোঝ।

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ

আল্লাহ্ তাদেরকে ভালবাসেন, যারা তাঁর পথে সারিবদ্ধভাবে লড়াই করে, যেন তারা সীসাগালানো প্রাচীর।

أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

তোমরা কি হাজীদের পানি সরবরাহ ও মসজিদুল-হারাম আবাদকরণকে সেই লোকের সমান মনে কর, যে ঈমান রাখে আল্লাহ্ ও শেষ দিনের প্রতি এবং যুদ্ধ করেছে আল্লাহ্র রাহে, এরা আল্লাহ্র দৃষ্টিতে সমান নয়, আর আল্লাহ্ জালেম লোকদের হেদায়েত করেন না।

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

বল, তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই তোমাদের পত্নী, তোমাদের গোত্র তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় কর এবং তোমাদের বাসস্থান-যাকে তোমরা

www.amarboi.org

পছন্দ কর-আল্লাহ্, তাঁর রাসূল ও তাঁর রাহে জেহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা কর, আল্লাহ্র বিধান আসা পর্যন্ত, আর আল্লাহ্ ফাসেক সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না।

গীতায় বলা হয়েছে : শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন যে, তুমি যদি এই যুদ্ধে জয়ী হতে পার তাহলে পৃথিবীর রাজত্ব লাভ করতে পারবে। কিন্তু পবিত্র কুরআনে কোথাও এভাবে পার্থিব ধন-দৌলত ও রাজত্বের লোভ দেখিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়নি। উপরন্তু সব জায়গাতেই আল্লাহর পথে জিহাদের বিনিময়ে শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আল্লাহর নিকট উচ্চমর্যাদা লাভ এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে অব্যাহতি লাভের আশ্বাস দেয়া হয়েছে। হাজীদের পানি পান করানো এবং কা'বা শরীফের সেবা ও তত্ত্বাবধান করা তৎকালীন আরবের একটা বিরাট অর্থ উপার্জন ও প্রভাব-প্রতিপত্তি লাভের উপায় বলে গণ্য হতো। সেই কাজের চাইতে ঘরবাড়ি ছেড়ে আল্লাহর পথে বেরিয়ে যাওয়া ও আল্লাহর পথে জিহাদ করাকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। আর এ কাজের জন্য আল্লাহর নিকট উচ্চমর্যাদা লাভ ছাড়া অন্য কোন পুরস্কারেরও উল্লেখ করা হয়নি। অন্য জায়গায় একটি বাণিজ্যের পাঠ এমনভাবে দেয়া হয়েছে যে, সেখানে কিছু ধন-সম্পদের উল্লেখ হবে বলে ধারণা করা হয় কিন্তু একটু অগ্রসর হলেই দেখা যায়, সে বাণিজ্য আর কিছু নয়, কেবল আল্লাহর পথে জানমালের পুঁজি বিনিয়োগ করা এবং তার বিনিময়ে পারলৌকিক আজাব থেকে অব্যাহতি লাভ। অন্য জায়গায় জিহাদে যারা গড়িমসি করে তাদেরকে এই বলে ভর্ৎসনা ও তিরস্কার করা হয়েছে যে, তাদেরকে স্ত্রী-পুত্রের ভালোবাসা এবং সঞ্চিত ধন-সম্পদ, বাণিজ্য ও ঘরবাড়ি হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার ভয় পেয়ে বসেছে।

ঈমানের অগ্নিপরীক্ষায় পৃথিবীতে প্রতারণা, জুলুম, বেইনসাফি, হত্যাকাণ্ড ও লুটতরাজ চলুক এবং দুনিয়ার মানুষ আল্লাহর দাসত্ব ছেড়ে সৃষ্ট জীবের দাসত্ব করে। তাদের উচ্চ মানবীয় মর্যাদা শ্রেষ্ঠত্বকে অপমানিত ও কলঙ্কিত করুক। সুতরাং যে মানবগোষ্ঠী কোন প্রকার ব্যক্তিগত স্বার্থ ও ধন-দৌলতের আশা-অভিলাষ ছাড়াই কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য পৃথিবীকে ঐসব অরাজকতা ও মলিনতা থেকে মুক্ত ও পবিত্র করতে সঙ্কল্পবদ্ধ হয়, যারা জুলুম ও অবিচারের মূলোৎপাটন করে তার স্থলে ন্যায়নীতি ও সুবিচার প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্যোগী হয়, যারা এই মহৎ কাজে নিজেদের জান-মাল, বাণিজ্য, পিতা, পুত্র, ভাই বেরাদর, স্ত্রী ও আত্মীয়স্বজনের মায়া এবং ঘরের আরাম-আয়েশ, বিলাস ব্যসন সবকিছুই বিসর্জন দিতে পারে, তাদের চেয়ে বেশি আল্লাহর ভালোবাসা ও সন্তুষ্টি লাভের

www.amarboi.org

অধিকারী আর কে? সাফল্য ও বিজয়ের সিংহদ্বার তাদের জন্য ছাড়া আর কার জন্য উন্মুক্ত হতে পারে? [৫৪]

অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে লড়াই

আজকের মানবসমাজ জালেম ও মজলুম, প্রভু ও গোলামের দু'টি গোষ্ঠীতে যেরূপ বিভক্ত হয়ে আছে এবং আজকের বিশ্ববাসীর নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবন কোথাও দাসত্ব ও জুলুমের শিকার হয়ে, কোথাও সীমাহীন স্বৈরাচারী ও পাপাচারের পরিণামে যেরূপ ধ্বংস ও বিনাশের পথে এগিয়ে চলেছে, তাও হয়তো আর চলতো না। অন্যায়-অত্যাচার থেকে অন্যকে বাঁচানো তো অনেক বড় কথা কেবল নিজেদের ওপর থেকে জুলুম প্রতিহত করার অনুভূতি ও উদ্যমও যদি কোন মানবগোষ্ঠীর মধ্যে থাকে এবং এর জন্য তারা যদি নিজেদের আরাম ও বিলাস, ধন ও সম্পত্তি, ইন্দ্রিয় সুখ ও প্রাণের মায়া সব কিছুকে বিসর্জন দেয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে পারে, তা হলে সে মানবগোষ্ঠী কখনো লাঞ্ছনা ও অবমাননার শিকার হতে পারে না; তার ইজ্জত ও সম্ভ্রমকে কেউ পদদলিত করতে পারে না। সত্যের সামনে অবলীলাক্রমে মাথা নত করে দেবে এবং অসত্যের সামনে মাথা নত করার চেয়ে মৃত্যুকে শ্রেয় জ্ঞান করবে, এটাই হওয়া চাই একটা মর্যাদাশীল মানবগোষ্ঠীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।[৫৫]

কিন্তু এই সর্বনিম্ন স্তর থেকেও নিচে নেমে গিয়ে যে জাতি সত্যের সংরক্ষণের দায়িত্বও পালন করতে পারে না এবং যাদের মধ্যে ত্যাগ কোরবানির মনোবৃত্তি এত কমে যায় যে, অন্যায় ও অসত্যের প্রভুত্ব খতম করা অথবা যে জাতি নিজে খতম হয়ে যাওয়ার পরিবর্তে অন্যায়ের অধীনতা মেনে বেঁচে থাকাকেই বরণ করে নেয়, সে জাতির পৃথিবীতে কোন মর্যাদা থাকতে পারে না। এমন জাতির বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়াই ভালো। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা এ ধরনের কাপুরুষ জাতিসমূহের কথা বারবার উল্লেখ করে ঐ কথাটাই বুঝাতে চেয়েছেন। কুরআনে বর্ণিত ঐ জাতিগুলো এমনি নিকৃষ্ট চরিত্রের ছিল যে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গেলে জান-মাল ও ইন্দ্রিয় সুখের অনিষ্ট ঘটবে এই ভয়ে জিহাদ থেকে বিরত থাকতো। শেষ পর্যন্ত অন্যায় ও অসত্যের প্রভুত্ব তারা মেনে নেয় এবং নিজেদের ভাগ্যকে চিরদিনের জন্য ব্যর্থতার গ্লানি দিয়ে ভরে তোলে। এরূপ জাতিগুলোকে আল্লাহ জালেম জাতি বলে অভিহিত করে থাকেন। অর্থাৎ নিজেদের কাজ দ্বারা তারা নিজেদের ওপর জুলুম করছে এবং

---

৫৪ মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী, আল জিহাদ, ঢাকা ঃ আধুনিক প্রকাশনী।
৫৫ তদেক পৃঃ ৫০

www.amarboi.org

সত্যি সত্যি তারা নিজেদের জুলুমের দ্বারাই নিজেদের ধ্বংস ডেকে এনেছে। এক স্থানে আল্লাহ তা'আলা তাদের দৃষ্টান্ত নিম্নরূপ দিয়েছেন। পূর্ববর্তী ইবরাহিমের জাতি এবং আ'দ, সামুদ ও নূহের জাতিসমূহ এবং মাদায়েনবাসী ও মুতাফিকাতধারীদের ইতিহাস কি তারা জানে না? তাদের কাছে নবীরা সুস্পষ্ট নির্দেশমালা নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু আল্লাহ তাদের ওপর জুলুম করেননি বরং তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর জুলুম করেছিল। পক্ষান্তরে ঈমানদার নারী-পুরুষরা পরস্পরের মিত্র ও সহযোগী। তারা ভালো কাজের আদেশ করে ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করে।[৫৬]

কাপুরুষ জাতির জন্য লাঞ্ছনা

কিন্তু সেই কাপুরুষ জাতি তাদের লাঞ্ছনাময় জীবন নিয়েই সন্তুষ্ট রইল। ভীরুতা থেকে তারা মুক্ত হতে পারলো না। হযরত মূসা (আ.)-কে তারা স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিল :

হে মূসা, ওরা যতক্ষণ ওখানে আছে, ততক্ষণ আমরা কিছুতেই ঢুকতে পারবো না। তার চাইতে বরং তুমি আর তোমার আল্লাহ লড়াই কর গিয়ে। আমরা এখানে বসে রইলাম।[৫৭]

অবশেষে তাদের এই ক্লীবতা ও ভীরুতার দরুন আল্লাহ তা'আলা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে, চল্লিশ বছরের মধ্যে ওদের আর কোন আবাসভূমি জুটবে না, যাযাবরের মত দেশে দেশে ঘুরে বেড়াবে।

আল্লাহ তা'আলা ফরমান জারি করলেন যে, যে ভূখণ্ড তাদের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিল তা এখন চল্লিশ বছরের জন্য নিষিদ্ধ করে দেয়া হলো। এখন ওদের দুনিয়াময় ঘুরে বেড়াতে হবে।[৫৮]

সূরা বাকারার এক জায়গায় খুবই চিত্তাকর্ষকভাবে বনি ইসরাইলের এই কাপুরুষতা, ধন-সম্পদ ও জানের মায়া এবং মৃত্যুভীতির উল্লেখ করা হয়েছে। এসব ত্রুটির দরুন তারা আল্লাহর পথে জিহাদের কর্তব্য পরিত্যাগ করেছিল। ফলে চূড়ান্ত জাতীয় ধ্বংস ও বিনাশই হয়েছিল এর শেষ পরিণতি। আল্লাহ বলেন :

মৃত্যুর ভয়ে যে হাজার হাজার লোক দেশত্যাগ করেছে, তাদের ব্যাপারটা ভেবে দেখনি? আল্লাহ তা'আলা তাদের ওপর মৃত্যুর আদেশ জারি করে দিলেন। তারপর পুনরায় তাদের জীবিত করলেন। বস্তুত আল্লাহ তা'আলা মানুষের ওপর

---

৫৬ সূরা তওবা
৫৭ সূরা মায়েদা
৫৮ তদেক, ৪

www.amarboi.org

বড়ই অনুগ্রহ করে থাকেন। কিন্তু বেশির ভাগ লোক সেজন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।

এর পরই আল্লাহ মুসলমানদেরকে সত্যের জন্য যুদ্ধে অংশগ্রহণের নির্দেশ দিলেন– আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর এবং জেনে রেখ, আল্লাহ তা'আলা সব কিছুই জানেন ও শোনেন।

এরপর বনি ইসরাইলের আর একটি গোষ্ঠীর উল্লেখ করা হয়েছে।

মূসার পরবর্তী সময়কার বনি ইসরাইলের সেই গোষ্ঠীটির কথা ভেবে দেখনি, যারা তাদের নবীকে বলেছিল যে, আমাদের জন্য একজন রাজা নিয়োগ করুন, যাতে আমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করতে পারি? নবী বললেন, তোমাদের যুদ্ধের নির্দেশ দেয়া হলে আবার পিঠটান দেবে নাতো? তারা বললো, সে কি! আমরা ঘরবাড়ি ও সন্তান-সন্ততি থেকে নির্বাসিত হয়েছি। তবুও লড়াইতে পিঠটান দেব কেন? কিন্তু কার্যত যখন যুদ্ধের হুকুম এল তখন গুটিকয় লোক ছাড়া সকলেই পিছু হটে গিয়েছিল। আল্লাহ জালেমদের বিষয়ে সবিশেষ অবগত আছেন।[৫৯]

এ ধরনের বহু উদাহরণ আছে। এসব উদাহরণ বারবার উল্লেখ করে এ কথাই বোঝানো হয়েছে যে, সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা এবং স্থায়িত্বের জন্য সত্যিকার ত্যাগ ও কোরবানির প্রয়োজনই সবচেয়ে বেশি। এই ত্যাগ ও কোরবানিই হলো সত্য ও ন্যায়ের রক্ষক। যে জাতি এই ত্যাগের প্রেরণা হারায়, সে জাতি অনতিবিলম্বেই অন্যায় ও অসত্যের হাতে পর্যুদস্ত হয়ে থাকে। আর সে পরাজয়ের পরিণতি চূড়ান্ত ধ্বংস ছাড়া আর কিছু নয়।

ইসলামের দৃষ্টিতে মুসলমানদের জাতীয় জীবনের জন্য স্বাধীনতা, স্বাধিকারও সার্বভৌমত্ব সবচেয়ে জরুরি জিনিস। স্বাধীনতা হারানোর পর মুসলমানদের মধ্যে মানবতার যে সর্বোচ্চ সেবার জন্য তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে, তার ক্ষমতা আর থাকে না। এমনকি তারা নিজেদের শরীয়তভিত্তিক সমষ্টিগত ও ব্যক্তিগত ধর্মীয় জীবনকেও বহাল রাখতে পারে না। এ জন্য ইসলামী রাষ্ট্র ও ইসলামী জাতীয়তার ওপর আক্রমণ করা স্বয়ং ইসলামের ওপরই আঘাত হানার শামিল। কোন দুশমনের যদি ইসলামকে নির্মূল করার ইচ্ছা নাও থেকে থাকে বরং শুধু মুসলমানদের রাজনৈতিক শক্তি খর্ব করাই যদি উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তথাপি তার সাথে যুদ্ধ করা ঠিক তেমনিভাবে ফরজ যেমন ইসলামকে নির্মূলকারীর সাথে যুদ্ধ করা ফরজ।

---

৫৯ সূরা বাকারা, ৩২

www.amarboi.org

জিহাদ, ধর্মযুদ্ধ ও চরমপন্থা

মুসলিম এবং অমুসলিম অনেকের দৃষ্টিতে জিহাদ একটি ধর্মযুদ্ধ। কুরআন জিহাদের অর্থ প্রচেষ্টা অথবা সর্বাত্মক সংগ্রাম। জিহাদ মোটেই যুদ্ধসংশ্লিষ্ট বিষয় নয় বরং ধর্মযুদ্ধের চেয়েও অনেক নিম্নতম পর্যায়ের বিষয়। ধর্মের উদ্দেশ্য প্রচার এবং তা বাস্তবায়নের সর্বাত্মক প্রচেষ্টার নাম জিহাদ। প্রকৃতপক্ষে ধর্মযুদ্ধ করার জন্য খ্রিষ্ট ও ইহুদি ধর্মে যতটুকু বাধ্যবাধকতা বা নির্দেশ রয়েছে অনুরূপ বাধ্যবাধকতার কথা ইসলামে বলা হয়েছে। ফলে জিহাদের ধর্মযুদ্ধের সমার্থক করা দেখলে, কুরআনের মধ্যে জিহাদের যে বর্ণনাভঙ্গি তার মূল অর্থ বা চেতনায় বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। ধর্মযুদ্ধেকে ইসলামী যুদ্ধ বলার অর্থই হলো ইতিহাসের সত্যকে আড়াল করা। প্রকৃতপক্ষে ধর্মযুদ্ধ ব্যাপারটি পাশ্চাত্যের ইতিহাসের একটি অংশ বা ঐতিহ্য। দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপে চার্চ এবং রাষ্ট্রের মধ্যকার সিদ্ধান্তমূলক সংঘাতই ছিল ধর্মযুদ্ধ। অতঃপর সে ধর্মযুদ্ধের মতবাদ পরিবর্তিত হতে থাকে এবং পর্যায়ক্রমে তাকে ন্যায়যুদ্ধের সাথে তুলনা করা হয়। কালক্রমে এ সংঘাতের মধ্য দিয়ে প্রতিবাদী সংস্কার আন্দোলন জন্মলাভ করে। এ প্রতিবাদী সংস্কার আন্দোলন ইউরোপে সে সময়ের ধর্মযুদ্ধের কারণে নিজেদের ভেতর যে ক্লান্তিকর দীর্ঘ রক্তপাত চলছিল অবশেষে তাকে থামাতে সমর্থ হয়। দীর্ঘ রক্তপাতের পর ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে ইউরোপের মানুষ একমত হয় যে, ধর্মের নামে অথবা ধর্মীয় বিষয়াদি আরোপের সব রকমের জবরদস্তিকে অন্যায় মনে করতে হবে এবং এ নিয়ে কোন যুদ্ধের সূচনা হলে তার বিপক্ষে অবস্থান নিতে হবে।[৬০] ধর্মের সাথে সে সময়ের চার্চের জুলুম এক হয়ে যাওয়ায়, রাজনীতি থেকে ধর্মের আলাদাকরণের জন্য গড়ে ওঠা মুক্তি বা সংস্কার আন্দোলন হিসেবে বিবেচিত এনলাইটেনটেমেন্টর পক্ষে ইউরোপীয়রা অবস্থান নেয় এবং সে থেকে তাদের মন-মানসে নিবিড়ভাবে গ্রথিত হয় যে, "ধর্ম নিছকই ধর্মতত্ত্বের পক্ষে বলা কতগুলো বিষয়ের বিশেষায়িত জ্ঞান, যার সাথে আধুনিক রাজনীতির কোন সংশ্রব নেই" এবং আরেকটি ধর্ম বিশ্বাসের মতই তাদের চূড়ান্ত ধারণা যে, "আধুনিকতা আর ধর্ম কোনটির সাথে কোনটির মিল নেই।" অবশ্য এ ধারণার ব্যাপারে অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন যার কারণে ধারণাটি তত্ত্বীয় বা ঐতিহাসিকভাবে সর্বজনগ্রাহ্য হয়নি।

যুদ্ধকে বোঝাতে কুরআনে কোনভাবেই 'জিহাদ' শব্দটি ব্যবহার করা হয়নি। ধর্মের মধ্যে কোন জোর-জবরদস্তি নেই, ফলে যুদ্ধের মাধ্যমে ইসলামের বিকাশ ঘটানোর কোন সুযোগই নেই। সুতরাং জিহাদকে একটি "ধর্মযুদ্ধ" হিসেবে বর্ণনা করা দু'ভাবে বিভ্রান্তিকর। এক, জিহাদের পরমতম উদ্দেশ্যকে যুদ্ধের মধ্যে

---

৬০ জেমস টার্নার জনসন, দি হলি ওয়ার আইডিয়া ইন ওয়েস্টার্ন এন্ড ইস. ট্রাডিশনস।

www.amarboi.org

নামিয়ে আনা আর অন্যটি হলো জিহাদের সাথে যেহেতু ধর্মের বিষয় জড়িত সেহেতু একে অন্যায় হিসেবে চিত্রিত করা।

অথচ কুরআনে 'জিহাদ' (এবং তৎসম্পর্কিত) শব্দ ৩৬ বার এসেছে এবং প্রতিবারেই বর্ণিত হয়েছে ন্যায়নীতির সংগ্রামের কথা। ক্বালব, জিহ্বা, কলম, নৈতিকতা, ঈমান ইত্যাদির সাথে জিহাদ শব্দটি গভীরভাবে যুক্ত।

আজকের সমস্যা দুটো, প্রথমটি : ইসলামকে বোঝার পাশ্চাত্যের সমস্যা। পাশ্চাত্যের নিজস্ব মনস্তত্ত্ব, জীবনাচারের উত্তরাধিকার এবং পরিবর্তনশীলতার আলোকে ইসলামকে বোঝা। বাস্তবিকই এটি একটি বড় সমস্যা। দ্বিতীয়টি : ইসলাম ও মুসলমানদের নিয়ে মধ্যযুগ হতে সৃষ্ট ভয়ভীতি এবং নানা কল্পকাহিনী যা বংশপরম্পরায় বর্তমান বুদ্ধিবৃত্তির আলোচনার ওপরেও ছায়া বিস্তার করে আছে। যার তাজা উদাহরণ হলো : 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধকে ব্যাখ্যা করার সময় প্রেসিডেন্ট বুশ একে ক্রুসেড বলে কেন যে বর্ণনা করলেন? (যদিও শব্দটির ব্যবহার নিয়ে পরে অনেকেই সমালোচনা করেছেন। এর কারণ এ বিশেষ শব্দটির সাথে ইতিহাস এবং অতীতের তাড়না মিশে আছে। পশ্চিমের বহু মানুষ কেন হাইজ্যাকারের একই কাতারে গণ্য করে এবং সন্ত্রাসীদের কাজকে ইসলামের আসল রূপ বলে ব্যাখ্যা করে? কেন 'ইসলামবিষয়ক' কথিত পশ্চিমা পণ্ডিত বার্নার্ড লুইস মুসলিম সমাজের ইতিহাস লিখতে গিয়ে অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজ মনস্তত্ত্বের আলোচনা না করে যেখানে যেখানে হিংসা-বিদ্বেষের উপাদান রয়েছে সেসব নাড়াচাড়া করে ক্রোধ জাগানো, অভিযুক্ত করা এবং অপরাধী চিহ্নিত করে খোলাখুলি মুসলিম জাতি বিদ্বেষে নামলেন?[৬১]

এসব পণ্ডিত ইসলামের অসত্য রূপ বর্ণনা করে নিজেদের বিতর্কিত করেছেন বটে, অন্য দিকে এর ফলে আমেরিকার 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের' নৈতিকতার মানবে নিম্নমুখী করে দিয়েছেন। এ যুদ্ধে সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে লক্ষ্য স্থির থাকলেও বেঘোরে নারী-শিশু প্রাণ হারাচ্ছে এবং অসামরিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে ধ্বংস করা হচ্ছে। তারা এবং মুসলিমদেরকে সন্দেহভাজন সন্ত্রাসী হিসেবে চিহ্নিত করে প্রতিটি আমেরিকানের জীবনকে শত্রুর নজরদারির মধ্যে এনে ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলেছে। এ অবস্থাকে স্বদেশ এবং স্বজাতির প্রতি অতিরিক্ত ভালবাসা প্রদর্শন হিসেবে দাবি করা যায় বটে তবে এর ভেতরেই ইসলাম ও মুসলিম সম্বন্ধে আমেরিকানদের ভ্রান্তি-ভুল রাজনীতিকেই এগিয়ে নিচ্ছে।

সন্ত্রাস ব্যক্তি বা গ্রুপভিত্তিক হয়ে থাকে। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের উসকানিতেও সন্ত্রাস মাঝে মাঝে উৎসাহিত হয়। সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে সহিংসতা। ভীতি প্রদর্শন ও জোর করে অন্যায় দাবি আদায় বর্তমানকালের নিয়মে পরিণত

---

৬১ আসমা বারলাস, জিহাদ, ধর্মযুদ্ধ ও সন্তাসবাদ অপব্যাখ্যার রাজনীতি।

www.amarboi.org

হয়েছে। যারা সন্ত্রাস ও কাউন্টার-সন্ত্রাসে জড়িত, কোন আইন বা নীতিই তাদেরকে শৃঙ্খলাবদ্ধ বা নিয়ন্ত্রণে ফিরিয়ে আনতে পারছে না। দস্যুরা আইন ও সমাজের আশ্রয় পায় না। কিন্তু মদদদানকারীদের সহযোগিতায় তারা দুর্বলদের ওপর আক্রমণ চালিয়ে থাকে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে (১৯৩৯-১৯৪৫) বিজয়ী শক্তির দ্বারা একটি বড় দুষ্টচক্র সৃষ্টি হয়। এ যুদ্ধে মিত্রবাহিনীর কাছে নাৎসীবাদ ও ফ্যাসিবাদ পরাজিত হয়। এরপরও পরাজিত শক্তি ইহুদিবাদকে সমর্থন করে এবং উপনিবেশবাদ থেকে কখনও ফিরে আসেনি। এর ফলে আলজেরিয়ার ওপর ফ্রান্সের আগ্রাসন ও প্যালেস্টাইনের ওপর ইসরাইলি আগ্রাসনে অনেক গেরিলার জন্ম হয়। তারা আলজেরিয়াতে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে সফল হলেও ইসরাইলের বিরুদ্ধে এখনও তারা সংগ্রাম করে যাচ্ছে। আল-ফাতাহ আন্দোলনের সফল কমান্ডোগণ তাদের মাতৃভূমি পুনরুদ্ধারে এবং বর্তমানকালের ফ্যাসিবাদের শৃঙ্খল থেকে তাদের জনগণকে উদ্ধার করতে আজো সংগ্রাম করে যাচ্ছেন। ভিয়েতনামে যে ঘটনা আমাদেরকে তদানীন্তন আফগানিস্তানের ওপর সোভিয়েত আগ্রাসনের কথা মনে করিয়ে দেয়। এ আগ্রাসন মুজাহেদিনদেরকে অদম্য সাহসে যুদ্ধ করতে আরো বেশি অনুপ্রাণিত করে এবং অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে আফগান মুজাহেদিনরা তাদের মাতৃভূমি ফিরে পায়।

বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে দৃঢ়আস্থা ও সুনির্দিষ্টভাবেই বলা যায়, ইসলাম ও সন্ত্রাসের মধ্যে কোন ধরনের সম্পর্ক নেই। তারা দু'টি ভিন্ন মেরু। ইসলাম আক্ষরিক অর্থে আল্লাহর নিকট পূর্ণ আত্মসমর্পণকে বুঝায়, এর অর্থ হলো শান্তি। ইসলাম আল্লাহকে ভয় করতে বলে, তাহলে কিভাবে ইসলাম একজন অপরজনকে ভয় দেখাতে বলবে? আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণকারী কখনো অন্যের নিকট কাউকে আত্মসমর্পণ করতে বলে না। ভীতি প্রদর্শন ও প্রতারণা ইসলামী চেতনার পরিপন্থী।

ইসলামের অন্যতম সামাজিক মূল্যবোধ 'আসসালামু আলাইকুম' বলে একে অপরকে শুভেচ্ছা জানানো। যার অর্থ 'আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক'। প্রত্যেককে কাজ শুরু করার পূর্বে 'পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি" বলার তাগিদ দেয়া হয়েছে। কুরআনুল কারীমের প্রথম সূরা 'আল ফাতিহা'তে আল্লাহ দয়ালু ও ক্ষমাশীল এই প্রার্থনা করা হয়েছে। প্রতিটি কাজেই এভাবে দয়া কামনা করে প্রার্থনা করতে হয়। এসব কিছুই ইসলামী সমাজের প্রকৃতি ও চরিত্রকে নির্দেশ করে। এগুলো পরিপূর্ণ শান্তি, স্থিতি, স্নেহ-মমতা ও দয়া দাক্ষিণ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। ভালবাসা, দয়া ও মমতা বিশ্বাসীদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। নিম্নে দেখুন এর প্যার্থক্যটি। এখানে চরমপন্থা পান্তিক, একওয়ে কোনটারই স্থান নেই।

www.amarboi.org

আল-কুরআনে জিহাদের নির্দেশ

জিহাদের গুরুত্ব ও ফযিলত যে কত ব্যাপক আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাই আল্লাহর পথে জিহাদ করা মু'মিনের ওপর ফরজ। আল্লাহর নির্দেশ এসেছে আল্লাহর বিধান অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার, এ জন্য পর্যাপ্ত শক্তি সামর্থ্য সঞ্চয় করার, কাফিরদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক জিহাদ করা, এমনকি জিহাদের মাধ্যমে আল্লাহর বান্দাহর জান ও মাল জান্নাতের বিনিময়ে ক্রয় করেছেন বলেও ঘোষণা দেয়া হয়েছে। আল্লাহর নিকট ক্ষমা ও নাজাতের মাধ্যম হলো জিহাদ। মু'মিনকে সর্বদাই জিহাদে তৎপর থাকতে হবে। জিহাদ থেকে বিরত থাকা আল্লাহর আজাবের উপযুক্ত হওয়ার কারণ। দুনিয়ায় মজলুম ও দুর্বল লোকদের মুক্তির জন্যই জিহাদ করতে হবে ঈমান ও কুফরের মধ্যকার পার্থক্যকারী আমল হলো জিহাদ, যাবতীয় ফিতনা নির্মূলের মাধ্যম হলো জিহাদ। জিহাদ অন্যসব ইবাদতের চেয়ে উত্তম ইবাদত। মুজাহিদগণই রহমতপ্রাপ্ত, মুজাহিদকেই ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করা হয়, জিহাদে আহত ও শহীদ ব্যক্তি তাজা রক্তে রঞ্জিত দেহ নিয়ে হাশরের ময়দানে উঠবে। শাহাদাতের মর্যাদা অসীম, আল্লাহর পথে জিহাদ নফস ও শয়তানের কুমন্ত্রণার বিরুদ্ধে প্রথম শুরু হয়, অতঃপর বর্তমান সভ্যতার চরম উৎকর্ষতার যুগে সকল ধরনের প্রচার মাধ্যমের সাহায্যে জিহাদ পরিচালিত হবে। শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পরও শরীয়ত কায়েমের পর্যায়সমূহে দীন কায়েম করা ও রাখার জন্য চলবে আল্লাহর পথে জিহাদ।

আল্লাহর পথে জিহাদের পর্যায়সমূহ হলো দাওয়াত ইলাল্লাহ, শাহাদাত 'আলান্নাস, কেতাল ফি সাবিলিল্লাহ, ইকামতে দ্বীন ও আমর বিল মারুফ ওয়াননাহি আনিল মুনকার।[৬২] হিজরতের পর দ্বিতীয় বছরেই রমজানুল মুবারক মাসে বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এরপর পর্যায়ক্রমে ৮ম হিজরির শাওয়াল মাস অর্থাৎ রাসুলুল্লাহ (সা.) এর ওফাতের পূর্ব পর্যন্ত ২৯টি গাযওয়া ও ৫৭টি সারিয়াসহ মোট ৮৬টি সশস্ত্র যুদ্ধাভিযান অনুষ্ঠিত হয়। ইসলামী জিহাদের এ পর্যায় সম্পর্কে সার্বিক পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, আল্লাহর পথে জিহাদকে আত্মরক্ষামূলক ইসলামী লড়াই আখ্যা দেয়ার কোনই সঙ্গত কারণ নেই। এটা শুধুমাত্র ইসলামবিরোধী ও বিভ্রান্তকারী লোকদের আক্রমণে প্রভাবিত লোকদের আবিষ্কার। ইসলামী বিধান কায়েমের তৎপরতার সাথে মুসলমানদের সম্পর্কে ঢিলে হয়ে আসার দরুন ইসলামবিরোধী লেখকদের আক্রমণের তীব্রতা অনুভব করেই দুর্বলমনা লেখকগণ জিহাদকে 'আত্মরক্ষামূলক' যুদ্ধ হিসেবে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস পায়।

---

৬২ ড. মুহাম্মদ নজীবুর রহমান, ইসলামে জিহাদের বিধান, ঢাকা ঃ আধুনিক প্রকাশনী।

www.amarboi.org

অথচ আল্লাহ পাকের নির্দেশ স্পষ্ট-

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

"(ন্যায় প্রতিষ্ঠা ও অন্যায় নির্মূল করার জন্যে) যুদ্ধ তোমাদের ওপর ফরয করে দেয়া হয়েছে, আর এটাই তোমাদের ভালো লাগে না, কিন্তু (তোমাদের জেনে রাখা উচিত,) এমনও তো হতে পারে যা তোমাদের ভালো লাগে না, তাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর, আবার (একইভাবে) এমন কোনো জিনিস, যা তোমাদের খুবই ভালো লাগবে, কিন্তু (পরিণামে) তা হবে তোমাদের জন্যে (খুবই) ক্ষতিকর; আল্লাহ তায়ালাই সবচাইতে ভালো জানেন, তোমরা কিছুই জানো না।[৬৩]"

فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ (-) وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ (-) ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ

"হে ঈমানদারগণ, কাফেরদের ন্যায় কথাবার্তা বলো না, যাদের নিকটাত্মীয়রা যদি কখনও বিদেশে যায় বা যুদ্ধে শরিক হয় (এবং সেখানে কোনো দুর্ঘটনার শিকার হয়) তখন তারা বলে যে, তারা আমাদের কাছে থাকলে মারা যেত না বা নিহত হতো না। আল্লাহ এ ধরনের কথাবার্তা তাদের মনে দুঃখ ও চিন্তার কারণ বানিয়ে দেন। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর পথে মারা যাও অথবা নিহত হও, তাহলে আল্লাহর যে রহমত ও মাগফিরাত তোমরা পাবে, তা এ ধরনের লোকেরা যা কিছুই সংগ্রহ-সঞ্চয় করেছে তার চেয়ে অনেক উত্তম। আর তোমরা মৃত্যুবরণ করো বা নিহত হও, সকল অবস্থায়ই তোমাদের সবাইকে আল্লাহর নিকট সমবেত হতে হবে।"

وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

"(আল্লাহর পথে) যদি তোমরা জীবন বিলিয়ে দাও, অথবা (তাঁরই পথে) তোমাদের মৃত্যু হয়, (তাহলেই তোমাদের কি করার থাকবে? কারণ,) তোমাদের তো একদিন আল্লাহ তায়ালার সমীপে (এমনিই) একত্রিত করা হবে।[৬৪]"

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

---

৬৩ সূরা বাকারা, ২১৬
৬৪ সূরা আল-ইমরান, ১৫৬-১৫৮

www.amarboi.org

"যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে, তাদেরকে মৃত মনে করো না, প্রকৃতপক্ষে তারা জীবিত। তারা তাদের প্রভুর নিকট রিজিক পাচ্ছে। আল্লাহ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে যা কিছু দান করেছেন তা নিয়ে তারা খুশি ও পরিতৃপ্ত। এবং যেসব ঈমানদার লোক তাদের পেছনে দুনিয়ায় রয়ে গেছে এবং এখনো তাদের সাথে এসে মিলিত হয়নি তাদের জন্য কোনো ভয় ও চিন্তা নেই।"

"(এরা হচ্ছে সেসব মোনাফেক), যারা (যুদ্ধে শরিক না হয়ে ঘরে) বসে থাকলো (এবং) ভাইদের সম্পর্কে বললো, তারা যদি (তাদের মতো ঘরে বসে থাকতো এবং) তাদের কথা শুনতো, তাহলে তারা (আজ এভাবে) মারা পড়তো না; (হে নবী,) তুমি (এ মোনাফেকদের) বলো, যদি তোমরা সত্যবাদী হও তাহলে তোমাদের থেকে মৃত্যু সরিয়ে দাও।"

"যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদের তোমরা কোনো অবস্থাতেই 'মৃত' বলো না, তারা তো জীবিত, তাদের মালিকের পক্ষ থেকে (জীবিত লোকদের মতোই) তাদের রেজেক দেয়া হচ্ছে।"

الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ -إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

আর যারা আল্লাহ্‌র রাহে নিহত হয়, তাদেরকে তুমি কখনো মৃত মনে করো না। বরং তারা নিজেদের পালনকর্তার নিকট জীবিত ও জীবিকাপ্রাপ্ত। আল্লাহ্ নিজের অনুগ্রহ থেকে যা দান করেছেন তার প্রেক্ষিতে তারা আনন্দ উদযাপন করছে। আর যারা এখনও তাদের কাছে এসে পৌঁছেনি তাদের পেছনে তাদের জন্যে আনন্দ প্রকাশ করে। কারণ, তাদের কোন ভয়ভীতিও নেই এবং কোন চিন্তা ভাবনাও নেই।[৬৫]

فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

"যেসব মানুষ পরকালের বিনিময়ে এ পার্থিব জীবন ও তার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিক্রি করে দিয়েছে, সেসব মানুষের উচিত আল্লাহ তায়ালার পথে লড়াই করা, কারণ যে আল্লাহর পথে লড়াই করবে সে এ পথে জীবন বিলিয়ে দেবে কিংবা সে বিজয় লাভ করবে, অচিরেই আমি তাকে (এ উভয় অবস্থার জন্যই) বিরাট পুরস্কার দেবো।[৬৬]"

---

৬৫ সূরা আল-ইমরান, ১৬৮-১৭০
৬৬ সূরা নিসা, ৭৪

www.amarboi.org

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا

আর তোমাদের কী হলো যে, তোমরা আল্লাহর রাহে লড়াই করছ না দুর্বল সেই পুরুষ, নারী ও শিশুদের পক্ষে, যারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদিগকে এই জনপদ থেকে নিস্কৃতি দান কর; এখানকার অধিবাসীরা যে, অত্যাচারী! আর তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য পক্ষাবলম্বনকারী নির্ধারণ করে দাও এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য সাহায্যকারী নির্ধারণ করে দাও। যারা ঈমানদার তারা যে, জেহাদ করে আল্লাহ্‌র রাহেই। পক্ষান্তরে যারা কাফের তারা লড়াই করে শয়তানের পক্ষে সুতরাং তোমরা জেহাদ করতে থাক শয়তানের পক্ষাবলম্বনকারীদের বিরুদ্ধে (দেখবে) শয়তানের চক্রান্ত একান্তই দুর্বল।[৬৭]

আল কুরআনের সূরা নিসা একবার পড়ে দেখুন। তাতে দেখবেন আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে কিভাবে সদা হুঁশিয়ার থাকার জন্য বলেছেন এবং কখনো বা পূর্ণ যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে জামায়াতবদ্ধভাবে বা একাকী জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য ডাক দিয়েছেন, আপনি বুঝতে পারবেন আল্লাহ তা'আলা কী ভাষায় জিহাদের কর্তব্য পালনে অবহেলাকারী মুসলমানদেরকে তাদের নিষ্ক্রিয়তা, কাপুরুষতা ও স্বার্থপরতার জন্য ধমক দিয়েছেন। দুর্বলের সাহায্য ও মজলুমের প্রতিরক্ষার জন্য আল্লাহ কী করতে চান তাও এসব আয়াত থেকে বুঝা যাবে। সূরা আন নিসার আয়াতসমূহে আল্লাহ নামাজ-রোজার সাথে জিহাদকেও যোগ করেছেন এবং জিহাদ যে ইসলামী জীবনব্যবস্থারূপী ইমারতের একটি গুরুত্বপূর্ণ খুঁটি, তাও তিনি বুঝিয়ে বলেছেন। শুধু তাই নয়, দুর্বল মুসলমানদের মনের দোদুল্যমানতা, তাদের সন্দেহ-সংশয় দূর করে আল্লাহ তাদের মনে সাহস ও বীরত্বের সঞ্চার করেছেন। এ সূরার মহান আয়াতগুলো মুসলমানদের মন এমন মৃত্যুঞ্জয়ী মনোভাব সৃষ্টি করে যার ভিত্তিতে তারা প্রভুর নিকট থেকে নিশ্চিত প্রতিদানের আশায় মৃত্যুর মোকাবেলায় দৃপ্ত পদক্ষেপ এগিয়ে যায়। তাদের মনে এ দৃঢ় বিশ্বাস থাকে যে, ত্যাগ-কুরবানি তা যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন, মহান প্রতিপালক তার উপযুক্ত প্রতিদান থেকে কাউকে বঞ্চিত করবেন না।

সূরা আনফাল পুরোটাই জিহাদের দাওয়াত ও যুদ্ধের আহ্বানে ভরপুর। এর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মুসলমানদেরকে জিহাদে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে এবং জিহাদের

---

৬৭ সূরা নিসা, ৭৫-৭৬

www.amarboi.org

বিস্তারিত বিধি-বিধান সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এ জন্য রাসূলে কারীম (সা.) এর সঙ্গী-সাথীরা এ সূরাকে যুদ্ধ-সঙ্গীত হিসেবে ব্যবহার করেছেন। মরণপণ জিহাদ যখন শুরু হয়ে যেত, অস্ত্রের ঝনঝনানিতে যখন দশ দিক মুখরিত হতো তখন ইসলামের মুজাহিদরা এ সূরার মর্মস্পর্শী ভাষায় তেলাওয়াত করতেন আর আল্লাহর রাহে প্রাণ বিলিয়ে দোয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে যেতেন।

"আর তোমরা যতদূর সম্ভব হাতিয়ার প্রস্তুত কর এবং সদাসজ্জিত ঘোড়া তাদের মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত রেখো যেন এর সাহায্যে আল্লাহবিরোধী ও তোমাদের জানা না-জানা দুশমনের ভীত-শঙ্কিত করতে পারে। আল্লাহ এদের জানে।[৬৮]

আরো ইরশাদ হচ্ছে :

"হে নবী! মুমিনদেরকে শত্রু দমনের উদ্দেশ্যে সশস্ত্র অভিযানে উৎসাহিত করুন। তোমাদের মধ্যে যারা দৃঢ়চিত্ত ও ধৈর্যশীল হবে, তারা বিশ জন হলে দুশমনদের দু শ' জনকে পরাজিত করবে এবং এক শ' জন হলে এক হাজার কাফেরকে পরাভূত করবে। কারণ তারা অজ্ঞান।"

সূরা আত তাওবাও একটি যুদ্ধের দাওয়াত। এ সূরা পড়লে মনে হয় যেন একটি রণভেরী। এতে যুদ্ধের নিয়ম-কানুনও রয়েছে। লক্ষ্য করুন আল্লাহ কিভাবে চুক্তি ভঙ্গকারী মুশরিকদের প্রতি লা'নত বর্ষণ করেছেন।

"তাদের বিরুদ্ধে লড়ে যাও। আল্লাহ তোমাদের হাতেই তাদের শাস্তি দেবেন এবং তাদেরকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করবেন। তাদের মোকাবেলায় তোমাদের সাহায্য দান করবেন এবং মুমিনদের বুক ঠাণ্ডা করবেন।"[৬৯]

এভাবে আহলে কিতাব (ইহুদি ও খ্রিষ্টান)-দের সম্পর্কে আল্লাহ কী বলেছেন তা লক্ষ্য করুন :

"আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী নয় এবং আল্লাহ ও তার রাসূল যেসব বস্তুকে হারাম ঘোষণা করেছেন, সেগুলোকে হারাম মনে করে না আর মেনে নেয় না দীনে হককে, তোমরা সেসব কিতাবধারীদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত থাক, যতক্ষণ না তারা অধীনতা ও বশ্যতা স্বীকার করে নিজেদের হাতে জিজিয়া দানে স্বীকৃত হবে"।[৭০]

পরের কয়েকটি আয়াতে কারীমায় সামগ্রিক বিপ্লবের নির্দেশ দেখা যায়। এ নির্দেশ আপনার কাছে মনে হবে যেন মেঘমালার গর্জন আর বিজলির চোখ ঝলসানো চমক। শেষের দিকে রয়েছে এ আয়াতটি–

---

৬৮ সূরা আনফাল
৬৯ সূরা তওবা
৭০ তদেক

www.amarboi.org

"বের হয়ে যাও (জিহাদের উদ্দেশ্যে) অস্ত্রশস্ত্র হালকা হোক বা ভারী হোক এবং আল্লাহর পথে তোমাদের জান-মাল লাগিয়ে দিয়ে জিহাদ কর।"[৭১]

এরপর দেখুন যারা জিহাদের সময় ঘরে বসে থাকে তাদের সম্পর্কে কালামে ইলাহিতে কী বলা হয়েছে-

"রাসূলের যুদ্ধে চলে যাওয়ার পর যারা জিহাদ থেকে বিরত থেকে ঘরে বসে থাকলো এবং আল্লাহর পথে ধন-সম্পদ ব্যয় করে ও প্রাণ বিলিয়ে দিয়ে জিহাদ করা অপছন্দ করলো-বললো, তোমরা এ তীব্র গরমে বের হয়ো না, এরা খুবই উৎফুল্ল হয়ে পড়েছে। হে নবী, তুমি বলে দাও যে, জাহান্নামের আগুন এর চেয়েও বেশি গরম-যদি তাদের বোধশক্তি কিছু থেকেই থাকে।"[৭২]

فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ

পেছনে থেকে যাওয়া লোকেরা আল্লাহ্‌র রাসূল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বসে থাকতে পেরে আনন্দ লাভ করেছে; আর জান ও মালের দ্বারা আল্লাহ্‌র রাহে জিহাদ করতে অপছন্দ করেছে এবং বলেছে, এই গরমের মধ্যে অভিযানে বের হয়ো না। বলে দাও, উত্তাপে জাহান্নামের আগুন প্রচণ্ডতম। যদি তাদের বিবেচনা শক্তি থাকত।[৭৩]

وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا

এবং যখন মুনাফিক ও যাদের অন্তরে রোগ ছিল তারা বলেছিল, আমাদেরকে প্রদত্ত আল্লাহ্‌ ও রাসূলের প্রতিশ্রুতি প্রতারণা বৈ নয়।[৭৪]

يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا

পরের প্রসঙ্গে রাসূল (সা.) ও তাঁর সাথী মুজাহিদীন-ই-ইসলাম, "কিন্তু রাসূল (সা.) ও তাঁর সাথে যারা ছিলেন তাঁরা জান-মাল দিয়ে জিহাদ করেছেন। এবং তা-ই তাদের জন্য কল্যাণকর এবং এরাই বিজয়ী। আল্লাহ তাদের জন্য তৈরি

---

৭১ তদেক
৭২ সূরা তওবা
৭৩ সূরা তওবা ৮১
৭৪ সূরা আহযাব, ১২

www.amarboi.org

করে রেখেছেন বেহশেত-যার নিচ দিয়ে প্রবহমান রয়েছে নহরাজি এবং সেখানেই তারা চিরকাল থাকবে।"

কুরআন মজিদের একটি সূরারই নামকরণ করা হয়েছে সূরা কিতাল, যার অপর নাম হচ্ছে সূরা মুহাম্মদ। সৈনিক জীবনের প্রাণ হলো দু'টি জিনিস-আনুগত্য ও শৃঙ্খলা। আল্লাহ তা'আলা পাক কুরআনের দু'টি আয়াতে এ দু'টি জিনিস সন্নিবেশিত করেছেন। আনুগত্য প্রসঙ্গে এ সূরাতেই আল্লাহ বলেন :

"যারা ঈমানদার তারা বলে, কোনো আয়াত কেন নাজিল হলো না? এরপর যখন কোনো সুস্পষ্ট ও সুদৃঢ় আয়াত নাজিল হয় এবং তাতে জিহাদের উল্লেখ থাকে, তখন তুমি দেখবে যাদের অন্তঃকরণ রোগগ্রস্ত। তারা মৃত্যুর ভয়ে বিবর্ণ হয়ে তোমার দিকে তাকাচ্ছে। অতএব তাদের আনুগত্যের পরীক্ষা হয়ে গেল এবং কথাও জানা গেল।"

সূরা আস সফে শৃঙ্খলা প্রসঙ্গে দেখুন–

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন যারা সারিবদ্ধভাবে সীসা নির্মিত দেয়ালের ন্যায় মজবুতভাবে আল্লাহর পথে শত্রু দমনে সশস্ত্র অভিযান করে, যুদ্ধ করে।"

সূরা ফাতাহ-এ একটি যুদ্ধের বর্ণনা রয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে আল্লাহ মুমিনদের ওপর সন্তুষ্ট হলেন যখন তারা একটি গাছের নিচে তোমার [মুহাম্মদ সা] হাতে বাইয়াত গ্রহণ করছিল। তারা জেনে নিয়েছিল যা তাদের অন্তরে ছিল। অতঃপর তিনি তাদের ওপর শান্তি ও স্বস্তি নাজিল করেন। অচিরেই তারা বিজয়ী হয় এবং গনিমতের মাল তাদের হস্তগত হয় এবং আল্লাহ জবরদস্ত ও প্রজ্ঞার অধিকারী।

কুরআন হাকিমের এ সমস্ত আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে আজকের যুগের মুসলমানদের চিন্তা করা উচিত তারা জিহাদের সওয়াব থেকে কত দূরে আছে।

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

হে নবী, কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করুন এবং মুনাফেকদের সাথে কঠোরতা অবলম্বন করুন। তাদের ঠিকানা হলো দোযখ এবং তাহল নিকৃষ্ট ঠিকানা।[৭৫]

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ

তোমরা আল্লাহ্‌র জন্য শ্রম স্বীকার কর যেভাবে শ্রম স্বীকার করা উচিত। তিনি তোমাদেরকে পছন্দ করেছেন এবং ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের ওপর কোন

---

৭৫ সূরা তওবা, ৭৩

www.amarboi.org

সঙ্কীর্ণতা রাখেননি। তোমরা তোমাদের পিতা ইবরাহিমের ধর্মে কায়েম থাক। তিনিই তোমাদের নাম মুসলমান রেখেছেন পূর্বেও এবং এই কুরআনেও, যাতে রাসূল তোমাদের জন্যে সাক্ষ্যদাতা এবং তোমরা সাক্ষ্যদাতা হও মানবমণ্ডলীর জন্য। সুতরাং তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহ্‌কে শক্তভাবে ধারণ কর। তিনিই তোমাদের মালিক। অতএব তিনি কত উত্তম মালিক এবং কত উত্তম সাহায্যকারী।[৭৬]

وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ

আর যখন নাযিল হয় কোন সূরা যে, তোমরা ঈমান আন আল্লাহ্‌র ওপর, তাঁর রাসূলের সাথে একাত্ম হয়ে; তখন বিদায় কামনা করে তাদের সামর্থ্যবান লোকেরা এবং বলে আমাদের অব্যাহতি দিন, যাতে আমরা (নিষ্ক্রিয়ভাবে) বসে থাকা লোকদের সাথে থেকে যেতে পারি।[৭৭]

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

যে কষ্ট স্বীকার করে, সে তো নিজের জন্যই কষ্ট স্বীকার করে। আল্লাহ্ বিশ্ববাসী থেকে বে-পরওয়া।[৭৮]

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

তোমরা বের হয়ে পড় স্বল্প বা প্রচুর সরঞ্জামের সাথে এবং জেহাদ কর আল্লাহ্‌র পথে নিজেদের মাল ও জান দিয়ে, এটি তোমাদের জন্যে অতি উত্তম, যদি তোমরা বুঝতে পার।[৭৯]

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

তারাই মুমিন, যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনার পর সন্দেহ পোষণ করে না এবং আল্লাহ্‌র পথে প্রাণ ও ধন-সম্পদ দ্বারা জেহাদ করে। তারাই সত্যনিষ্ঠ।[৮০]

---

৭৬ সূরা হজ, ৭৮
৭৭ সূরা তওবা ৮৬
৭৮ সূরা আনকাবুত, ৬
৭৯ সূরা তওবা, ৪১
৮০ সূরা হুজরাত, ১৫

www.amarboi.org

জিহাদ প্রসঙ্গে হাদিসে রাসূল (সা.)

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, জিহাদ সম্পর্কিত একটি দীর্ঘ হাদিসের শেষাংশে প্রিয় নবী করীম (সা.) বলেন, "সেই আল্লাহর শপথ যাঁর হাতে আমার জীবন, আমার মন তো চায় আল্লাহর পথে আমি শহীদ হই, আবার জীবিত হই, আবার শহীদ হই, আবার জীবিত হই এবং আবার শহীদ হই।"[৮১]

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, 'আমি আল্লাহর রাসূল (সা.) কে বলতে শুনেছি, দুই প্রকারের চক্ষুকে আগুন স্পর্শ করে না। প্রথমত সে চক্ষু যা আল্লাহর ভয়ে কাঁদে, দ্বিতীয়টি হলো সে চক্ষু যা শত্রুর প্রতীক্ষায় আল্লাহর পথে পাহারাদারি করে রাত কাটিয়েছে।' [৮২]

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, 'নবী কারীম (সা.) বলেছেন, সারা দুনিয়ার মানুষ আমার হয়ে যাওয়ার চেয়ে আল্লাহর রাস্তায় মৃত্যুবরণ করা আমার কাছে অধিক প্রিয়।'[৮৩]

হযরত রাশেদ বিন সা'দ জনৈক সাহাবী থেকে বর্ণনা করেছেন। কোনো এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (সা.)! কবরে সকল মুমিনের পরীক্ষা হবে, কিন্তু শহীদের হবে না, এর কারণ কী? হুজুর (সা.) জবাবে বলেন, তার মাথার ওপর তলোয়ার চমকানোই তার পরীক্ষার জন্য যথেষ্ট।' [৮৪]

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, 'রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, মওতের ছোঁয়া একজন শহীদের কাছে তেমন, যেমনটি তোমাকে কেউ চিমটি কাটলে অনুভব কর।' [৮৫]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, 'রাসূলে কারীম (সা.) বলেন, আমাদের মহান আল্লাহ সে ব্যক্তির ওপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট, যে আল্লাহর রাহে জিহাদ করে এবং তাঁর সঙ্গী-সাথীরা পরাজয় বরণ করলেও নিজ দায়িত্ব উপলব্ধি করে ফিরে দাঁড়ায় এবং আমৃত্যু লড়াই করে। তখন আল্লাহ ফেরেশতাদের উদ্দেশে বলেন, তোমরা আমার এ বান্দার দিকে লক্ষ্য কর, আমার পুরস্কারের আশায় এবং শাস্তির ভয়ে সে পুনরায় জিহাদে লিপ্ত হয়েছে

---

৮১ সহীহুল বুখারী, মুসলিম
৮২ তিরমিজি
৮৩ নাসায়ী
৮৪ তদেক
৮৫ তিরমিজি, নাসায়ী, দারেমী

www.amarboi.org

শেষ পর্যন্ত নিজের জান দিয়েছে। তোমরা সাক্ষী থাক, আমি তাকে মাফ করে দিলাম।' [৮৬]

আবু দাউদ শরীফে হযরত আবুল খায়ের বিন সাবেত বিন কয়েস বিন সাম্মাস তাঁর পিতা থেকে এবং তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণিত একটি হাদিস দেখা যায় আহলে কিতাবের বিরুদ্ধে জিহাদে নিহত হলে, নিহত মুসলমান দু'জন শহীদের সাওয়াব পাবে।

এ হাদিস থেকে প্রমাণিত হয় আহলে কিতাবদের সাথে জিহাদ করা অবশ্য কর্তব্য। জিহাদ কেবল মুশরিকদের বিরুদ্ধে নয়, বরং যারাই ইসলামের দুশমন তাদের সকলের বিরুদ্ধেই জিহাদ করতে হবে। আর আহলে কিতাবদের বিরুদ্ধে জিহাদ করলে আল্লাহর নিকট তাঁর জন্য দ্বিগুণ পুরস্কার থাকবে।

হযরত সহল বিন হানিফ থেকে বর্ণিত হয়েছে। 'রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি খালেস অন্তঃকরণে আল্লাহর কাছে শাহাদাতের বাসনা করে, সে ব্যক্তি বিছানায় মারা গেলেও আল্লাহ তাকে শহীদের মর্যাদা দেবেন।' [৮৭]

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, 'একজন সাহাবী কোনো এক স্থান অতিক্রম করছিলেন, সেখানে একটি নহর ছিল। তিনি নহরটি পছন্দ করলেন এবং মনে মনে চিন্তা করলেন, এ জায়গায় একাকী বসে ইবাদাত করলে কতই না ভাল হতো। তিনি তাঁর ইচ্ছা নবী কারীম (সা.) এর কাছে ব্যক্ত করলেন। হুজুর (রা.) বললেন, তা করবে না। তোমাদের পক্ষে ঘরে বসে সত্তর বছর নামাজে কাটানোর চেয়ে আল্লাহর পথে বের হওয়া অধিক উত্তম। তোমরা কি চাও না যে, আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করে দিন এবং বেহেশতের স্থান দান করুন। আল্লাহর পথে জিহাদ করা– যে ব্যক্তি কিছুক্ষণ সময়ের জন্য আল্লাহর পথে যুদ্ধ করেছে, তার জন্য জান্নাত অবধারিত।' [৮৮]

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেছেন, যাঁর হাতে আমার জীবন সে সর্বশক্তিমানের শপথ। যে ব্যক্তিই আল্লাহর পথে জখম হয়, আল্লাহ তাকে ভালভাবেই জানেন। কিয়ামতের দিন সে রক্তের রঙ ও মিশকের সুগন্ধি নিয়ে আগমন করবে।

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমার চাচা আনাস বিন নযর বদরের যুদ্ধে শরিক হতে পারেননি। রাসূলুল্লাহ (সা.) এর দরবারে তিনি আরজ

---

৮৬ আবু দাউদ

৮৭ মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিজি, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ

৮৮ তিরমিযী

www.amarboi.org

করেন- ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা.)! মুশরিকদের বিরুদ্ধে আপনার প্রথম যুদ্ধে আমি অনুপস্থিত ছিলাম। আল্লাহর শপথ, যদি আমাকে মুশরিকদের বিরুদ্ধে আসন্ন জিহাদে শরিক হওয়ার সুযোগ দেন, তাহলে আপনি দেখতে পাবেন, আমি কী করি। সুতরাং যখন ওহুদের যুদ্ধে মুসলমানরা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, তখন তিনি হঠাৎ চিৎকার করে বললেন, হে আল্লাহ! আমার সাথীরা যা কিছু করেছেন, আমি সে জন্য তোমার কাছে মাফ চাইছি এবং মুশরিকগণ যা কিছু করছে আমি তা থেকে পবিত্র। অতঃপর তিনি সামনে এগিয়ে যেতেই সাদ বিন মায়াজকে দেখলেন এবং চিৎকার করে উঠলেন, হে সাদ বিন মায়াজ। জান্নাত। জান্নাত। আমার প্রভুর শপথ। আমি তার খোশবু পাচ্ছি। ওহুদের দিক থেকেই আসছে। হযরত সাদ আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল, তিনি না করলেন তা আমি পারলাম না। হযরত আনাস (রা.) বলেন, পরে আমরা তাঁর শরীরে তলোয়ার, তীর ও বল্লমের আশিটি আঘাত দেখেছি। আমরা তাকে শহীদ অবস্থায় পেয়েছি। মুশরিকরা তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে ফেলেছিল, এ জন্য কেউ তাঁকে চিনতে পারেনি। তাঁর বোন আঙুল দেখে তাকে চিনেছেন। হযরত আনাস (রা.) বলেন, আমরা মনে করতাম এদের মত লোকদের জন্যই "এরূপ কত মুমিন রয়েছেন যাঁরা আল্লাহর সাথে ওয়াদা পূরণ করেছেন" এ আয়াতটি নাজিল করেছেন।

হযরত উম্মে হারেসা বিনতে সারাকা থেকে বর্ণিত, "তিনি হুজুর (সা.) এর দরবারে এসে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি কি হারেসা সম্পর্কে কিছু বলবেন না? জঙ্গে বদরের পূর্বে একটি অজ্ঞাত তীর এসে তাঁর শরীরে বিঁধে যায় এবং তিনি শহীদ হন। যদি তিনি জান্নাতবাসী হয়ে থাকেন তাহলে আমি সবর করবো, অন্যথায় প্রাণ ভরে কাঁদব। হুজুর (সা.) জবাব দিলেন, হারেসার মা। বেহেশতে তো অনেক বেহেশতবাসীই রয়েছেন তোমার ছেলে তো সেরা ফেরদাউসে রয়েছেন।"[৮৯]

চিন্তা করে দেখুন জান্নাতের চিন্তা কিভাবে তাঁদেরকে প্রাণপ্রিয় পুত্রের শোক পর্যন্ত ভুলিয়ে দেয়।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, 'রাসূল (সা.) বলেন, আমি কি তোমাদেরকে ভাল লোক আর কে মন্দ লোক তা জানিয়ে দেবো না? সে ব্যক্তি ভাল লোকদের মধ্যে অন্যতম যে ব্যক্তি ঘোড়া বা উটে সওয়ার হয়ে বা পায়ে হেঁটে সকল অবস্থাতেই মৃত্যু পর্যন্ত আল্লাহর রাহে কর্মতৎপর থাকে। অপর দিকে সে ব্যক্তি মন্দ লোকদের অন্যতম, যে আল্লাহর কিতাব তেলাওয়াত করে অথচ তা থেকে কোনো নসিহত কবুল করে না।"[৯০]

---

৮৯ সহীহুল বুখারী
৯০ নাসায়ী

www.amarboi.org

হযরত মিকদাদ বিন মাদকারব থেকে বর্ণিত, 'রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, আল্লাহর নিকট শহীদের ছয়টি বৈশিষ্ট্য। প্রথম আক্রমণেই তাকে মাগফিরাত করা হয়, দুনিয়ায় থাকাকালীন অবস্থাতেই তাকে বেহেশতের ঠিকানা জানিয়ে দেয়া হয়, কবর আজাব থেকে তার নাজাত হয়, কিয়ামতের ভয়াবহ আতঙ্ক থেকে সে নিরাপদ থাকবে, তাকে ইয়াকুত খচিত একটি সম্মানিত টুপি পরিধান করানো হবে, যা সারা দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু রয়েছে তার চেয়েও মূল্যবান হবে, মৃগ-নয়না হুরেরা তার স্ত্রী হবে এবং সে সত্তর জন আত্মীয়ের জন্য শাফায়াত করবে।'[৯১]

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে। 'রাসূল (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি জিহাদের চিন্তা ব্যতিরেকে আল্লাহর সাথে দেখা করবে তার সে সাক্ষাৎ ত্রুটিপূর্ণ হবে।'[৯২]

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, 'রাসূলে কারীম (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি খুলুছিয়াতের সাথে শাহাদাত কামনা করে, শহীদ না হলেও তাকে শহীদের মর্যাদা দেয়া হবে।' [৯৩]

হযরত ওসমান বিন আফফান (রা.) থেকে বর্ণিত, 'রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাহে একরাতও কোনো ঘাঁটি পাহারা দেয়,তার জন্য তার হাজার রাতের নামাজের সমান (সওয়াব) হবে।' [৯৪]

হযরত আবু দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত, 'নবী করীম (সা.) বলেছেন, একটি নৌযুদ্ধ দশটি স্থলযুদ্ধের সমান এবং যে নদীতে পড়ে গেল, সে যেন আল্লাহর খুনে সিক্ত হয়ে গোসল করে উঠলো।'[৯৫]

হযরত জাবির বিন আবদুল্লাহ (রা.) বলেন, 'জঙ্গে ওহুদের দিন আবদুল্লাহ বিন আমর বিন হিশাম শহীদ হলে পর তাঁর ছেলে জাবিরকে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন যে, আল্লাহ জাবিরের পিতার সাথে একেবারে মুখোমুখি কথা বলেছেন। এ হাদিসের শেষাংশে বলা হয়েছে, আবদুল্লাহ বিন আমরের প্রার্থনা অনুযায়ী আল্লাহ এ আয়াত নাজিল করেন, 'যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছেন তাদের তোমরা মৃত মনে করো না।'

---

৯১ তিরমিজি, ইবনে মাজাহ
৯২ তদেক
৯৩ মুসলিম
৯৪ ইবনে মাজাহ
৯৫ তদেক

www.amarboi.org

হযরত আনাস (রা.) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, 'নবী করীম (সা.) বলেছেন, আল্লাহর পথে কোনো জিহাদকারীকে বিদায় দেয়ার উদ্দেশ্যে সকাল বিকেল, কিছু দূর অগ্রসর হওয়া এবং তাকে সওয়ারির পিঠে আরোহণে সাহায্য করা, আমার কাছে দুনিয়া ও তার মধ্যে যা কিছু রয়েছে, তার সব কিছু থেকে প্রিয়।' [৯৬]

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেন, আল্লাহর মেহমান তো কেবল তিনজন, গাজী, হাজী ও ওমরা সম্পাদনকারী।'[৯৭]

হযরত আবু দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত, 'রাসূলে কারীম (সা.) বলেন, শহীদ তার বংশের সত্তর ব্যক্তির জন্য শাফায়াত করবে।'[৯৮] (আবু দাউদ)

হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, 'রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, তোমরা যখন ধারে বেচা-কেনা করবে, গাভীর লেজ ধরে থাকবে, চাষাবাদে লেগে যাবে এবং জিহাদ পরিত্যাগ করবে, আল্লাহ তখন তোমাদের ওপর অপমান চাপিয়ে দেবেন এবং তা তোমরা হাঁটতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমরা নিজের দ্বীনের দিকে প্রত্যাবর্তন করো।'[৯৯]

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, 'রাসূলুল্লাহ (সা.) সাহাবীগণসহ মুশরিকদের কাছে যখন পৌঁছে গেল তাখন হুজুর (সা.) ইরশাদ করলেন, অগ্রসর হও, সেই জান্নাতের দিকে যা সমস্ত আকাশ ও পৃথিবীর সমান প্রশস্ত। হযরত ওমায়ের বিন হাম্মামের মুখ থেকে নির্গত হলো, হ্যাঁ, হ্যাঁ। রাসূল (সা.) জিজ্ঞেস করলেন, হ্যাঁ হ্যাঁ কেন, তিনি উত্তরে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, কসম খেয়ে বলছি আমি জান্নাতবাসী হতে চাই, এ জন্যই হ্যাঁ হ্যাঁ বলেছি। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, সে সময় তিনি থলি থেকে কিছু খেজুর নিয়ে খেতে খেতে বললেন, আমি যদি এ খেজুর শেষ করা পর্যন্ত বেঁচে থাকি তাই হবে আমার জন্য দীর্ঘ জীবন। সুতরাং তাঁর কাছে যত খেজুর ছিল মাটিতে ফেলে দিয়ে লড়াই শুরু করলেন এবং শেষ পর্যন্ত তিনি শাহাদাত বরণ করলেন।' [১০০]

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, 'নবী করীম (সা.) এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি মরে গেল, অথচ সে জিহাদ করেনি বা তার মনে জিহাদের জন্য কোনো চিন্তা, সঙ্কল্প বা ইচ্ছাও দেখা যায়নি তবে সে মুনাফিকের ন্যায় মারা গেল।'[১০১]

---

৯৬ তদেক
৯৭ মুসলিম
৯৮ আবু দাউদ
৯৯ আহমদ, আবু দাউদ, হাকেম
১০০ মুসলিম
১০১ মুসলিম, আবু দাউদ

www.amarboi.org

হযরত আবু ইমরানের বর্ণনা অনুযায়ী মুসলমানরা যখন রোম শহরে ছিলেন তখন বিরাট এক রোমক বাহিনী মুসলমানদের আক্রমণ করে। মুসলমান ও রোমকদের মধ্যে লড়াই শুরু হয়ে যায়। এ যুদ্ধের বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি হযরত আবু আইয়ুব আনসারীর এক প্রেরণাদায়ক ঐতিহাসিক ভাষণের কথা উল্লেখ করলেন, যুদ্ধরত হযরত আবু আইয়ুব আনসারী বলেন, তোমরা নিজদেরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিও না।' কুরআনে করীমের এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে নিজের সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের পেছনে সমস্ত সময় ব্যয় করা, এ কাজে নিয়োজিত থাকা এবং জিহাদ পরিত্যাগ করা। আবু আইয়ুব আনসারী আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে মৃত্যু পর্যন্ত দৃঢ় থাকেন এবং রোমেই তাঁর দাফন হয়।'[১০২]

এখানে লক্ষ্য করার বিষয়, এ সময় হযরত আইয়ুব আনসারী বার্ধক্যের দ্বার অতিক্রম করছিলেন। অথচ তিনি জীবনের শেষ প্রান্তে দ্বার অতিক্রম করছিলেন অথচ তিনি জীবনের শেষ প্রান্তে এসেও এ যুদ্ধের সময় দ্বীনের বিজয় ও ইসলামের গৌরবের জন্য অস্থির হয়ে উঠেছিলেন এবং যৌবনের আবেগ-উচ্ছ্বাসে উদ্বেলিত হয়েছিলেন।

জিহাদ থেকে বিরত থাকার পরিণাম

আল্লাহর পথে জিহাদ আল্লাহর দেয়া জীবনবিধান ইসলাম প্রচার ও আল্লাহর বাণী বিজয়ী হওয়ার একমাত্র মাধ্যম, মুসলিম উম্মতের অস্তিত্ব ঈমানের দাবি পূরণ ও ইসলামী জাতির শৌর্য ও বীর্যের পথ। জিহাদ হলো নির্যাতিত নিপীড়িত মযলুম দুর্বল মানবতার মুক্তির পথ, তেমনি জিহাদ থেকে বিরত থাকা, পরিত্যাগ করা, এ ব্যাপারে অলসতা করা, যথাযথ গুরুত্বসহকারে অন্যান্য সকল কাজ থেকে জিহাদের কাজকে অগ্রাধিকার না দেয়া যাবতীয় কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হওয়া, সুস্থ মানবসমাজের ধ্বংস হওয়া উন্নত মর্যাদার ও সাধারণ প্রশান্তির যাবতীয় বিষয়ে চরম ক্ষতির কারণ। এ জন্যই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ইসলামের এ রুকন সমতুল্য মহান ফরয কর্তব্য পালনে অবহেলা ও অলসতাকারীদের বিরুদ্ধে চরম শাস্তির ওয়াদা করেছেন ও হুমকি দিয়েছেন। বিনা ওজরে যে জিহাদ থেকে বিরত থাকে ও বসে থাকে এমনি অলস ব্যক্তিকে বীভৎস কাপুরুষ বলে অভিহিত করেছেন, তার জন্য কুৎসিত অপমানজনক শাস্তি ও লজ্জাজনক লাঞ্ছনা দুনিয়ায় ও আখেরাতে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির ওয়াদা করেছেন।

এমনিভাবে জিহাদের ময়দান থেকে পিঠটান দিয়ে ফিরে যাওয়া ও ভেগে পালিয়ে যাওয়াকে চরম ভীরুতা এবং অমার্জনীয় অপরাধ বলে গণ্য করেছেন। এটাকে

---

১০২ তিরমিজি

www.amarboi.org

ধ্বংসাত্মক কবিরা গুনাহসমূহের মধ্যে সাব্যস্ত করে তার ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে। জিহাদের ময়দান থেকে পালানো মানুষকে চরম ধ্বংস ও দুর্ভাগ্যের দিকে ঠেলে দেয়, আল্লাহর গজব ও অসন্তুষ্টির দিকে ধাবিত করে, এর কারণে লজ্জাজনক অবস্থায় ইসলামী সেনাবাহিনীর মাঝে হতাশা ও দুর্বলতা দেখা দেয়, ভীতি ও ওয়াসওয়াসা সৃষ্টি করে, যার কারণে অবশেষে তারা চরম অপমানের সাথে পরাজিত হয়। এ জন্যই আল্লাহতা'আলা মু'মিনদেরকে জিহাদে উৎসাহিত করে দুর্বলতা পরিত্যাগ করে এগিয়ে যাওয়ার জন্য তাগিদ দিয়ে বলেন, যে, জিহাদ থেকে বিরত থাকার পরিণাম চরম শাস্তি। তিনি বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا

مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

"হে মু'মিনগণ! তোমাদের কী হলো যে, যখন তোমাদেরকে আল্লাহর পথে অভিযানে বের হতে বলা হয় তখন তোমরা ভারাক্রান্ত হয়ে ভূতলে ঝুঁকে পড়ো? তোমরা কি পরকালের পরিবর্তে পার্থিব জীবনে পরিতুষ্ট হয়েছো? পরকালের তুলনায় পার্থিব জীবনের ভোগের উপকরণ তো অকিঞ্চিৎকর। যদি তোমরা অভিযানে বের না হও, তবে তিনি তোমাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তি দেবেন এবং অপর জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন এবং তোমরা তাঁর কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।'[১০৩]

জিহাদের ময়দানে দৃঢ়তার সাথে সক্রিয় না থাকলে আল্লাহর অসন্তুষ্টি ও জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হবে বলে তিনি হুঁশিয়ার করে বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

'হে মু'মিনগণ! তোমরা যখন কাফির বাহিনীর সম্মুখীন হবে তখন তোমরা তাদেরকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না। সেদিন যুদ্ধ কৌশল অবলম্বন কিংবা দলে স্থান লওয়া ছাড়া কেউ তাদেরকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলে সে তো আল্লাহর বিরাগভাজন হবে এবং তার আশ্রয় জাহান্নাম আর তা কত নিকৃষ্ট।' [১০৪]

---

১০৩ সূরা তওবা, ৩৮-৩৯

১০৪ সূরা আনফাল, ১৫-১৬

www.amarboi.org

জিহাদের ময়দানে নিষ্ক্রিয় ও বিরত থাকায় যুলুম নির্যাতনের শাস্তি ভোগের অংশীদার হতে হবে তাই জিহাদ থেকে বিরত ও নিষ্ক্রিয় থাকার পরিণাম সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.) কঠিন শাস্তির কথা বলেছেন।

'হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলে কারীম (সা.) বলেছন, যদি তোমরা হালাল-হারাম নির্বিচারে পারস্পরিক বেচা-কেনা করো, গরুর লেজ ধরে থাকো, চাষাবাদের কাজ নিয়েই মশগুল হয়ে যাও, আর জিহাদ পরিত্যাগ করো, তাহলে আল্লাহ তোমাদের ওপর অপমান, লাঞ্ছনা, চাপিয়ে দেবেন এবং তোমরা যতক্ষণ তোমাদের দীনের দিকে প্রত্যাবর্তন না করবে ততক্ষণ তিনি তা তোমাদের ওপর থেকে সরিয়ে দেবেন না।' আবু দাউদ, কিতাবুল ফুরু, খ. ২, পৃ. ৪৯০।

জিহাদ থেকে বিমুখ ও বিরত ব্যক্তি অন্যান্য হাজার সওয়াবের অধিকারী হলেও তাকে রাসূলুল্লাহ (সা.) নেফাকের পর্যায়ে সাব্যস্ত করে বলেছেন,

'যে ব্যক্তি মারা গেল অথচ তার জীবনে সে জিহাদ করেনি অথবা জিহাদের ব্যাপারে মনে মনে কোনো আশাও পোষণ করেনি তার মৃত্যু হলো নেফাকের একটা বিভাগে।' সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ইমরাত, অর্থাৎ জিহাদ থেকে বিরত থাকা মুনাফিকের আলামত।

জিহাদ থেকে বিরত থাকলে কিয়ামতের পূর্বেই শাস্তি

জিহাদ থেকে বিরত থাকা ব্যক্তি কিয়ামতের পূর্বেই শাস্তি ভোগ করবে। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন 'যে ব্যক্তি জিহাদ করলো না, কোনো জিহাদের রশদ সরবরাহ করলো না, কোনো মুজাহিদের পরিবারকে সাহায্য সহযোগিতাও করলো না, আল্লাহ তায়ালা তাকে দুনিয়ার জীবনেই এর চরম শাস্তি দেবেন।'[১০৫]

এমনিভাবে জিহাদ পরিত্যাগকারী জাতিকেও আল্লাহ সাধারণভাবে চরম শাস্তি দেবেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন,

'যখন কোনো জাতি জিহাদকে পরিত্যাগ করে অবশ্যই আল্লাহ তাদের ওপর আযাবকে ব্যাপক করে দেন।' আত তাবারানী এর বরাতে, আবদুল বাকী রমাদুন, আল জিহাদু সাবীলুনা, পৃ. ৭৩।

জিহাদ পরিত্যাগ করা চরম ধ্বংসাত্মক সাতটি কবিরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত, যা থেকে মুক্ত থাকার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা.) বিশেষভাবে সতর্ক করেছেন। যারা জিহাদ থেকে পশ্চাৎপদ হয় তাদের সম্পর্কে তিনি বলেন :

---

১০৫ সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুল জিহাদ

www.amarboi.org

'তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক পাপ হতে বিরত থাকবে। আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করা, জাদু করা, শরীয়তের অনুমোদন ব্যতিরেকে কাউকে হত্যা করা, ইয়াতিমের মাল আত্মসাৎ করা, যুদ্ধের দিন (যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে) পলায়ন এবং গাফেল, পবিত্র ঈমানদার মহিলার বিরুদ্ধে ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ দেয়া।' [১০৬]

কুফর ও ইসলামের চূড়ান্ত দ্বন্দ্ব ও সংগ্রামের পর্যায়ে আল্লাহর পথে জিহাদী কাজকে অগ্রাধিকার না দেয়া, তা থেকে দূরে সরে থাকা যে কত বড় ফিতনা, তা দেখতে পাই তাবুকের যুদ্ধে দুর্বলমনা মু'মিনদের আচরণ থেকে, যেসব মুনাফিক মিথ্যা বাহানা করে জিহাদ থেকে পেছনে থেকে যাওয়ার প্রার্থনা করেছিল তাদের মধ্যে এমন কিছু বেপরোয়া লোকও ছিল যারা জিহাদের পথ হতে ফিরে থাকার জন্য নানা ধর্মীয় ও নৈতিক ধরনের টালবাহানা করেছিল। তাদের মধ্যে এক ব্যক্তি ছিল 'জাদ্দ ইবনে কাইস'। তার সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, সে নবী করীম (সা.) এর খেদমতে হাজির হয়ে আরজ করলো, 'আমি একজন রূপপ্রেমিক ব্যক্তি, আমার লোকজন আমার এ দুর্বলতা ভালো করেই জানে যে, নারীদের ব্যাপারে আমার ধৈর্যধারণ করা সম্ভব নয়। আমার ভয় হয় রোমান মহিলাদেরকে দেখায় আমার পদস্খলন হয়ে না যায়। কাজেই আপনি আমাকে ফিতনায় ফেলবেন না। আর এ জিহাদে শরিক হওয়ার দায়িত্ব হতে আমাকে রেহাই দিন। আমাকে মা'জুর মনে করুন। অতঃপর এ আয়াত নাযিল হয়।

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ

'এবং তাদের মধ্যে এমন লোকও আছে যে বলে, আমাকে অব্যাহতি দিন এবং আমাকে ফিতনায় ফেলবেন না। সাবধান! তারাই ফিতনাতে পড়ে আছে। জাহান্নাম তো কাফিরদেরকে বেষ্টন করেই আছে।' [১০৭]

আল্লাহর পথে জিহাদের কষ্ট থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য যারা তা করা থেকে বিরত থেকে পরস্পর খুশি প্রকাশ করেছে তাদের সম্পর্কে কুরআন মজিদে নাযিল হয়েছে :

فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ

'যারা পশ্চাতে থেকে গেলো তারা রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে বসে থাকতেই আনন্দ লাভ করলো এবং তাদের ধনসম্পদ ও জীবনের দ্বারা আল্লাহর পথে

---

১০৬ সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, খ. পৃ. ৬৪

১০৭ সূরা তওবা, ৪৯

www.amarboi.org

জিহাদ করা অপছন্দ করলো। তারা বললো, গরমে অভিযানে বের হয়ো না বলো, উত্তাপে জাহান্নামের আগুন প্রচণ্ডতম, যদি তারা বুঝতো।[১০৮]

এখানে ঈমানের পরীক্ষাস্বরূপ আল্লাহর দীনের বিজয়ের কাজে সক্রিয় না হয়ে জিহাদের কঠিন বিপজ্জনক তৎপরতায় জড়িত না হয়ে বিভিন্ন ওজর পেশ করে 'মসজিদের দিরার' তৈরি করে যারা পশ্চাৎপসারণ করেছে তাদের পরিণামও ভয়বাহ জাহান্নাম বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এ পর্যায়ে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) মদিনায় হিজরতের পূর্বে খাযরাজ বংশের আবু আমের নামে এক খ্রিষ্টান পাদ্রি ছিলো। তার দরবেশীর খ্যাতি মদিনার পাশের জাহেল আরবদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু তার দরবেশী তার মধ্যে সততা ও সত্যানুসন্ধিৎসা জাগাতে পারেনি। নবী করীম (সা.) এর আগমনের পর তাকে স্বীয় প্রাধান্যের প্রতিদ্বন্দ্বী এবং তার দরবেশী কাজের দুশমন মনে করে নবী করীম (সা.) এর বিরোধিতা করার জন্য উঠে পড়ে লেগে গেল। বদর, উহুদ, খন্দক, হুদাইবিয়া ও হুনাইন পর্যন্ত যত জিহাদ সংঘটিত হয়েছে সবগুলোর মধ্যেই এ দরবেশ আবু আমেরের সক্রিয় দুশমনি ছিল। এ সকল তৎপরতায় মদিনার দুর্বল মু'মিনদের (মোনাফেক) একটি দল সর্বদাই তার সাথী হিসেবে পেয়েছিলো। তারই প্রস্তাবে মদিনায় তারা নিজেদের একটি স্বতন্ত্র মসজিদ তৈরি করে। মুসলমানদের থেকে বিছিন্ন ও স্বতন্ত্রভাবে মোনাফেকদের সংঘবদ্ধ করার জন্য তা তৈরি হলে নবী করীম (সা.) তাবুক থেকে ফেরার পথে মদিনার নিকটবর্তী 'যি আওয়ান' নামক স্থানে নাযিল হলো :

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ

'এবং যারা মসজিদ নির্মাণ করেছে ক্ষতি সাধন, কুফরী ও মু'মিনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এবং ইতঃপূর্বে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যে ব্যক্তি যুদ্ধ করেছে তার গোপন ঘাঁটিস্বরূপ ব্যবহারের উদ্দেশ্যে তারা অবশ্যই শপথ করবে : আমরা সদুদ্দেশ্যেই তা করেছি। আল্লাহ সাক্ষী, তারা তো মিথ্যাবাদী।' [১০৯]

এ স্বতন্ত্র মসজিদ নির্মাণের পূর্বে তার প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট লোকেরা নবী করীম (সা.) এর দরবারে এসে বললো, বৃষ্টি ও শীতের রাতে সাধারণ লোক ও দুর্বল অক্ষম ব্যক্তিদের পক্ষে বিশেষত দূরবর্তী লোকদের পক্ষে

---

১০৮ সূরা তওবা, ৮১
১০৯ সূরা তওবা, ১০৭

www.amarboi.org

মসজিদে নব্বীতে যাতায়াত করা বড়ই মুশকিল হয়ে পড়েছে। এ কারণে নামাযের সহজতার জন্য আমরা একটি মসজিদ নির্মাণের ইচ্ছা করেছি। এ মসজিদ নির্মাণের পর রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, এখন তো আমি যুদ্ধ প্রস্তুতিতে ব্যস্ত আছি। যুদ্ধ হতে ফেরার পর দেখা যাবে। অতঃপর নবী করীম (সা.) তাবুক যুদ্ধে যাত্রা করেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে এ লোকেরা এ মসজিদকে কেন্দ্র করে নিজেদের সংঘবদ্ধ করা ও নানা প্রকার ষড়যন্ত্র করার কাজে ব্যস্ত হয়ে থাকলো। এমনকি তারা সিদ্ধান্ত করে বসেলো যে, ঐ দিকে রোমানদের হাতে মুসলমানদের পরাজয় ও মূলোৎপাটন হলেই এদিকে আবদুল্লাহ ইবনে উবাইর মাথায় বাদশাহীর মুকুট পরিয়ে দেয়া হবে। তাবুক থেকে ফেরার পথে উল্লিখিত আয়াত নাযিল হলে নবী করীম (সা.) তখনই কয়েকজন লোককে মদিনায় পাঠিয়ে দিলেন। তিনি নির্দেশ দিলেন যে, তার মদিনার প্রবেশের পূর্বেই যেন তারা এ 'দিরার' মসজিদটিকে ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়।

আল্লাহর জমিনে আল্লাহর সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে তাঁর হুকুমত কার্যকরী রাখার সাধনা না করা আল্লাহদ্রোহী শক্তির বিরুদ্ধে সর্বদা জিহাদে লিপ্ত থেকে পথভোলা মানুষকে সিরাতুল মুস্তাকিমের পথ দেখানো সংগ্রামে ব্যস্ত না থাকা, মুসলিম উম্মাহর জন্য চরম ধ্বংস ও বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ইসলামী নেতৃত্বের ব্যবস্থাপনা ছাড়াই যে কোনো কার্যক্রম অনৈক্য ও বিদ্রোহের শামিল। আপাত দৃষ্টিতে নির্দোষ কার্যক্রম দ্বারা যারা জিহাদবিমুখ তৎপরতায় ব্যস্ত থাকে তারা আর যাই করুক প্রকারান্তরে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধেই অবস্থান নেয়। ইসলামী জীবনব্যবস্থার জীবনীশক্তিই হলো আল্লাহর পথে জিহাদ, আল্লাহদ্রোহী লোকদের বিরুদ্ধে এ জিহাদ থেকে বিরত থাকায় আল্লাহর ভয়াবহ আজাব নাযিল হয়, আল্লাহদ্রোহী পাপী লোকদের শাসন কায়েম হয়, তখন তা থেকে নাজাতের জন্য দোয়াও কবুল হয় না। হাদিসে এসেছে :

'হযরত হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, অবশ্যই তোমরা সৎ কাজের নির্দেশ দেবে, আর অসৎ কাজ হতে লোকদের বিরত রাখবে আর কল্যাণকর দীনি কাজে উৎসাহিত করবে। অন্যথায় এক সামগ্রিক আজাবের মাধ্যমে আল্লাহ তোমাদেরকে ধ্বংস করে দেবেন অথবা তোমাদের সবচেয়ে নিকৃষ্ট পাপী লোকদেরকে তোমাদের ওপর শাসক নিযুক্ত করবেন। অতঃপর তোমাদের নেককার লোকেরা পাপী লোকদের অত্যাচার থেকে নাজাতের জন্য দোয়া করতে থাকবে কিন্তু তাদের দোয়া কবুল হবে না।

www.amarboi.org

ইসলামী বিধান প্রতিষ্ঠা ও অনৈসলামিক কাজের প্রতিরোধের সংগ্রামে বিরত থাকা ব্যাপকভিত্তিক আসমানী আজাব, যেমন বন্যা, মহামারী, দুর্ভিক্ষ ও দেশে গৃহযুদ্ধ আপতিত হয়। দ্বিতীয়ত, অত্যাচারী শাসক, সমাজের সবচেয়ে নিকৃষ্ট ও পাপী লোকদেরকে শাসক নিয়োগ করে দেয়া হয়। তাদের যুলুম নিষ্পেষণে গোটা জাতিই ধুঁকে ধুঁকে মরতে থাকে। আর এ চরমাবস্থা থেকে মুক্তির জন্য সমাজের নেককার লোকদের দোয়াও কবুল হয় না। আর যখনই তারা সংঘবদ্ধভাবে সংগঠিত হয়ে পরিকল্পনা মোতাবেক আল্লাহর দীন কায়েমের সংগ্রামে নিয়োজিত হয়ে নিজের জান ও মাল সোপর্দ করে দেয় তখনই গোটা জাতি ও উম্মতে মুসলিমার মুক্তির জন্য আল্লাহ তায়ালা আসমান থেকে তাঁর ফেরেশতা পাঠিয়ে আল্লাহর দীন বিজয়ী আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করার ব্যবস্থা করেন, প্রতিষ্ঠিত করেন সর্বত্র পরম শান্তি।

www.amarboi.org

জিহাদ সহনশীলতা ও পরমতসহিষ্ণুতা

ইসলাম জিহাদের নির্দেশের সাথে তার সুনির্দিষ্ট নীতিমালাও ঠিক করে দিয়েছে। যে মহান মাবুদের সন্তুষ্টির জন্য জিহাদের বাধ্যবাধকতা তাঁরই নারাজি থেকে বাঁচতে জিহাদের নীতিমালার অনুসরণের বাধ্যবাধকতার দিকটি খুব কঠোরভাবে আলোচনা করা হয়েছে। ফলে নিঃস্বার্থ ও নির্লোভ এই যুদ্ধে প্রতিপক্ষের প্রতি সহানুভূতি, উদারতা, শত্রুকে ইসলামের পতাকাতলে টানার ঐতিহাসিক দৃষ্টান্তটি সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

চূড়ান্ত ও স্থায়ী শান্তির ধর্ম হিসেবে ইসলামের স্বপক্ষে যে দাবি প্রচলিত রয়েছে পশ্চিমা পর্যবেক্ষকগণ প্রায়শই এই দাবিকে অসত্য মনে করছে।

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

দ্বীনের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি বা বাধ্যবাধকতা নেই। নিঃসন্দেহে হেদায়াত গোমরাহি থেকে পৃথক হয়ে গেছে। এখন যারা গোমরাহকারী তাগুতদেরকে মানবে না এবং আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস স্থাপন করবে, সে ধারণা করে নিয়েছে সুদৃঢ় হাতল যা ভাবার নয়। আর আল্লাহ্ সবই শুনেন এবং জানেন।[১১০]

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

যদি আল্লাহ্ চাইতেন, তবে তোমাদের সবাইকে এক উম্মত করে দিতেন, কিন্তু এরূপ করেননি-যাতে তোমাদেরকে যে ধর্ম দিয়েছেন, তাতে তোমাদের পরীক্ষা নেন। অতএব, দৌড়ে কল্যাণকর বিষয়াদি অর্জন কর। তোমাদের সবাইকে আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। অতঃপর তিনি অবহিত করবেন সে বিষয়, যাতে তোমরা মতবিরোধ করতে।[১১১]

وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ

বলুন, সত্য তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে আগত। অতএব, যার ইচ্ছা, বিশ্বাস স্থাপন করুক এবং যার ইচ্ছা অমান্য করুক।[১১২]

---

১১০ সূরা বাকারা, ২৫৬
১১১ সূরা মায়েদা , ৪৮
১১২ সূরা কাহাফ, ২৯

www.amarboi.org

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ

বলে দাও, হে মানবকুল, সত্য তোমাদের কাছে পৌঁছে গেছে তোমাদের পরওয়ারদেগারের তরফ থেকে। এমন যে কেউ পথে আসে সে পথ প্রাপ্ত হয় স্বীয় মঙ্গলের জন্য। আর যে বিভ্রান্ত ঘুরতে থাকে, সে স্বীয় অমঙ্গলের জন্য বিভ্রান্ত অবস্থায় ঘুরতে থাকবে। অনন্তর আমি তোমাদের ওপর অধিকারী নই।[১১৩]

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

আর তোমার পরওয়ারদেগার যদি চাইতেন, তবে পৃথিবীর বুকে যারা রয়েছে, তাদের সবাই ঈমান নিয়ে আসত সমবেতভাবে। তুমি কি মানুষের ওপর জবরদস্তি করবে ঈমান আনার জন্য?[১১৪]

فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ

যদি তারা তোমার সাথে বিতর্কে অবতীর্ণ হয় তবে বলে দাও, আমি এবং আমার অনুসরণকারীগণ আল্লাহ্‌র প্রতি আত্মসমর্পণ করেছি। আর আহলে কিতাবদের এবং নিরক্ষরদের বলে দাও যে, তোমরাও কি আত্মসমর্পণ করেছ? তখন যদি তারা আত্মসমর্পণ করেছি। আর আহলে কিতাবদের এবং নিরক্ষরদের বলে দাও যে, তোমরাও কি আত্মসমর্পণ করেছ? তখন যদি তারা আত্মসমর্পণ করে, তবে সরল পথ প্রাপ্ত হলো, আর যদি মুখ ঘুরিয়ে নেয়, তাহলে তোমার দায়িত্ব হলো শুধু পৌঁছে দেয়া। আর আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে রয়েছে সকল বান্দা।[১১৫]

শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই জিহাদ

আসলে ইসলাম শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই সদাসর্বদা জিহাদের জন্য তৈরি ও প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দিয়েছে। জুলুম, না-ইনসাফি, অন্যায়, অনাচার, ব্যভিচারের সয়লাব সৃষ্টি করার জন্য বা প্রবৃত্তির হীনচাহিদা পূরণ অথবা স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলা জিহাদ ফরজ করেনি, এ কথা আমাদের মনে রাখা দরকার। আল্লাহ জিহাদ ফরজ করেছেন ইসলামের প্রচার, প্রসার ও

---

১১৩ সূরা ইউনুস, ১০৮
১১৪ তদেক, ৯৯
১১৫ সূরা আল ইমরান, ২০

www.amarboi.org

আন্দোলনের কাজ যাতে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা যায়, শান্তি ও নিরাপত্তা কায়েম হয় এবং ন্যায় ও সততা প্রতিষ্ঠিত থাকে। কারণ একমাত্র এ পথেই মুসলমানগণ তাদের ওপর অর্পিত মহান দায়িত্ব পালন করতে পারে। তা ছাড়া এ-ও লক্ষ্য করার বিষয় জিহাদ ও কিতালের সাথে সাথে ইসলাম সন্ধিও করতে আগ্রহী হয়।

মুসলমান যুদ্ধের ময়দানে যায় শুধু একটি বাসনা নিয়ে। আর তাহলো আল্লাহর কালেমা বুলন্দ হোক, তা ছড়িয়ে পড়ুক সবখানে। মান-ইজ্জত, ধন দৌলত, ভোগ-ঐশ্বর্য, মালে গনিমতের খেয়াল বা জুলুম অবিচারের চেষ্টা এর কোনোটাই মুসলমানের কামনা থাকতে পারে না, যদি সত্যিকারে মুজাহিদ সে হয়। এ ক্ষেত্রে তার শুধুমাত্র একটি জিনিসই হালাল তা হচ্ছে, আল্লাহর রাস্তায় তার শির লুটিয়ে দেয়া এবং তাঁর সৃষ্টির হেদায়াতের জন্য আকুল আগ্রহ পোষণ করা।[১১৬]

প্রাচীনপন্থী ফকিহগণ সশস্ত্র যুদ্ধকে বুঝাতে জিহাদ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। যুদ্ধ বলতে জিহাদকে বুঝানো হলেও কুরআনে ব্যবহৃত জিহাদ শব্দটি ব্যাপকতর অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। মক্কী সূরাতে (২৯ : ৬, ৬৯) এবং (২৫ : ৫২)-এ সর্বপ্রথম মুসলমানদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হয় এবং পূর্বে জিহাদ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। মক্কী যুগে আল্লাহর পথে শান্তিপূর্ণ অর্থে জিহাদ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

যারা আমার উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করে আমি তাদেরকে অবশ্যই আমার পথে পরিচালিত করব। (২৬ : ৬৯);

যে কেউ সাধনা করে, সে তো নিজের জন্যই সাধনা করে.... (২৯ : ৬); সুতরাং বিধর্মীদের কথায় কর্ণপাত কর না। বরং তাদের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি দিয়ে জিহাদ কর (২৫ : ৫২)

এই তিনটি আয়াতে মুসলমানদেরকে শত নির্যাতনের বিরুদ্ধে ধৈর্যের সাথে মোকাবেলা করতে বলা হয়েছে।[১১৭]

হযরত হারিস বিন মুসলিম বিন হারিস বর্ণনা করেন, 'আমার পিতা আমাকে বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে একটি মুজাহিদ বাহিনীর সাথে জিহাদে পাঠান। দুশমনের আক্রমণ করার স্থানে পৌঁছেই আমি ঘোড়ার লাগাম টেনে সাথীদের পেছনে ফেলে সামনে গিয়ে উপস্থিত হলাম। গোত্রের লোকজন তখন আমার কাছে অনুনয় বিনয় শুরু করে। আমি তাদের উদ্দেশ্যে বললাম, 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ বল, শান্তি পেয়ে যাবে। তারা তাই করলো। এতে আমার

---

১১৬ সাইয়েদ কুতুব,
১১৭ লুই এম সাফী, ইসলাম যুদ্ধ ও শান্তি, ঢাকা ঃ বিআইআইটি

www.amarboi.org

সঙ্গী সাথীরা আমার ওপর অসন্তুষ্ট হয়ে মত প্রকাশ করেন যে, আমি তাদেরকে গনিমতের মাল থেকে বঞ্চিত করেছি। ফিরে আসার পর তারা এ ঘটনা হুজুর (সা.) কে জানায়। ঘটনা শুনে হুজুর (সা.) আমাকে ডেকে আমার কাজের খুবই প্রশংসা করলেন এবং বললেন, খুশি হও, আল্লাহর সেই গোত্রের প্রত্যেকটি লোকের বিনিময়ে তোমাদের জন্য এত এত প্রতিদান বরাদ্দ করেছেন। তিনি আরো বললেন, আমি তোমাকে একটি অছিয়ত লিখে দিচ্ছি, আমার অবর্তমানে তোমার কাজে লাগবে। এরপর তিনি অছিয়ত লিখে তাতে মোহর লাগিয়ে আমাকে দিয়ে দেন।[১১৮]

হযরত সাদ্দাদ বিন ইলহুদী (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, 'এক বেদুইন এসে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর হাতে ইসলাম কবুল করেন। তিনি হিজরত করে রাসূল (সা.) এর খেদমতে আসার জন্য তাঁর কাছে আরজ পেশ করেন। রাসূল (সা.) তাকে সাহায্য করার জন্য এক সাহাবীকে নির্দেশ দান করেন। পরে এক যুদ্ধে কিছু মালে গনিমত পাওয়া গেলে রাসূলুল্লাহ (সা.) অন্যদের সাথে তাঁকেও অংশ দেন। এতে তিনি বলেন, তিনি মালে গনিমতের আশায় মুসলমান হননি। তিনি আরো বলেন, আমি এজন্য সাথী হয়েছি যে, একটি তীর এসে আমার গলায় বিঁধবে এবং মৃত্যুর সাথে মোলাকাত করে আমি জান্নাতে চলে যাবো। হুজুর (সা.) বললেন, তুমি যদি সত্যবাদী হও, তাহলে আল্লাহ তোমার আশা পূরণ করবেন। কিছুক্ষণ পর যখন যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল তখন রাসূল (সা.) এর সামনে তাঁর লাশ পেশ করা হলো। দেখা গেল, তিনি যে স্থান চেয়েছিলেন ঠিক সে স্থানেই একটি তীর বিদ্ধ হয়েছে। নবী করীম (সা.) জিজ্ঞেস করলেন, এ কি সেই, লোকেরা বললো, জি হ্যাঁ। রাসূল (সা.) বললেন তার কামনা সত্য ছিল। আল্লাহ তার দু'টি আশা পূরণ করেছেন। হুজুর (সা.) এর পবিত্র জুব্বা দ্বারা তাঁর কাফন হয় এবং হযরত (সা.) নিজে তাঁর জানাজার নামাজ পড়ান। নামাজের সময় রাসূলুল্লাহ (সা.) এর মুখে এ কথা শুনা যায়, আল্লাহ তোমার বান্দা তোমার পথে জিহাদ করেছে, অতঃপর শহীদ হয়েছে, আমি এর সাক্ষী।[১১৯]

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) এর বর্ণিত একটি হাদিস। 'এক ব্যক্তি রাসূল (সা.) এর কাছে আরজ করে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোনো ব্যক্তি যদি আল্লাহর পথে জিহাদ করে এবং তার মনে মালে গনিমতের আকাঙ্ক্ষাও থাকে, তাহলে কেমনে

---

১১৮ আবু দাউদ
১১৯ নাসায়ী

www.amarboi.org

হবে? ইরশাদ হলো, তার জন্য কোনো প্রতিদান নেই। সে তিনবার প্রশ্ন করে আর তিনবারই হুজুর উত্তর দেন, 'তার জন্য কোনো প্রতিদান নেই।'[১২০]

হযরত আবু মূসা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, "এক বেদুইন আল্লাহর রাসূলের নিকট হাজির হয়ে জিজ্ঞেস করলো, এক ব্যক্তি বাহাদুরি দেখানোর জন্য যুদ্ধ করে, এক ব্যক্তি ক্রোধের বশে যুদ্ধ করে, এক ব্যক্তি সুনাম-সুখ্যাতির জন্য যুদ্ধ করে, কার যুদ্ধ আল্লাহর কালেমা সর্বোচ্চ ও সর্বোন্নত হোক কেবল তারই যুদ্ধ মহান আল্লাহর পথে সুস্পন্ন হবে।" [১২১]

আল কুরআন ও হাদিসে রাসূলের এ সমস্ত বর্ণনা ছাড়াও প্রিয়নবী (সা.) এর সম্মানিত সঙ্গী-সাথীদের জীবনের ঘটনাবলি পর্যালোচনা ও মুসলমানদের বিজিত এলাকায় নিয়োজিত দায়িত্বশীলদের কার্যকলাপ আলোচনা করলে এটা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, তাঁরা লোভ-লালসা ও ব্যক্তিস্বার্থের উর্ধ্বে ছিলেন। আসলে জীবনের মূল লক্ষ্যের প্রতি তাঁরা ছিলেন পুরোপুরি বিশ্বস্ত এবং মানুষের হেদায়াত ও আল্লাহর কালেমার প্রসারের জন্য তাঁদের জীবনের সামগ্রিক কর্মকাণ্ড এটাই যে সাক্ষ্য দেয়। তাঁদের বিরুদ্ধে নিছক ক্ষমতা দখল বা পররাজ্য আক্রমণ ও দখলের লালসার অভিযোগ বা ধন-সম্পদ লাভের উগ্র আকাঙ্ক্ষার অপবাদ একেবারেই ভিত্তিহীন।

---

১২০ আবু দাউদ

১২১ মুসলিম, তিরমিজি, নাসায়ী, ইবনে মাজা

www.amarboi.org

জিহাদ ও মানবপ্রেম

ইসলামের প্রথম যুগ থেকেই ইসলামের অন্তর্নিহিত মূল্যবোধের অংশ হিসেবে কুরআন শান্তির কথা বলে আসছে। প্রকৃত অর্থে "ইসলাম" ও "শান্তি"র উৎপত্তি একই শব্দ 'সালাম' থেকে। আল্লাহ মুসলমানদের জন্য উপহার হিসেবে সালামকে পছন্দ করেছেন।[১২২] মুসলমানদের প্রথম জামানা থেকে এবং পূর্বের মুসলিম প্রজন্ম থেকে যে কেউ দেখতে পাবেন যে, মুসলমানদের কাছে শান্তিই ছিল মুখ্য, আর জুলুম নির্যাতনের বিরুদ্ধে শান্তিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে যুদ্ধ ছিল অবলম্বন।

"তুমি মানুষকে প্রতিপালকের পথে আহ্বান কর হিকমত ও সদুপদেশ দ্বারা আর তাদের সাথে আলোচনা কর সদ্ভাবে।" (১৬ : ১২৫)।

চরম বিরোধিতা সত্ত্বেও রাসূল (সা.) শান্তির সাথে মানুষদেরকে ইসলামের পথে ডাকতেন। কুরাইশদের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে মুসলমানদেরকে শান্ত থাকতে নির্দেশ দিতেন। মক্কী জমানায় মুসলমানদের এরূপ শান্তিবাদ ছিল পরিবর্তন আনয়নের লক্ষ্যে একটি রাজনৈতিক কৌশল আর মারাত্মক ধ্বংসের হাত থেকে মুসলমানদেরকে রক্ষা করাই ছিল এ শান্তিবাদের লক্ষ্য।

ইসলামী জিহাদের লক্ষ্য যেমন মহান, তেমনি তার নিয়মপদ্ধতি, পন্থা ও কর্মসূচি উন্নত ও পবিত্র। এ প্রসঙ্গে আল্লাহর বাণী প্রণিধানযোগ্য। আল্লাহ বলেন, "এবং বাড়াবাড়ি করবে না, নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমা লংঘনকারীদের ভালবাসেন না।"

অন্যদিকে সর্বাবস্থায় ন্যায়-ইনসাফ বজায় রাখার তাগিদ দিয়েছেন আমাদের মহান প্রভু। আল্লাহ বলেন, "সাবধান! কোনো জাতি সম্প্রদায়ের প্রতি দুশমনি যেন তোমাদেরকে তাদের প্রতি ইনসাফ করা থেকে বিরত না রাখে, আদল-ইনসাফ কর, এটাই তাকওয়ার নিকটবর্তী।"

অনুরূপভাবে তিনি মুসলমানদেরকে দয়ালু ও কোমল হওয়ার জন্য হেদায়াত দিয়েছেন। তাদেরকে জিহাদ করার জন্য তাগিদ করেছেন, কিন্তু শর্ত এই যে, তারা আল্লাহর দেয়া সীমারেখা লংঘন করবে না, অসদাচরণ করবে না, আহতদের অঙ্গচ্ছেদ ঘটাবে না, লুটতরাজ করবে না, মহিলাদের ইজ্জত-সম্ভ্রম নষ্ট করবে না এবং কাউকে অহেতুক কোনো কষ্ট দেবে না। যুদ্ধের সময়ে হোক বা শান্তির সময়ে, তাদের উন্নত চরিত্রের পরিচয় দিতে হবে।

হযরত বুরাইদা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, "নবী করীম (সা.) যাদেরকে জিহাদে সৈন্যদেরকে আমীর নিযুক্ত করতেন তাদেরকে তাকওয়া অবলম্বন ও মুমিনদের

---

১২২ War and Peace, 205-206

www.amarboi.org

প্রতি সদ্ব্যবহার তাগিদ করে নির্দেশ দিতেন, যাও আল্লাহর নামে আল্লাহর রাহে জিহাদ করো, যে আল্লাহকে অস্বীকার করে তাকে হত্যা কর, যাও যুদ্ধ করো, দেখ, খেয়ানত করবে না, ধোঁকা দেবে না, অঙ্গচ্ছেদন করবে না, শিশু হত্যা থেকে বিরত থাবে।" [১২৩]

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, "রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, তোমরা যখন লড়াই কর (দুশমনের চেহারায় আঘাত করবে না।"[১২৪]

হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেন, মুমিন হত্যা করার সময়ও নিজের প্রবৃত্তির ঊর্ধ্বে থাকে।"[১২৫]

আবদুল্লাহ বিন এজিদ আনসারী থেকে বর্ণিত আছে যে, "আল্লাহর রাসূল (সা.) লুটতরাজ এবং অঙ্গচ্ছেদন নিষেধ করেছেন।"[১২৬]

এছাড়াও নারী, শিশু, বৃদ্ধ, আহত ব্যক্তিদেরকে হত্যা, সন্ন্যাসী, নির্জনবাসী ও সন্ধিপ্রিয়দের সাথে বিরোধ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। এখন চিন্তা করে দেখুন আধুনিক সভ্য জগতের নিয়মকানুন আর আল্লাহর দেয়া শরীয়াতের মধ্যে পার্থক্য কতটুকু এবং কোনটি ন্যায়ানুগ? ইসলামী আইন ছাড়া আর কোনো আইনে এমন সহানুভূতি, ভ্রাতৃত্ববোধ ও মানবতা দেখা যায় কি?

সূরা মায়েদায় হযরত আদম (আ.) এর এক পুত্র কর্তৃক অপর পুত্রকে হত্যা করার কাহিনী বর্ণনা করার পর আল্লাহ তাআলা বলেন :

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

এ কারণেই আমি বনি ইসরাইলকে এরূপ লিখে দিয়েছিলাম যে, যে ব্যক্তি বিনা অপরাধে কিংবা ভূপৃষ্ঠে কোন গোলযোগ সৃষ্টি করা ছাড়াই কাউকে হত্যা করলো সে যেন সমগ্র মানবজাতিকেই হত্যা করলো। আর যে ব্যক্তি কোন একটি মানুষেরও প্রাণ রক্ষা করলো, সে যেন সমগ্র মানবজাতিকেই রক্ষা করলো। আমার রাসূলগণ তাদের কাছে স্পষ্ট বিধান নিয়েই এসেছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা পৃথিবীতে সীমা অতিক্রম করে থাকে।[১২৭]

---

১২৩ মুসলিম
১২৪ সহীহুল বুখারী, মুসলিম
১২৫ আবু দাউদ
১২৬ সহীহুল বুখারী
১২৭ সূরা মায়েদা, ৩২

www.amarboi.org

অপর এক জায়গায় আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় লোকদের গুণ-বৈশিষ্ট্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন :

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا

আল্লাহ যে প্রাণ-সত্তাকে সম্মানার্হ বলে ঘোষণা করেছেন, বিনা অধিকারে তাকে তারা বধ করে না এবং ব্যভিচারও করে না। আর যে এটা করবে সে তার শাস্তি পাবে।[১২৮]

হজরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) বর্ণনা করেন যে, হজরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : বড় গুণাহগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় গুনাহ হলো আল্লাহর সাথে শরিক করা, হত্যা করা, পিতা মাতার অবাধ্যতা করাও মিথ্যা বলা।

হজরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন - মুমিন যে পর্যন্ত বৈধভাবে কাউকে খুন না করে, সে পর্যন্ত সে ইসলামের উদারতার সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে পারে।

নাসায়ীতে একটি সর্বস্বীকৃত হাদিসে বর্ণিত হয়েছে : কেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যে হিসাব নেয়া হবে তা নামাজের হিসাব এবং সর্বপ্রথম যে বিচার অনুষ্ঠিত হবে তা খুনের বিচার।

---

১২৮ সূরা আল ফুরকান, ৬৮

www.amarboi.org

অকল্যাণ ও অরাজকতার মূলোৎপাটন

কুরআন বলছে, যদি কোন মানুষ হোক মুসলিম বা অমুসলিম, কাউকে হত্যা করে, যদি সেটা খুনের অপরাধ বা অন্য কোন অন্যায়ের জন্য না হয়, তাহলে সে যেন পুরো মানবজাতিকে হত্যা করে। এখানে আরো বলা হচ্ছে, আর যদি কেউ কোন মানুষকে বাঁচালো তাহলে সে পুরো মানবজাতিকে রক্ষা করল।

আর যখন কিতালের কথা আসে (আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষে যুদ্ধ করার নামই হল কিতাল) সেখানেও কিছু নিয়ম-কানুন আছে। কুরআনে এবং প্রিয়নবী মোহাম্মদ (সা.) এর হাদিসেও বলা হচ্ছে, যখন কোন উপায় থাকে না, শত্রুর সাথে যুদ্ধ করতেই হবে, সেখানও বেশ কিছু নিয়ম-কানুন আছে।

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

'আর তোমরা আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করো তাদের বিরুদ্ধে যারা তোমাদের সাথে লড়াইয়ে রত আছে এবং এ ব্যাপারে সীমালংঘন করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালংঘনকারীদের পছন্দ করবেন না।'[১২৯]

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ

'আর লড়াই করো ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ না ফিতনা দূরীভূত হয়ে সমগ্র জীবনব্যবস্থা আল্লাহর না হয়। অতঃপর তারা যদি বিরত হয় তাহলে অত্যাচারী ব্যতীত অন্য কারো ওপর সীমালংঘন করা যাবে না।'[১৩০]

কিন্তু এই বৈধ হত্যা দৃশ্যত যদিও অবৈধ হত্যার মত রক্তপাতই বটে তথাপি আসলে এটা অনিবার্য ও অত্যাবশ্যক। কোন অবস্থাতেই এটা এড়িয়ে যাওয়ার উপায় নেই। কেননা এ ছাড়া দুনিয়াতে শান্তি প্রতিষ্ঠা যেমন সম্ভব নয়, তেমনি সম্ভব নয় অকল্যাণ ও অরাজকতার মূলোৎপাটন। এ রক্তপাত ছাড়া সজ্জনেরা কুজনদের এবং শিষ্টেরা দুষ্টদের অত্যাচার থেকে রেহাই পাবে না, পণ্ডিতরা ন্যায্য অধিকার ফিরে পেতে পারে না, ঈমানদাররা ঈমান ও বিবেকের স্বাধীনতা লাভ করতে পারে না, দুর্মদ অহঙ্কারী লোকদেরকে অত্যাচার থেকে ফিরিয়ে রাখা সম্ভব হয় না এবং সামগ্রিকভাবে আল্লাহর সৃষ্ট জীবরা রক্তপাত ও আত্মিক শান্তি লাভ করতে সক্ষম হয় না।[১৩১]

---

১২৯ সূরা বাকারা, ১০৯

১৩০ সূরা বাকারা, ১৯৩

১৩১ মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী, আল জিহাদ, ঢাকা ঃ আধুনিক প্রকাশনী।

www.amarboi.org

ইসলামের বিরুদ্ধে এরূপ রক্তপাতের অভিযোগ যদি কেউ আনতে চায়, আনুক। ইসলামও এ অভিযোগ স্বীকার করে নিতে বিন্দুমাত্রও লজ্জাবোধ করে না। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এরূপ অনিবার্য রক্তপাতের দায়ে দোষী নয় এমন আর কে আছে? বৌদ্ধ ধর্মের অহিংসবাদ সব রকমের হত্যাকেই সর্বকালের জন্য অবৈধ মনে করে বটে; কিন্তু এই ধর্মও শেষ পর্যন্ত 'ভিক্ষু' ও 'গৃহস্থ' এর মধ্যে পার্থক্য করতে বাধ্য হয়েছে। সবশেষে বৌদ্ধ ধর্ম একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর জন্য মুক্তি (নির্বাণ) নির্দিষ্ট করে রেখে বাদ বাকি সমগ্র বিশ্ববাসীকে গুটিকয় নৈতিক উপদেশ দিয়ে গার্হস্থ্য ধর্ম করার অনুমতি দিয়ে দিয়েছে যে গার্হস্থ্য ধর্মে রাজনীতি, শাসন ও যুদ্ধ সবই রয়েছে। এমনিভাবে খ্রিষ্টধর্মও প্রথমে যুদ্ধ বিগ্রহকে পুরোপুরিভাবে নিষিদ্ধ করার পর শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছে। রোম সাম্রাজ্যের জুলুম যখন তার সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যায় তখন সে নিজেই সাম্রাজ্য দখল করে। তারপর এমন ভয়াবহ যুদ্ধ শুরু করে, যা 'অনিবার্য রক্তপাত' এর সীমা ছাড়িয়ে বহু দূর অগ্রসর হয়ে যায়। হিন্দু ধর্মেও শেষের দিকের দার্শনিকরা 'অহিংসা পরম ধর্ম' এই মতবাদ প্রচার করেন এবং নরহত্যাকে পাপ বলে ঘোষণা করেন। কিন্তু একই সময়ের ধর্মবেত্তা 'মনু'কে জিজ্ঞাসা করে হয়েছিল যে, যদি কেউ আমাদের স্ত্রীদের বেইজ্জতি করে, সম্পদ ছিনতাই করে কিংবা আমাদের ধর্মের অবমাননা করে তা হলে আমরা কী করবো? তিনি জবাব দিলেন, 'এমন অপরাধী মানুষকে মেরে ফেলা উচিত, সে গুরু কিংবা ব্রাহ্মণ, বৃদ্ধ কিংবা তরুণ, যাই হোক না কেন।'

বেশির ভাগ ধর্মগ্রন্থে যুদ্ধের অনুমোদন

বাইবেল প্রক্সোডালের গ্রন্থে আছে ওল্ড টেস্টামেন্টের ২২ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ১৮ থেকে ২০ বলছে, হত্যা কর। এক্সোডাসের ৩২ নং অধ্যায় বলছে হত্যা কর। নাম্বারস বলছে হত্যা কর। নিউ টেস্টামেন্টে লুক এর গসপেল, সেখানেও বলা হচ্ছে, 'হত্যা কর'। যীশু খ্রিষ্টের ঐ গল্পটা হয়তো জানেন, তিনি যখন গেতসামেনির বাগানে গিয়ে সৈন্যদের বললেন যে, তোমাদের তরবারি বের করে দাঁড়াও। আর সৈন্যরা তখন তরবারি দিয়ে বাতাস কাটতে লাগল। বুঝতেই পারছেন, বেশির ভাগ ধর্মগ্রন্থেই যুদ্ধকে অনুমোদন দেয়া হয়েছে।

যদি হিন্দু ধর্মগ্রন্থ 'মহাভারত' ভগ্বদগীতার ২ নম্বর অধ্যায়ে আছে আপনারা জানেন যে, অর্জুনের খুব মন খারাপ এ কারণে যে, তাকে তার নিকট আত্মীয়দের সাথে যুদ্ধ করতে হবে, অর্জুন বলছে, কিভাবে এখানে হাজার হাজার মানুষের সামনে আমার আত্মীয়দের হত্যা করব? অর্জুনকে তখন উপদেশ দিলেন তার ভগবান কৃষ্ণ। ভগবান কৃষ্ণ তাকে বললেন, সত্য হচ্ছে সবচেয়ে বড় আর

www.amarboi.org

যখন তুমি সত্যের পক্ষে তখন তোমার শত্রু কে, সেটা বড় কথা নয়। হোক তারা তোমার আত্মীয়। আর কথাটা ঠিক, সত্যের জায়গা হচ্ছে অনেক ওপরে, রক্তের সম্পর্কের চেয়েও।[১৩২]

'হে ঈমানদারগণ! ন্যায়ের ব্যাপারে আল্লাহর জন্য সাক্ষী হও। আর কোন জাতির শত্রুতা যেন তোমাদেরকে সীমালংঘন করতে প্রয়াসী না করে। তোমরা ন্যায়বিচার কর। ন্যায়বিচার আল্লাহর ভীতির সবচয়ে নিকটবর্তী।[১৩৩]

এ ক্ষেত্রে কুরআন ও হাদিসে বারবার নিয়ম-কানুনের কথা বলা হচ্ছে, যখন আর উপায় থাকে না, এ নিয়ম মেনেই তখন আল্লাহর পথে যুদ্ধ করতে হবে। সেখানে যুদ্ধ করতে গিয়ে আমরা মহিলাদের ক্ষতি করব না, আমরা শিশুদের ক্ষতি করব না, বাড়ির ভেতর বয়স্ক লোকদের ক্ষতি করব না, আমরা মন্দির ভাঙচুর করব না, গাছপালা পোড়াব না, গাছপালা কেটে ফেলব না, শস্যক্ষেত পোড়াব না, পশুপাখি হত্যা করব না, এমন আরও অনেক নিয়ম মানতে হবে। চিন্তা করুন, যদি আপনারা অনুধাবন করেন যে, ইসলামের বিস্তৃতি হয়েছে তরবারির মাধ্যমে? তার মানে শান্তি ছড়ানো হয়েছে তরবারির মধ্যমে। আর ইসলাম প্রথাগতভাবেই যুদ্ধের বিরুদ্ধে কথা বলে, কিন্তু কোন উপায় না থাকলে শক্তি প্রয়োগ করার অনুমতি দেয়। এ পৃথিবীর প্রত্যেকটা দেশেই পুলিশ আছে। যখন কোন সাধারণ মানুষ, কোন নাগরিক বা অন্য কেউ সেই দেশের কোন আইন ভঙ্গ করে, তখন পুলিশ সেই দেশে শান্তি বজায় রাখার জন্য শক্তি প্রয়োগ করে। তাহলে প্রত্যেক দেশেই পুলিশ আছে, তারা শক্তি প্রয়োগ করে, সঙ্গে অস্ত্রও রাখে।

ইসলাম তরবারি দিয়ে ছড়ানো হয়নি

এদিকে ইসলাম কিন্তু যুদ্ধের বিপক্ষে কথা বলে, প্রধানত শান্তির কথা বলে, সমাজে কিছু মানুষ আছে যারা শান্তি চায় না, তারা চায় না সবাই শান্তিতে থাকুক। এদেরকে কন্ট্রোল করার জন্য, শেষ উপায় হিসেবে ইসলাম শক্তি প্রয়োগ ও যুদ্ধের অনুমতি দেয়। ইসলাম তরবারি দিয়ে ছড়ানো হয়েছে এ ভুল ধারণাটার উত্তর বেশ ভালভাবেই দিয়েছেন বিখ্যাত ঐতিহাসিক ডিলেসি ওলেরি। তিনি তাঁর বই 'ইসলাম এ্যাট দ্যা ক্রসেড' এর ৮ নং পৃষ্ঠায় লিখেছেন যে, ইতিহাসে এটা পরিষ্কার যে, মুসলমানদের তরবারি হাতে নিয়ে ইসলাম ছড়ানো আর বিভিন্ন দেশ জয় করার আজগুবি গল্পটা একটা অসাধারণ মিথ্যা ছাড়া আর কিছুই না, যে মিথ্যাটা বারবার বলা হয়েছে। আর আমরা জানি যে

---

১৩২ ডা. জাকির নায়েক, জিহাদ ও সন্ত্রাসবাদ।
১৩৩ সূরা মায়েদা, ৮

www.amarboi.org

(মুসলমানরা) আমরা যেখানে ৮০০ বছর রাজত্ব করেছি। সেখানে তরবারি দিয়ে কাউকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করিনি। পরবর্তীতে ক্রুসেডাররা এসে মুসলমানদের সরিয়ে দিলো, সে সময় একজন মুসলমানও প্রকাশ্যে আজান দিতে পারত না।

আমরা (মুসলমানরা) গত ১৪০০ বছর ধরে আরব বিশ্বে রাজত্ব করছি। কিছু সময় ব্রিটিশরা রাজত্ব করেছে। কিছু সময় ফ্রেঞ্চরাও। এ সময়টা বাদে পুরো ১৪০০ বছর ধরে মুসলমানরা আরব বিশ্বে রাজত্ব করছে। এ আরব বিশ্বের প্রায় দেড় কোটি লোক হল কপটিক খ্রিস্টান। কপটিক খ্রিস্টান মানে যারা বংশ পরম্পরায় খ্রিস্টান। আরবের এ দেড় কোটি কপটিক খ্রিস্টান সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, ইসলাম তরবারির মুখে ছড়ায়নি। মুসলমানরা প্রায় ১০০০ বছর ধরে ভারত শাসন করেছে, যদি তারা চাইতো তাহলে প্রত্যেক ভারতীয়কে তরবারির মুখে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করতে পারত। আজকে এক হাজার বছর পরও ভারতে ৮০% লোক মুসলমান না। এ ৮০% অমুসলিম সাক্ষ্য দেবে যে, ইসলাম তরবারির মুখে প্রসার লাভ করেনি। কোন মুসলমান আর্মি কি মালয়েশিয়া গিয়েছিল? সেখানে শতকরা ৫০ ভাগেরও বেশি মুসলমান। কোন মুসলমান আর্মি কি ইন্দোনেশিয়াতে গিয়েছিল? ইন্দানেশিয়ায় মুসলমানদের সংখ্যা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি? কোন মুসলমান আর্মি কি আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে গিয়েছিল? ইউরোপের একজন বিখ্যাত ঐতিহাসিক থমাস কার্লাইল অবশ্য এর একটা উত্তর দিয়েছেন আর তিনি তরবারির কথাই বলেছেন। তিনি বলেন, প্রত্যেকটা নতুন আইডিয়া মানুষের মাথায় জন্ম নেয় পুরো পৃথিবীর বিপক্ষে। তখন সে যদি সেটা তরবারির মাধ্যমে ছড়াতে চায় তাহলে সেটা ফলপ্রসূ হবে না। উনি প্রথমে বুদ্ধির তরবারির কথা বলেছেন।[১৩৪] একই কথা আল কুরআনের সূরা নাহলের ১২৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে :

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

'হে নবী (সা.) আপনি তাদেরকে আপনার প্রভুর সাথে ডাকুন হিকমত এবং উত্তম উপদেশের মাধ্যমে।'[১৩৫]

প্লেইনট্রুথ ম্যাগাজিনের একটি পরিসংখ্যানমূলক খবর যেটা রিডার্স ডাইজেস্টের অ্যালম্যানক ইয়ারবুক ১৯৮৬-এর রিপ্রোডাকশন ছিল। যেখানে বলা হয়েছে,

---

১৩৪ ডা. জাকির নায়েক, ইসলাম ও সন্ত্রাসবাদ।
১৩৫ সূরা নাহল, ১২৫

www.amarboi.org

১৯৩৪ থেকে ৮৪ সালের মধ্যে গত পঞ্চাশ বছরে বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীর সংখ্যা কত বেড়েছে? সে পরিসংখ্যানে এক নম্বরে ছিল ইসলাম। সেটা ছিল ২৩৫%। খ্রিস্টান ধর্ম মাত্র ৪৭%। আমি একটা প্রশ্ন করছি ১৯৩৪ থেকে '৮৪ সাল পর্যন্ত কোন যুদ্ধটা হয়েছে? যে কারণে অমুসলিমরা ইসলাম গ্রহণ করেছে?

আমেরিকা ও ইংল্যান্ডে সবচেয়ে জনপ্রিয় ধর্ম হচ্ছে ইসলাম

আমেরিকা এবং ইংল্যান্ডে এখন সবচেয়ে জনপ্রিয় ধর্ম হচ্ছে ইসলাম। আমেরিকায় কথা বলার স্বাধীনতা আছে। ইউরোপেও কথা বলার স্বাধীনতা আছে। ইসলাম যদি মহিলাদের অত্যাচার করে, তাহলে অমুসলিম মহিলারা ইসলাম গ্রহণ করে কেন? কিভাবে যারা মুসলমান হচ্ছে, তাদের তিন ভাগের দুই ভাগই মহিলা? কারণ, ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। ইসলামে সকল সমস্যার সমাধান আছে। আমেরিকার একটা রিসার্চ কোম্পানি যার অফিস ওয়াশিংটনে– এরা বলেছে যে, ১১ সেপ্টেম্বরের ২ মাস পর ২০ হাজার মানুষ মুসলমান হয়েছে।

তবে ঐ সন্ত্রাসী কাজটা খারাপ ছিল, সালমান রুশদী আমাদের নবীর বিরুদ্ধে লিখেছে, সেটা খারাপ, কিন্তু লোকে জানতে চাইল সালমান রুশদী কী লিখেছে? তারপর সত্যটা জানার জন্য কুরআন পড়লো। আর সত্য জানার পর তারা মুসলমান হয়ে গেল, ইসলাম ধর্মগ্রহণ করল। আজকের দিনে আমেরিকায়ও এ পরিসংখ্যান বাড়ছে। আমেরিকারই একটা প্রধান খবরেরও কাগজ দ্যা নিউইয়র্ক টাইমস বলছে এখন আমেরিকানরা জানতে চায় যে, মুসলমানদের কোন বাইবেল পাওয়া যায় কি না, তারা জানেও না যে, আমাদের পবিত্র গ্রন্থ কুরআন। তারা মুসলমানদের বাইবেল পড়তে চায়। ভালই তো। আর যখনই তারা সত্যের মুখোমুখি হবে, তখন মিথ্যা ধ্বংস হয়ে যাবে।[১৩৬]

পবিত্র কুরআনের ১৭তম সূরা সূরায়ে বনি ইসরাইলের ৮১ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে।

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا

'আর হে নবী (সা.) আপনি বলুন, সত্য সমাগত, মিথ্যা অপসারিত। মিথ্যার ধ্বংস অনিবার্য।[১৩৭]'

---

১৩৬ তদেক

১৩৭ সূরা বনি ইসরাইল, ৮১

www.amarboi.org

আমাদেরকে ব্যবহার করতে হবে বুদ্ধির তরবারি, যুক্তির তরবারি। যেটা মানুষের মন জয় করে। আর আল্লাহ তা'য়ালা মহান স্রষ্টা। তিনি কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় তিন তিনবার বলেছেন সূরা তাওবা : আয়াত

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

সূরা সফ : আয়াত ৯, সূরা ফাতাহ : আয়াত ২৮ এ বলা হয়েছে।

'তিনি সেই সত্তা যিনি তাঁর রাসূলকে হেদায়াত এবং সত্য দ্বীনসহকারে প্রেরণ করেছেন যাতে তিন উহাকে (সত্য দ্বীনকে) সকল জীবনব্যবস্থার ওপরে বিজয়ী করতে পারেন।'

ড. জোসেফ অ্যাডাম পিয়ারসন বলেছেন, 'লোকেরা দুশ্চিন্তা করে যে, কোন একদিন পারমাণবিক বোমা আরবদের কাছে চলে যাবে। তারা বুঝতে পারে না যে, যেদিন মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) জন্মগ্রহণ করেছেন, সেদিনই ইসলামের বোমা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে।'

www.amarboi.org

সামাজিক জীবনে আমর বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকারের মর্যাদা

সমাজের সামগ্রিক কল্যাণ ও উন্নতি-অগ্রগতিও এই আমর বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকারের ওপর একান্তভাবে নির্ভরশীল। এসব বিষয় ব্যক্তিগত প্রচেষ্ট এবং ত্যাগ স্বীকার পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয় বরং সকল মোমেনের দায়িত্ব হচ্ছে নাফরমান এবং ফাসেকদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে রুখে দাঁড়িয়ে অন্যায় ও অসত্যের প্রতিরোধ করা। এতে আল্লাহ তায়ালার দ্বীনের দাওয়াতের ধারা অব্যাহত থাকবে। রাসূল (সা.) বলেছেন, তোমরা অবশ্যই সৎ কাজের আদেশ দিতে থাকবে এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করতে থাকবে। প্রয়োজনবোধে পাপী লোকদের হাত ধরে তাদেরকে মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখবে, তাতে না হলে তাদেরকে সত্যের পথের অনুসারী করার জন্যে চাপ সৃষ্টি করবে। অন্যথা আল্লাহ তায়ালা তোমাদের অন্তরকে পাথরের মতো করে দেবেন এবং তোমাদের ওপর অভিশাপ নাযিল করবেন, যেভাবে বনি ইসরাইলীদের অভিশপ্ত করেছিলেন।

রাসূল (সা.) আরো বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা স্বল্পসংখ্যক মানুষের মন্দ কাজের পরিণামে সাধারণ মানুষদের শাস্তি দেন না। কিন্তু মানুষের মধ্যে পাপ অন্যায় যখন সার্বজনীন হয়ে ওঠে এবং শক্তি থাকা সত্তেও তারা পাপ অন্যায় প্রতিরোধে অগ্রসর হয় না তখন ঢালাওভাবে সকলের ওপর আযাব নাযিলের আদেশ দেয়া হয়। কাজেই মুসলমানদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে দ্বীনের উন্নতির জন্য কাজ করতে হবে।

এটি একটি সমাজকে ধ্বংস ও অবক্ষয়ের হাত থেকেও রক্ষা করে। মানবিক মূল্যবোধ ও মনুষ্যত্বের রক্ষণাবেক্ষণও একমাত্র এর দ্বারাই সম্ভব। একটি জাতির প্রত্যেক সদস্যের মধ্যে পরস্পরকে ভাল কাজে উদ্বুদ্ধ করা ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করার প্রেরণা ও জাগৃতি যতক্ষণ বর্তমান থাকবে কিংবা এ দায়িত্ব পূর্ণ নিষ্ঠার সাথে পালন করে এমন একটি দল বর্তমান থাকবে ততক্ষণ সে জাতি ধ্বংস ও অবক্ষয়ের কবলে পড়তে পারে না।

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

আর ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী একে অপরের সহায়ক। তারা ভাল কথার শিক্ষা দেয় এবং মন্দ থেকে বিরত রাখে। নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের নির্দেশ অনুযায়ী জীবন যাপন করে। এদেরই

www.amarboi.org

উপর আল্লাহ্ তা'আলা দয়া করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পরাক্রমশীল, সুকৌশলী।[১৩৮]

التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

তারা তওবাকারী, এবাদতকারী, শোকরগোযার, (দুনিয়ার সাথে) সম্পর্কচ্ছেদকারী, রুকু ও সিজদা আদায়কারী, সৎকাজের আদেশ দানকারী ও মন্দ কাজ থেকে নিবৃতকারী এবং আল্লাহ্র দেওয়া সীমাসমূহের হেফাযতকারী। বস্তুতঃ সুসংবাদ দাও ঈমানদারদেরকে।[১৩৯]

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

তারা এমন লোক যাদেরকে আমি পৃথিবীতে শক্তি-সামর্থ্য দান করলে তারা নামায কায়েম করবে, যাকাত দেবে এবং সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করবে। প্রত্যেক কর্মের পরিণাম আল্লাহ্র এখতিয়ারভূক্ত।[১৪০]

কিন্তু যদি ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের প্রতিরোধের এই চেতনা ও স্পৃহার বিলুপ্তি ঘটে এবং এ দায়িত্ব পালনকারী কোন একটি দলও তাদের মধ্যে বর্তমান না থাকে তাহলে ক্রমে ক্রমে পাপাচার ও অপরাধ প্রবণতার দানবীয় শক্তি তাদের ওপর পরাক্রান্ত হয়ে ওঠে এবং শেষ পর্যন্ত সে সমাজ নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও বস্তুগত অবক্ষয় ও অধঃপতনের গভীরতার আবর্তে এমনভাবে নিক্ষিপ্ত হয় যে, সেখান থেকে আর মাথা তুলতে পারে না।[১৪১] পবিত্র কুরআনে এ বিষয়টিই নিম্নরূপ বর্ণিত হয়েছে :

فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ (-) وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ

আল্লাহর আজাবে ধ্বংস হয়ে যাওয়া অতীতের জাতিগুলোর মধ্যে অরাজকতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারে এমন একদল সৎ লোক যদি থাকতো। অবশ্য স্বল্পসংখ্যক লোক তেমন ছিল এবং তাদেরকে আমি আজাব থেকে নিষ্কৃতি দিয়েছিলাম। অতীতের সেই দুরাচারীরা কেবল ভোগ বিলাস ও

---

[১৩৮] সুরা তওবা, ৭১।

[১৩৯] তদেক, ১১২।

[১৪০] সুরা হজ্ব, ৪১।

১৪১ মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী,আল জিহাদ, ঢাকা ঃ আধুনিক প্রকাশনী।

www.amarboi.org

আমোদ-প্রমোদের উপকরণ নিয়েই ব্যস্ত থাকতো। আসলে তারা ছিল অপরাধপ্রবণ। অতএব জেনে রেখ, তোমার প্রতিপালক এমন জালেম নন যে, জনবসতিগুলো সদাচারী হওয়া সত্ত্বেও ধ্বংস করবেন।[১৪২]

অন্য এক জায়গায় বনি ইসরাইল বংশের অভিশপ্ত হওয়ার কারণ বিশ্লেষণ করে বলা হয়েছে :

বনি ইসরাইলের মধ্যে যারা আল্লাহর বিধানকে অমান্য করেছিল তাদেরকে দাউদ ও ঈসার মুখ দিয়ে অভিস্পাৎ করা হয়েছিল। কারণ তারা নাফরমানি করতো ও সীমালঙ্ঘন করতো। আর পরস্পরকে অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করতো না। তারা অত্যন্ত জঘন্য কাজে লিপ্ত থাকতো।

এ আয়াতের তাফসির প্রসঙ্গে ইমাম আহমদ, তিরমিজী, আবু দাউদ ও ইবনে মাজা (রহ) বিভিন্ন হাদিসে বর্ণনা করেছেন। এসব হাদিসের ভাষায় সামান্য হেরফের থাকলেও মোটের ওপর পূর্ণ ঐকমত্য সহকারেই বনি ইসরাইলের লোকদের প্রাথমিক বিভ্রান্তি ও ত্রুটির উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, অন্যায়ের প্রতি ঘৃণা তাদের মন থেকে দূর হয়ে গিয়েছিল। অন্যায়কে সহ্য করতে করতে স্বয়ং তাদের মধ্যেই অন্যায়ের প্রতি আসক্তির সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। অথচ একে তারা তথাকথিত উদারনীতি নামে অভিহিত করতো।

অর্থাৎ তাদের একজন অপরজনের সাথে সাক্ষাতের সময় বলতো, হে অমুক! তুমি যা করছ, অন্যায় করছ। ওটা ছেড়ে দাও। কিন্তু পরদিন যখন সেই ব্যক্তির সাথে তার দেখা হতো তখন সে বিনা দ্বিধায় তাদের সাথে মিশে যেতো ও পানাহার করতো। অবশেষে তাদের ওপর তাদের পরস্পরের খারাপ প্রভাব পড়ার দরুন তাদের বিবেক নির্জীব হয়ে গেল। হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) এ কথা বলার সময় হঠাৎ শোয়া অবস্থায় থেকে উঠে বসলেন এবং উত্তেজিতভাবে বললেন :

আমার প্রাণ যার হাতে সেই মহান আল্লাহর শপথ করে বলছি যে, তোমাদের সৎ কাজে আদেশ, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ এবং দুষ্কৃতকারীর তৎপরতা বন্ধ ও তাকে সৎ কাজের দিকে চালিত করে দিতেই হবে। নচেৎ তোমাদের পরস্পরের বিবেককে আল্লাহ পরস্পর দ্বারা প্রভাবিত করে দেবেন অথবা বনি ইসরাইলের মত তোমাদের ওপরও অভিস্পাৎ করবেন।

উল্লিখিত দৃষ্টান্তের আলোকে সমগ্র বিশ্ববাসীর ব্যাপারটাই বুঝে নিতে হবে। একটি জাতির মুক্তি ও কল্যাণ যেমন সৎ কাজে আদেশ দান ও অসৎ কাজ

---

১৪২ সূরা হুদ, ১১৬-১১৭

www.amarboi.org

থেকে নিষেধ করার মর্যাদাগত চেতনা ও প্রেরণার ওপর নির্ভরশীল, তেমনিভাবে সমগ্র মানবজাতির মুক্তি সাফল্য ও ঐ একই জিনিসের ওপর নির্ভরশীল। পৃথিবীতে অন্তত একটি মানবগোষ্ঠী এমন থাকাই চাই যারা দুষ্কৃতকারীদের দুষ্কর্ম প্রতিহত করবে, অন্যায় ও অবিচারকে রুখে দাঁড়াবে, সৎ কাজের নির্দেশ দেবে, পৃথিবীতে আল্লাহর পক্ষ থেকে সাক্ষী হয়ে দাঁড়াবে এবং মানবজাতির তত্ত্বাবধান করবে। এমন মানবগোষ্ঠী যারা ইনসাফ কায়েম করবে এবং অন্যায় ও অসত্যকে কখনো মাথা তোলার সুযোগ দেবে না। আল্লাহর সৃষ্টিকে সর্বব্যাপী ধ্বংস থেকে বাঁচানো এবং ভূপৃষ্ঠকে যাবতীয় দুষ্কৃতি, বিভেদ-বিশৃঙ্খলা, অরাজকতা, জুলুম ও বাড়াবাড়ি থেকে রক্ষা করার জন্য এ ধরনের একটা গোষ্ঠী বা দলের অস্তিত্ব অপরিহার্য :

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা পরিহার্য যারা কল্যাণ ও সত্যের দিকে সকলকে ডাকবে, ভালো কাজের আদেশ করবে ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করবে।[১৪৩]

يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

হে বৎস, নামায কায়েম কর, সৎকাজে আদেশ দাও, মন্দ কাজে নিষেধ কর এবং বিপদাপদে সবর কর। নিশ্চয় এটা সাহসিকতার কাজ।[১৪৪]

অতএব 'আমর বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকার' কেবল একটি মহৎ কাজ তা নয়, শুধু মানব হিতৈষণার একটি পুণ্যময় স্বর্গীয় প্রেরণাও নয়। এটা আসলে সমাজব্যবস্থাকে বিকৃতি, বিভেদ ও বিশৃঙ্খলা থেকে নিরাপদ রাখার সর্বোত্তম ও অপরিহার্য পন্থা। এটা একটা মহৎ সেবামূলক ও জনকল্যাণমূলক কাজ। পৃথিবীতে শান্তি বজায় রাখা, পৃথিবীকে ভদ্র ও সুসভ্য মানুষদের বসবাসযোগ্য করা এবং বিশ্ববাসীকে ইতরপ্রাণীর মর্যাদা থেকে পূর্ণাঙ্গ মানুষের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আল্লাহ এ কাজ একটি আন্তর্জাতিক মানবগোষ্ঠীর ওপর অর্পণ করেছেন। বস্তুত মানবতার এর চেয়ে বড় সেবা আর কিছু হতে পারে না।

---

১৪৩ সূরা আল ইমরান, ১০৪

১৪৪ সূরা লোকমান, ১৭।

www.amarboi.org

জিহাদ ও সন্ত্রাসবাদ

আজকের পৃথিবীতে মনে হয় সন্ত্রাস না যত সমস্যা তার থেকে বেশি সমস্যা সন্ত্রাসের সংজ্ঞা নিয়ে। পশ্চিমারা কেউ কেউ রাগ ঢাক গুটিয়ে একথা বলেই ফেলেন এই পৃথিবীর যুদ্ধ, রক্তপাত, তলোয়ারের ঝনঝনানীর জন্য মুহাম্মদ (সা.) নিজেই দায়ী। সম্প্রতি আমেরিকার খ্রিষ্টান চার্চের নাইন-ইলেভেন উদযাপনে মহাগ্রন্থ আল কুরআন পোড়ানোর ঘোষণা, তার ব্যঙ্গাত্মক কার্টুন, জুতার তলদেশে মুহাম্মদ (সা.) এর নাম লিখা এবং বাংলাদেশের হাইকোর্টে কুরবানি নিয়ে মহাগ্রন্থ আল কুরআনের সত্যতা চ্যালেঞ্জ করে হিন্দু নেতা মহেশ্বর রিট ও বাবরি মসজিদের ব্যাপারে মুসলমানদের বিরুদ্ধে রায় একই সূত্রে গাঁথা।

বর্তমানে আমরা সে সময় অতিক্রম করছি। যখন কোন ব্যক্তি একজন মুসলমান সম্পর্কে শোনে বা জানে, তার মনে একটা চিন্তা দানা বাঁধে যে, প্রকৃতপক্ষে সে কি একজন মুসলমান? নাকি একজন জঙ্গি, সন্ত্রাসী। মৌলবাদী শব্দটির অর্থ কী? একজন মৌলবাদী হচ্ছেন এমন একজন ব্যক্তি যিনি কোন একটি বিষয়ে মৌলিকত্বকে কঠোরভাবে মেনে চলেন। উদাহরণস্বরূপ, যদি একজন ডাক্তারকে ভাল ডাক্তার হতে হয়, তবে তাকে চিকিৎসাশাস্ত্রের মৌলিকত্ব সম্পর্কে ভালোভাবে জানতে হবে। যদি সে একজন মৌলবাদী না হয়, তাহলে সে কখনোই ভালো ডাক্তার হতে পারবে না। একজন বিজ্ঞানীকে ভালো বিজ্ঞানী হতে হলে বিজ্ঞানের মৌলিক বিষয় সম্পর্কে জানতে হবে। যদি সে ভালোভাবে না জানে, তাহলে সে কখনোই ভালো বিজ্ঞানী হতে পারবে না।

একজন গণিতবিদের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটি একই। গণিতবিদকেও একজন মৌলবাদী হতে হবে। যদি গণিত বিষয়ে তিনি মৌলবাদী না হন, তাহলে কখনোই তিনি ভালো গণিতবিদ হতে পারবেন না। যেমন, একজন ব্যক্তি যদি প্রকৃতপক্ষে ডাকাত অথবা চোর হয়, যার পেশা হচ্ছে ডাকাতি বা চুরি করা। সমাজের জন্য অবশ্যই সে একটি অভিশাপ। সে কখনোই একজন ভালো মানুষ হতে পারে না। অন্য দিকে আপনি যদি একজন প্রকৃত ডাক্তারকে দেখেন যার কাজ হচ্ছে মানুষের জীবন রক্ষা করা। তাহলে সে সমাজের জন্য উপকারী, একজন ভালো মানুষ। তাই সকল মৌলবাদীকে একই মাপকাঠিতে পরিমাপ না করে, যার যার ক্ষেত্র অনুযায়ী পরিমাপ করা উচিত। আমি একজন মুসলমান মৌলবাদী হিসেবে গর্ববোধ করি।[১৪৫]

---

১৪৫ ডা. জাকির নায়েক, জিহাদ ও সন্ত্রাসবাদ।

www.amarboi.org

একজন হিন্দুকে পরিপূর্ণ হিন্দু হতে হলে, হিন্দু ধর্মের ক্ষেত্রে মৌলবাদী হতে হবে। নইলে তিনি একজন পরিপূর্ণ হিন্দু হতে পারবেন না। একজন খ্রিষ্টান ধর্মীয় ব্যক্তিকে খ্রিষ্টান ধর্মে তার জীবনে পরিপূর্ণতা আনতে হলে তাকে খ্রিষ্টান ধর্মে মৌলবাদী হতে হবে। নইলে তিনি একজন পরিপূর্ণ খ্রিষ্টান নন।

সন্ত্রাসবাদের ব্যাপারে যদি মুসলমানদের ব্যাপারটা ধরি, তাহলে প্রত্যেক মুসলমান এক একজন সন্ত্রাসী। আপনারা হয়তো অবাক হয়ে ভাবতে পারেন যে, প্রত্যেক মুসলমান এক একজন সন্ত্রাসী। সন্ত্রাসের সংজ্ঞাটা কী? সন্ত্রাসীর প্রকৃত অর্থ হচ্ছে, যে অন্যায়ভাবে সমাজে মানুষকে ভয় দেখায়। একজন ডাকাত যদি কোন পুলিশকে দেখে ভয় পায়, তাহলে সেই পুলিশ ডাকাতের কাছে একজন সন্ত্রাসী। তাই এ ধারণার ভিত্তিতে ডাকাতের কাছে প্রতিটি মুসলমানই একজন সন্ত্রাসী। যখন একজন ডাকাত বা একজন অন্যায়কারী একজন মুসলমানকে দেখে, সে ভয় পায়। এভাবে প্রতিটি অসামাজিক কার্যকলাপে প্রত্যেকটি মুসলমানের এক একজন সন্ত্রাসী হওয়া উচিত। আমি মনে করি, 'সন্ত্রাসী' শব্দটি এমন একজন ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যে অন্য কোন নিরীহ ব্যক্তিকে ভয়ভীতি প্রদর্শন করে। এ ক্ষেত্রে কোন মুসলমান নিরীহ কোন ব্যক্তিকে ভয় প্রদর্শন করে না।

মুসলমানদের উচিত পরিকল্পনা অনুসারে অসামাজিক কাজের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে একজন ব্যক্তিকে দু'টি ভিন্ন স্তরের কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে হয়। উদাহরণস্বরূপ, ষাট বছর পূর্বে আমরা যখন ব্রিটিশদের দ্বারা শাসিত ছিলাম, তখন কিছু ভারতবাসী তাদের স্বাধীনতার জন্য লড়েছিল। এসব ভারতবাসী ব্রিটিশ সরকারের কাছে সন্ত্রাসী নামে পরিচিত ছিল। আবার এ সকল ব্যক্তি সাধারণ ভারতবাসীর কাছে দেশপ্রেমিক ও মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে পরিচিত ছিল।[১৪৬]

নেলসন ম্যান্ডেলা, যিনি নতুন স্বাধীন দক্ষিণ আফ্রিকার রাষ্ট্রপতি ছিলেন। এর আগে শ্বেতাঙ্গদের সরকার ম্যান্ডেলাকে আখ্যায়িত করেছিল একজন সন্ত্রাসী হিসেবে। আর আফ্রিকানদের কাছে ঐ ম্যান্ডেলাই একজন বীর হিসেবে পরিচিত। একই ব্যক্তিকে শ্বেতাঙ্গরা বলল সন্ত্রাসী আর কৃষ্ণাঙ্গরা বলল বীর। একই কর্মকাণ্ড কিন্তু দু'টি ভিন্ন স্তর। আপনি যদি দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ সরকারের সাথে একমত হন যে, আপনার গায়ের রঙ আপনাকে সর্বশ্রেষ্ঠ

---

১৪৬ ডা. জাকির নায়েক, ইসলাম ও সন্ত্রাসবাদ।

www.amarboi.org

করেছে, তাহলে আপনি নেলসন ম্যান্ডেলাকে এ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সন্ত্রাসী মনে করতে পারেন। কিন্তু আপনি যদি দক্ষিণ আফ্রিকার অধিবাসীদের সাথে একমত হন যে, আপনার গায়ের রঙ আপনাকে সর্বশ্রেষ্ঠ করেনি তাহলে নেলসন ম্যান্ডেলা আপনার নিকট একজন বীর হিসেবে সম্মানিত হবেন। ১৯৯০ সালে মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির ইহুদি গুরু হেনরী কিসিঞ্জার বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার এক বার্ষিক অধিবেশনে বক্তৃতা করতে গিয়ে বলেন, 'এখন পরিস্থিতি হচ্ছে, বর্তমানে পাশ্চাত্যের সামনে নতুন দুশমন হলো ইসলাম, যা ইসলামী বিশ্ব ও আরব বিশ্বের বিশাল এলাকাজুড়ে পরিব্যাপ্ত।'

২০০১ সালের ১৫ সেপ্টেম্বরে কিসিঞ্জার দ্বিতীয় বক্তৃতায় বলেন, ইসলামী সন্ত্রাস ও চরম পন্থার বিরুদ্ধে আগামীকালের পরিবর্তে আজই যুদ্ধ শুরু করা উচিত।' 'একই তারিখে ব্রিটিশ দৈনিক সানডে টেলিগ্রাফ একটি নিবন্ধ প্রকাশ করে। যার শিরোনাম ছিলো, 'ইসলাম কি আমাদের দাফন করে দেবে?' একই তারিখে লন্ডন থেকে প্রকাশিত সানডে টাইমস তার সম্পাদকীয়তে পাশ্চাত্যের মনোযোগ আকর্ষণ করে বলেছে, উত্তর আফ্রিকা থেকে মধ্য এশিয়ার চীন পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকাজুড়ে ইসলামী ফান্ডামেন্টালিজম তথা ইসলামী মৌলবাদ ফণা তুলেছে। অতি দ্রুত এই বিষাক্ত সর্পের বিষদাঁত ভেঙে দেয়া উচিত।[১৪৭]

দীর্ঘকাল যাবৎ শব্দটির যেরূপ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা হচ্ছে তার ফলে 'জিহাদ' উন্মাদনা বা 'পাগলামির' জিহাদ ও সন্ত্রাস প্রতিশব্দে পরিণত হয়েছে। ইংরেজি ভাষায় 'জিহাদ' এর অনুবাদ Holy War (পবিত্র যুদ্ধ) করে মারাত্মক বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা হয়েছে।

Spiritual struggle

Spiritual struggle is often called the greater jihad. It denotes the spiritual struggle of each man, against vice, passion and ignorance. This understanding of jihad has been presented by Western apologetics of modern times, but until recent times, it has rarely been used by Muslims themselves.

Today, many Muslims make a claim that this is the *only* meaning of jihad, but that is a falsification promoted by Islamists, ignoring easily available historical facts.

---

১৪৭ তদেক

www.amarboi.org

Holy war- The lesser jihad is simplified to cover holy war against infidels and infidel countries, aiming at spreading Islam.

Muslim theology makes clear distinctions of the world, between the Dar al-Islam, the abode of Islam, and Dar al-Herb, the abode of war. Battling against the abode of war was a duty for a Muslim since the earliest times, since the mere existence of a world not ruled by Muslims was a constant threat to peace. By imposing Islam, an Islamic peace would replace the warlike conditions of the infidel society. In this respect, jihad could be defense, as well as unprovoked attack.

জিহাদ ও সন্ত্রাস এক নয়

জিহাদ শব্দটি শ্রুত হওয়ার সাথে সাথেই শ্রোতার কল্পনাদৃষ্টিতে এমন এক ভয়ঙ্কর ও বিভীষিকাময় দৃশ্য ভেসে ওঠে যে, ধর্ম পাগলের একটি দল যেন নগ্ন তরবারি হস্তে অগ্রসর হচ্ছে আর কাফেরদের পাওয়া মাত্র গ্রেফতার করছে এবং তাদের গর্দানে অস্ত্র রেখে বলছে, 'কালেমা পড়' নতুবা এক্ষনে খতম করা হবে। দীর্ঘদিন মুসলিম জাতির অধিকাংশ লোক ইসলাম থেকে দূরে থেকে বঞ্চিত হয়েছে ইসলামের সুমহান কল্যাণ ও প্রশান্তি থেকে। বাতিল শক্তি তথা ইহুদি-খ্রিষ্টানরা সম্মিলিত ও পরিকল্পিত অত্যাচার ও নির্যাতন দ্বারা ইসলামের উত্থানকে ঠেকানোর জন্য চালাচ্ছে চতুর্মুখী ষড়যন্ত্র। আখ্যা দিচ্ছে জিহাদকে সন্ত্রাস নামে, প্রচারণা চালাচ্ছে মুজাহিদকে সন্ত্রাসী বলে। আলিম ও শিক্ষিতরাই জাতির পথপ্রদর্শক। তারাই যদি সন্ত্রাসবাদের (?) অপবাদ শুনে হিম্মত হারিয়ে বসেন এবং সে ভয়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব থেকে বিরত থাকেন তাহলে ইসলাম বিজয়ী হবে কিভাবে?

আজ বাতিল শক্তি মুজাহিদদেরকে সন্ত্রাসী আখ্যা দিয়ে মুসলমানদের মাথার খুলি দ্বারা ফুটবল খেলছে। বয়ে চলছে মুসলমানদের রক্তের নদী। জোর গলায় শান্তি ও মানবাধিকারের দাবিদাররা সোমালিয়ায় মুসলমানদের রক্ত ঝরিয়েছে, বসনিয়া, চেচনিয়া, কাশ্মীর, আফগানিস্তান, ইরাক ও ফিলিস্তিনসহ সর্বত্রই চলছে ইসলামকে ধ্বংস করার হামলা। মুসলমানদের ধ্বংস করার জন্য অ্যাটম, হাইড্রোজেন, পরমাণু অস্ত্র, জীবাণু অস্ত্রসহ আরো কত ধরনের মারণাস্ত্র তৈরি করছে। তাদের এসব কর্ম কি সন্ত্রাস নয়?[১৪৮]

---

১৪৮ ড. মুহাম্মদ নজীবুর রহমান, ইসলামে জিহাদের বিধান, ঢাকা ঃ আধুনিক প্রকাশনী।

www.amarboi.org

অপর দিকে ইসলামের প্রিয় নবী (সা.) এর আদর্শ দেখুন। তাঁর নির্দেশের অপেক্ষায় মক্কা বিজয়ের দিন মক্কার মুশরিকদের মাথার ওপর দশ হাজার তরবারি উদ্ধত ছিল। আর তখনই তিনি ঘোষণা দিলেন-'যাও! আজ তোমরা মুক্ত'।

কুরআনে বর্ণিত জিহাদ এবং ক্ল্যাসিকাল মতবাদের জিহাদকে সন্ত্রাসবাদ থেকে সহজে পার্থক্য করা যায় বটে তবে জিহাদের প্রণীত নতুন সংজ্ঞা ঠিক সেরকম কোন নির্ধারিত বিধিকে অনুসরণ করে না। ফলে, সন্ত্রাসবাদ এবং নব্য জিহাদের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্যকরণ দুরূহ হয়ে পড়েছে। ফলে নব্য জিহাদের কৌশল এবং সন্ত্রাসবাদের সংজ্ঞা প্রায়ই এক স্থানে মিশে যাচ্ছে।

সর্বশেষ অবস্থা হলো, সন্ত্রাসবাদ কেবলই যুদ্ধ নয় বরং সে সব ন্যায়ের যুদ্ধ যেমন সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে আমেরিকার যুদ্ধ।' মধ্যযুগের মুসলিমদের জিহাদের নীতি অর্থাৎ বেসামরিক ও নিরাপরাধ মানুষ হত্যা না করার মত একই রকমের হত্যাকাণ্ড পরিচালনার যুদ্ধ। অতএব,নতুন করে ন্যায় যুদ্ধের ব্যাপারে বৃহত্তম সমঝোতা তৈরি করা এবং কী কী বিষয়কে সন্ত্রাসবাদ বলা হয় তা সুস্পষ্ট না করা পর্যন্ত মুসলিমদের যে কোন প্রতিরোধ আন্দোলনকে সন্ত্রাসবাদ বলা হবে তা সুস্পষ্ট না করা পর্যন্ত মুসলিমদের যে কোন প্রতিরোধ আন্দোলনকে সন্ত্রাসবাদ বা অন্যায় কাজ আখ্যা দেয়া অবশ্যই একটি অসাধু কর্ম।

www.amarboi.org

www.amarboi.org

চতুর্থ অধ্যায়

মুহাম্মদ (সা.)-এর ওপর সন্ত্রাস ও নির্যাতন

পৃথিবীর সর্বশেষ শ্রেষ্ঠ মহামানবের ওপর হয়েছিল অবর্ণনীয় জুলুম ও নির্যাতন। সাথে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, গালিগালাজ ও অপপ্রচারাভিযানের সাথে সাথে কোরাইশদের উন্মত্ত বিরোধিতা ক্রমশ গুণ্ডামি, সন্ত্রাস ও সহিংসতার রূপ নিত। নেতিবাচক ষড়যন্ত্রের হোতারা যখন তাদের ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ ও কুৎসা রটনাকে ব্যর্থ হতে দেখে তখন গুণ্ডামি ও সন্ত্রাসই হয়ে থাকে তাদের পরবর্তী পদক্ষেপ। মক্কাবাসী রাসূল (সা.) কে উত্ত্যক্ত করার জন্য এমন হীন আচরণ করেছে যে, তিনি ছাড়া আর কোন প্রচারক হলে সে যতই সাহসী ও উদ্যমী হোক না কেন, তার উৎসাহ উদ্দীপনা নষ্ট হয়ে যেত এবং হতাশ হয়ে বসে পড়তো। কিন্তু রাসূল (সা.) এর ভদ্রতা ও গাম্ভীর্য সকল সহিংসতা ও গুণ্ডামিকে উপেক্ষা করে সামনে এগিয়ে যাচ্ছিল।

রাসূলুল্লাহ ও তাঁর সহচরদের শত্রুতায় তারা বেসামাল হয়ে উঠলো। তারা মূর্খ ও বখাটে ধরনের লোকদের উসকিয়ে দিতে লাগলো। এসব অর্বাচীন তাঁকে মিথ্যাবাদী বলে গালাগালি এবং নানাভাবে কষ্ট দিতো। তাঁকে কবি, জাদুকর, জ্যোতিষী ও পাগল বলে অপবাদ দিতো। কিন্তু রাসূলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর দীন প্রচার ও প্রসার করার কাজে অবিচল থাকলেন। ক্রমেই তিনি অধিকতর প্রকাশ্যভাবে দাওয়াত দিতে লাগলেন। আরবদের বাতিল রসম রেওয়াজের সমালোচনা, তাদের মূর্তিপূজা প্রত্যাখ্যান ও তাদের কুফরী মতবাদের সাথে তাঁর সম্পর্কচ্ছেদের কথা তাদের কাছে ঘোর আপত্তিকর হওয়া সত্ত্বেও তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে তা করতে লাগলেন।

www.amarboi.org

আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস বলেন, "একদিন যখন কুরাইশ সরদারগণ হাজরে আসওয়াদের নিকট সমবেত হয়েছে, তখন আমি সেখানে উপস্থিত হলাম।" তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রসঙ্গে উত্থাপন করে বললো, "এই লোকটার ব্যাপারে আমরা যতটা সহিষ্ণুতা দেখিয়েছি তা নজিরবিহীন। সে আমাদেরকে বোকা বানিয়েছে এবং আমাদের দেবদেবীকে গালাগালি করেছে। অত্যন্ত নাজুক ও মারাত্মক ব্যাপারে আমরা তাকে সহ্য করেছি।" এভাবে তাদের মধ্যে আলোচনা চলতে থাকাকালে সহসা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে আবির্ভূত হলেন। শান্ত পদক্ষেপে এগিয়ে গিয়ে তিনি কা'বা তাওয়াফ করতে লাগলেন। তাদের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় কেউ কেউ বিরূপ মন্তব্য করলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়াসাল্লামের মুখমণ্ডলে আমি সে মন্তব্যের প্রতিক্রিয়া লক্ষ করলাম। দ্বিতীয়বার যখন তাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন তখন তারা আবার শ্লেষপূর্ণ মন্তব্য করলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারায় আমি তার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করলাম। তৃতীয় বার তাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় আবার তারা অনুরূপ মন্তব্য করলে তিনি সেখানে থেমে বললেন, "হে কুরাইশগণ শোন, যার হাতে আমার প্রাণ সেই মহান সত্তার শপথ করে বলছি, আমি তোমাদের সর্বনাশ বয়ে এনেছি (যদি তোমরা ঈমান না আন)।"

তাঁর উক্তিতে জনতা বজ্রাহতের ন্যায় স্তব্ধ ও হতবাক হয়ে গেল। তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি ক্ষণকাল আগেও তার বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি আক্রোশ ও উসকানিমূলক কথা বলেছে, সেও যথাসম্ভব মিষ্ট কথা বলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শান্ত করতে উদ্যত হলো। এমনকি সে বলতে বাধ্য হলো, "আবুল কাসিম, তুমি যাও। তুমি তো আর নির্বোধ নও।"

এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখান থেকে চলে গেলেন। পরদিন আবার সবাই একই স্থানে সমবেত হলো। আমিও সেখানে ছিলাম। তখন তারা বলাবলি করতে লাগলো, "দেখলে তো! মুহাম্মদের কত দূর বাড় বেড়েছে এবং সে কতদূর ধৃষ্টতা দেখালো। তোমরা যে কথা একেবারেই পছন্দ কর না তা সে তোমাদের মুখের ওপর স্পষ্ট বলে দিল। আর তোমরা তাকে ছেড়ে দিলে।"

ঠিক সেই মুহূর্তেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে আবির্ভূত হলেন। আর যার কোথায়! সকলে একযোগে তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। সবাই তাঁকে ঘেরাও করে বলতে থাকলে, "তুমিই তো আমাদের ধর্ম ও দেব-দেবীর বিরুদ্ধে আপত্তিকর কথা বলে থাকো।"

www.amarboi.org

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "হ্যাঁ, আমিই ঐসব কথা বলে থাকি।" আমি দেখলাম তাদের মধ্যে এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহকে তাঁর গলার ওপরের চাদরের দু'পাশ ধরে ফাঁস লাগিয়ে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছে। সেই মূহূর্তে হযরত আবু বাকর এগিয়ে গিয়ে বাধা দিলেন। তিনি কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, "একটি লোক আল্লাহকে নিজের রব বলে ঘোষণা করেছে, এই কারণে কি তোমরা তাঁকে হত্যা করে ফেলবে।"

এরপর জনতা সেখান থেকে চলে গেল। সেদিন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর কুরাইশদের যেরূপ মারাত্মক আক্রমণ দেখেছি, তেমন আর কখনও দেখিনি।"

যে আচরণটা একেবারেই নৈমিত্তিক ব্যাপারে পরিণত হয়েছিল, সেটা হলো, তাঁর মহল্লার অধিবাসী বড় বড় মোড়ল ও গোত্রপতি তাঁর পথে নিয়মিতভাবে কাঁটা বিছাতো, তাঁর নামাজ পড়ার সময় ঠাট্টা ও হইচই করতো, সিজদার সময় তাঁর পিঠের ওপর জবাই করা পশুর নাড়িভুঁড়ি নিক্ষেপ করতো, চাদর পেঁচিয়ে গলায় ফাঁস দিত, মহল্লার বালক-বালিকাদেরকে হাতে তালি দেয়া ও হৈ-হল্লা করে বেড়ানোর জন্য লেলিয়ে দিত এবং কুরআন পড়ার সময় তাঁকে, কুরআনকে এবং আল্লাহকে গালি দিত।

এ অপকর্মে সবচেয় বেশি অগ্রগামী ছিল আবু লাহাব ও তার স্ত্রী। এ মহিলা এক নাগাড়ে কয়েক বছর পর্যন্ত তাঁর পথে ময়লা আবর্জনা ও কাঁটা ফেলতো। রাসূল (সা.) প্রতিদিন অতি কষ্টে পথ পরিষ্কার করতেন। এই হতভাগী তাঁকে এত উত্ত্যক্ত করেছিল যে, তাঁর সান্ত্বনার জন্য আল্লাহ তায়ালা আলাদাভাবে সূরা লাহাব নাজিল করেন এবং তাতে ঐ দুর্বৃত্ত দম্পতির ঠিকানা যে দোজখে, তা জানিয়ে দেন।

এই দুর্বৃত্তই একবার নামাজের সময় তাঁর পিঠের ওপর নাড়িভুঁড়ি নিক্ষেপ করেছিল। একবার রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় এক দুরাচার তাঁর মাথায় মাটি নিক্ষেপ করে। তিনি ঐ অবস্থাতেই নীরবে বাড়ি চলে যান। শিশু ফাতেমা (রা.) তাঁর মাথা ধুয়ে দেয়ার সময় দুঃখে ও ক্ষোভে কাঁদতে থাকেন। তিনি শিশু মেয়েকে এই বলে সান্ত্বনা দেন, মাগো, তুমি কেঁদো না। আল্লাহ তোমার আব্বুকে রক্ষা করবেন।

আর একবার যখন তিনি হারাম শরীফে নামাজ পড়ছিলেন, তখন আবু জাহেল ও অপর কয়েকজন কোরাইশ সরদার তা লক্ষ্য করলো। তখন আবু জাহেলের নির্দেশে উকবা ইবনে আবু মুয়িত গিয়ে নাড়িভুঁড়ি নিয়ে এল এবং রাসূল (সা.)

www.amarboi.org

এর গায়ে নিক্ষেপ করে সবাই অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো। সেদিনও শিশু মেয়ে ফাতেমা তাঁর গা ধুয়ে পরিষ্কার করে দেন এবং উকবাকে অভিশাপ দেন।

'এক আল্লাহর আনুগত্য কর, সততা ও ইনসাফের অনুসারী হও এবং এতিম ও পথিককে সাহায্য কর'– এ সদুপদেশের প্রতিশোধ এভাবে নেয়া হয়েছিল যে, কাঁটা বিছিয়ে ইসলামী আন্দোলনের পথ রুদ্ধ করার চেষ্টা করা হলো। ময়লা আবর্জনা নিক্ষেপ করে তাওহিদ ও সদাচারের পবিত্র দাওয়াতকে সমূলে উৎখাতের অপচেষ্টা চালানো হলো। রাসূল (সা.) এর পিঠে নাড়িভুঁড়ির বোঝা চাপিয়ে ধারণা করা হলো যে, এখন আর সত্য মাথা তুলতে পারবে না। রাসূল (সা.)-এর গলায় ফাঁস লাগিয়ে জ্ঞানপাপীরা ভেবেছিল এবার অহির আওয়াজ স্তব্ধ হয়ে যাবে। যাঁকে কাঁটা বিছিয়ে অভ্যর্থনা জানানো হলো, তিনি সব সময় ফুল বর্ষণ করতে লাগলেন। যাঁর গায়ে ময়লা আবর্জনা নিক্ষেপ করা হলো, তিনি জাতিকে ক্রমাগত আতর গোলাপ বিতরণ করতে লাগলেন। যার ঘাড়ে নাড়িভুঁড়ির বোঝা চাপানো হলো, তিনি মানবজাতির ঘাড়ের ওপর থেকে বাতিলের ভূত নামিয়ে গেলেন। যার গলায় ফাঁস দেয়া হলো, তিনি সভ্যতার গলা থেকে বাতিলের রসম রেওয়াজের শেকল খুলে ফেললেন। গুণ্ডামি এক মুহূর্তের জন্যও ভদ্রতার পথ আটকাতে পারেনি। ভদ্রতা ও শালীনতার পতাকাবাহীরা যদি যথার্থই কৃতসঙ্কল্প হয়, তবে মানবেতিহাসের শাশ্বত নিয়মের পরিপন্থী সন্ত্রাস ও গুণ্ডামিকে এভাবেই চরম শাস্তি দিয়ে চিরতরে নির্মূল করতে পারে।[১৪৯]

যারা এ পথের হিমালয় পর্বত অতিক্রম করতে নেমেছে তারা পাহাড় অথবা উঁচু নিচু পথ দেখে কি ভীত? না নির্যাতন কিংবা কারাবরণ তাদের দমাতে পারেনি, পারবেও না। তাদের টার্গেট তো নিজের মুক্তি, আর পরবর্তী প্রজন্মের জন্য বাসযোগ্য সুন্দর এক পৃথিবী।

রাসূল (সা.)-এর কারাবরণ

বয়কট ও আটকাবস্থা ইসলামের শত্রুরা তাদের সকল ফন্দি-ফিকিরের ব্যর্থতা, ইসলামের অগ্রগতির ও বড় বড় প্রভাবশালী ব্যক্তির ইসলাম গ্রহণের দৃশ্য দেখে দিশাহরা হয়ে ওঠে। নবুওয়তের সপ্তম বছরের মুহররম মাসে মক্কার সব গোত্র ঐক্যবদ্ধ হয়ে বনু হাশেম গোত্রকে বয়কট করার চুক্তি সম্পাদন করলো। চুক্তিতে স্থির করা হলো যে, বনু হাশেম যতক্ষণ মুহাম্মদ (সা.) কে আমাদের হাতে সমর্পণ না করবে এবং তাকে হত্যা করার অধিকার না দেবে, ততক্ষণ কেউ

---

১৪৯ নঈম সিদ্দিকী, মানবতার বন্ধু মুহাম্মদ (সা.)

www.amarboi.org

তাদের সাথে কোন আত্মীয়তা রাখবে না, বিয়ে শাদির সম্পর্ক পাতাবে না, লেনদেন ও মেলামেশা করবে না এবং কোন খাদ্য ও পানীয় দ্রব্য তাদের কাছে পৌছাতে দেবে না। আবু তালেবের সাথে একাধিকবার কথাবার্তার পরও আবু তালেব রাসূল (সা.) কে নিজের অভিভাবকত্ব থেকে বের করতে প্রস্তুত হননি। আর তার কারণে বনু হাশেমও তার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করতে পারেনি। এই কারণে হতাশ হয়ে তারা ঐ চুক্তি সম্পাদন করে। গোত্রীয় ব্যবস্থায় এ সিদ্ধান্তটা ছিল অত্যন্ত মারাত্মক এবং চূড়ান্ত পদক্ষেপ। সমগ্র বনু হাশেম গোত্র অসহায় অবস্থায় 'শিয়াবে আবু তালেব' নামক উপত্যকায় আটক হয়ে গেল। এই আটকাবস্থার মেয়াদ প্রায় তিন বছর দীর্ঘ হয়। এই সময় তাদের যে দুর্দশার মধ্য দিয়ে কাটে তার বিবরণ পড়লে পাষাণও গলে যায়। বনু হাশেমের লোকেরা গাছের পাতা পর্যন্ত চিবিয়ে এবং শুকনো চামড়া সিদ্ধ করে ও আগুনে ভেজে খেতে থাকে। অবস্থা এত দূর গড়ায় যে, বনু হাশেম গোত্রের নিষ্পাপ শিশু যখন ক্ষুধার যন্ত্রণায় কাঁদতো, তখন বহু দূর পর্যন্ত তার মর্মভেদী শব্দ শোনা যেত। কোরাইশরা এসব কান্নার শব্দ শুনে আনন্দে আত্মহারা হয়ে যেত। সমগ্র বনু হাশেম গোত্র একমাত্র ইসলামী আন্দোলনের নেতার কারণে এহেন বন্দিদশায় নিক্ষিপ্ত হলো। বয়কট এমন জোরদার ছিল যে, একবার হযরত খাদিজার ভাতিজা হাকিম বিন হিযাম তার ভৃত্যকে দিয়ে কিছু গম পাঠিয়ে দিচ্ছিলেন। পথিমধ্যে আবু জাহেল তা দেখে গম ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করলো। ঠিক এ সময় আবুল বুখতারিও এসে গেল এবং তার মধ্যে একটু মানবিক সহানুভূতি জেগে উঠলো। সে আবু জাহেলকে বললো, আরে ছেড়ে দাও না। এছাড়া হিশাম বিন আমরও লুকিয়ে লুকিয়ে কিছু গম পাঠাতো।[১৫০]

তায়েফে ইসলামের দাওয়াত ও নির্যাতন

একদিন রাসূল (সা.) প্রত্যুষে বাড়ি থেকে বের হলেন। মক্কার বিভিন্ন অলিগলিতে ঘুরে ঘুরে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। কিন্তু পুরো দিনটা অতিবাহিত করেও তিনি সেদিন একজন লোকও এমন পেলেন না, যে তাঁর বক্তব্যে কর্ণপাত করে। সে সময় ইসলামবিরোধীরা যে নতুন কর্মপন্থা গ্রহণ করেছিল তা হলো, রাসূল (সা.) কে আসতে দেখলেই সবাই সটকে পড়তো। কারণ তাঁর কথা শুনলেই জটিলতা দেখা দেয়। বিরোধিতা করলে বা তর্কবিতর্ক করলে তার আরো বিস্তার ঘটে। এই কর্মপন্থা বেশ সফল হলো। দু-একজনের সাক্ষাৎ পেলেও তারা উপহাস অথবা গুণ্ডামির মাধ্যমে জবাব দিল। পুরো দিনটা

---

১৫০ তদেক

www.amarboi.org

বিফলে যাওয়ায় তিনি বুকভরা হতাশা ও বিষর্মতা নিয়ে বাড়ি ফিরলেন। কেউ যখন কোন ব্যক্তির উপকার করতে ও শুভ কামনা করতে এগিয়ে যায়, আর সেই ব্যক্তি ঐ উপকারী ও শুভাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিকে হত্যা করতে উদ্যত হয়, তখন উপকারী ব্যক্তিটির মন যেমন দুর্বিষহ বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে থাকে, রাসূল (সা.) এর মনের অবস্থাটাও ছিল অবিকল তদ্রূপ।

ঐ বিশেষ দিনটার অভিজ্ঞতা থেকে রাসূলের (সা.) মনে এই ধারণা দানা বাঁধে যে, মক্কার মাটি এখন ইসলামের দাওয়াতের জন্য অনুর্বর হয়ে যাচ্ছে এবং এখানে যা কিছু ফসল ফলার সম্ভাবনা ছিল, তা ইতোমধ্যেই ফলেছে। পরবর্তী সময় পরিস্থিতির ক্রমশ অবনতি ঘটতে থাকায় তাঁর এ ধারণা সঠিক বলে প্রমাণিত হয়। সম্ভাবনাময় সর্বশেষ মানুষগুলো তখন রাসূলের (সা.) চার পাশে সমবেত হয়ে গেছে। সম্ভবত ঐ দিন থেকেই তাঁর মনে এই ভাবনা প্রবলতর হতে থাকে যে, এখন মক্কার বাইরে গিয়ে কাজ করা উচিত।

এ ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েই রাসূল (সা.) মক্কার আশপাশে কাজ করার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি তায়েফকে দাওয়াতের নতুন ক্ষেত্র হিসেবে বেছে নেন। যায়েদ বিন হারেসাকে সাথে নিয়ে একদিন তিনি মক্কা থেকে পায়ে হেঁটে রওনা হন। পথিমধ্যে যেসব গোত্রের বসতবাড়ি দেখতে পান তাদের সবার কাছে আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত দেন। আসা-যাওয়ায় তাঁর প্রায় এক মাস সময় অতিবাহিত হয়ে যায়।

বিশ্বমানবের পরম সুহৃদ মুহাম্মদ (সা.) তায়েফ পৌঁছে সর্বপ্রথম সাকিফ গোত্রের সরদারদের সাথে সাক্ষাৎ করলেন। তারা ছিল তিন ভাই– আবদ ইয়ালিল, মাসউদ ও হাবিব। তাদের প্রত্যেকের ঘরে কোরাইশ বংশোদ্ভূত বনু জামাহ গোত্রের এক একজন স্ত্রী ছিল। সে হিসেবে তিনি আশা করেছিলেন যে, তারা কিছুটা সৌজন্যপূর্ণ আচরণ করতে পারে। রাসূল (সা.) তাদের কাছে গিয়ে বসলেন, তাদেরকে সর্বোত্তম ভাষায় আল্লাহর দিকে দাওয়াত দিলেন, দাওয়াতের বিশদ ব্যাখ্যা দিয়ে আলোচনা করলেন এবং আল্লাহর সত্য দ্বীন প্রতিষ্ঠায় তাদের সাহায্য ও সহযোগিতা কামনা করলেন। কিন্তু এই তিন ব্যক্তি কেমন জবাব দিল দেখুন :

এক ভাই বললো : সত্যি যদি আল্লাহই তোমাকে পাঠিয়ে থাকেন, তাহলে বুঝতে হবে তিনি কা'বা ঘরের গেলাফের অবমাননা করতে চান।

দ্বিতীয় ভাই : কী আশ্চর্য! আল্লাহ তাঁর রাসূল বানানোর জন্য তোমাকে ছাড়া আর কোন উপযুক্ত লোক পেলেন না!

www.amarboi.org

তৃতীয় ভাই : আল্লাহর কসম, আমি তোমার সাথে কথাই বলবো না। কেননা তুমি যদি তোমার দাবি মোতাবেক সত্যি সত্যিই আল্লাহর রাসূল হয়ে থাক, তাহলে তোমার মত লোককে জবাব দেয়া ভীষণ বেআদবি হবে। আর যদি তুমি আল্লাহর ওপর মিথ্যা আরোপ করে থাক, তাহলে তোমার সাথে কথা বলা যায় এমন যোগ্যতাই তোমার নেই।'

এর প্রতিটি কথা রাসূলের (সা.) বুকে বিষমাখা তীরের মতো বিদ্ধ হতে লাগলো। তিনি পরম ধৈর্যসহকারে মর্মঘাতী কথাগুলো শুনলেন এবং তাদের কাছে সর্বক্ষেত্রে অনুরোধ রাখলেন যে, তোমরা তোমাদের এ কথাগুলোকে নিজেদের মধ্যেই সীমিত রাখ এবং জনসাধারণকে এসব কথা বলে উসকে দিও না।

কিন্তু তারা ঠিক এর উল্টোটাই করলো। তারা তাদের শহরের সবচেয়ে নিকৃষ্ট বখাটে তরুণদেরকে, চাকর নফর ও গোলামদেরকে রাসূলের পেছনে লেলিয়ে দিল এবং বলে দিল যে, যাও, এই লোকটাকে লোকালয় থেকে তাড়িয়ে দিয়ে এসো।' বখাটে যুবকদের এক বিরাট দল আগে-পিছে গালি দিতে দিতে, হইচই করতে করতে ও পাথর ছুড়ে মারতে মারতে চলতে লাগলো। তারা তাঁর হাঁটু লক্ষ্য করে করে পাথর মারতে লাগলো, যাতে তিনি বেশি ব্যথা পান। পাথরের আঘাতে আঘাতে এক একবার তিনি অচল হয়ে বসে পড়ছিলেন। কিন্তু তায়েফের গুণ্ডারা তার বাহু টেনে ধরে দাঁড় করাচ্ছিল। এবং পুনরায় হাঁটুতে পাথর মেরে হাতে তালি দিয়ে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ছিল। ক্ষতস্থানগুলো থেকে অঝোর ধারায় রক্ত ঝরছিল। এভাবে জুতোর ভেতর ও বাইরে রক্তে রঞ্জিত হয়ে গেল। আর এই নিষ্ঠুর তামাশা দেখার জন্য জনতার ভিড় জমে গেল। গুণ্ডারা এভাবে তাকে শহর থেকে বের করে এক আঙুরের বাগানের কাছে নিয়ে এল। বাগানটা ছিল রবিয়ার ছেলে উতবা ও শায়বার। রাসূল (সা.) একেবারে অবসন্ন হয়ে একটা আঙুর গাছের সাথে হেলান দিয়ে বসলেন। বাগানের মালিক তাঁকে দেখছিল এবং ইতঃপূর্বে তাঁর ওপর যে অত্যাচার হচ্ছিল, তাও কিছুটা প্রত্যক্ষ করেছিল।

এখানে দু'রাকাত নামাজ পড়ে তিনি নিম্নের মর্মস্পর্শী দোয়াটা করলেন :

'হে আল্লাহ! আমি আমার দুর্বলতা, সম্বলহীনতা ও জনগণের সামনে অসহায়ত্ব সম্পর্কে কেবল তোমারই কাছে ফরিয়াদ জানাই। দরিদ্র ও অক্ষমদের প্রতিপালক তুমিই। তুমিই আমার মালিক। তুমি আমাকে কার কাছে সঁপে দিতে চাইছ? আমার প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে, নাকি শত্রুর কাছে? তবে তুমি যদি আমার ওপর অসন্তুষ্ট না থাক, তাহলে আমি কোন কিছুর পরোয়া করি না। কিন্তু তোমার পক্ষ থেকে শান্তি ও নিরাপত্তা পেলে সেটাই আমার জন্য

www.amarboi.org

অধিকতর প্রশান্তি। আমি তোমার কোপানলে অথবা আজাবে পতিত হওয়ার আশঙ্কা থেকে তোমার সেই জ্যোতি ও সৌন্দর্যের আশ্রয় কামনা করি, যার কল্যাণে সকল অন্ধকার দূরীভূত হয় এবং দুনিয়া ও আখেরাতের সকল সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। তোমার সন্তোষ ছাড়া আমি আর কিছু কামনা করি না। তোমার কাছ থেকে ছাড়া আর কোথাও থেকে কোন শক্তি পাওয়া সম্ভব নয়।

তায়েফে রাসূল (সা.) এর যে দুরবস্থা হয়েছিল, ইতিহাসের ভাষা আমাদেরকে তার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দিতে পারেনি। একবার হযরত আয়েশা (রা.) জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "হে রাসূলুল্লাহ, আপনি কি ওহুদের চেয়েও কঠিন দিনের সম্মুখীন কখনো হয়েছেন?" তিনি জবাব দিলেন : "তোমার জাতি আমাকে আর যত কষ্টই দিয়ে থাকুক, আমার জন্য সবচেয়ে কষ্টকর দিন ছিল তায়েফে যেদিন আমি আবদ ইয়ালিলের কাছে দাওয়াত দিলাম। সে তা প্রত্যাখ্যান করলো এবং এত কষ্ট দিল যে, অতি কষ্টে কারনুস সায়ালেব নামক জায়গায় পৌঁছে কোন রকমে রক্ষা পেলাম।" (আল মাওয়াহিবুল লাদুননিয়া, প্রথম খণ্ড, ৫৬ পৃ:)

নির্যাতনের চোটে অবসন্ন ও সংজ্ঞাহীন হয়ে যাওয়ার পর যিনি রাসূল (সা.) কে ঘাড়ে করে শহরের বাইরে নিয়ে এসেছিলেন, সেই যায়েদ বিন হারেসা ব্যথিত হৃদয়ে বললেন, আপনি এদের বিরুদ্ধে আল্লাহর কাছে বদদোয়া করুন। রাসূল (সা.) বললেন, 'আমি ওদের বিরুদ্ধে কেন বদদোয়া করবো? ওরা যদি আল্লাহর ওপর ঈমান নাও আনে, তবে আশা করা যায়, তাদের পরবর্তী বংশধর অবশ্যই একমাত্র আল্লাহর এবাদত করবে।"

এই সফরকালেই জিবরাইল (আ.) এসে বলেন, পাহাড়সমূহের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতারা আপনার কাছে উপস্থিত। আপনি ইঙ্গিত করলেই তারা ঐ পাহাড় দুটোকে এক সাথে যুক্ত করে দেবে, যার মাঝখানে মক্কা ও তায়েফ অবস্থিত। এতে উভয় শহর পিষ্ট ও ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু মানবতার বন্ধু মহান নবী এতে সম্মত হননি।

এহেন নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতিতেই জিনেরা এসে রাসূল (সা.) এর কুরআন তেলাওয়াত শোনে এবং তাঁর সামনে ঈমান আনে। এর মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা রাসূল (সা.) কে জানিয়ে দিলেন যে, দুনিয়ার সকল মানুষও যদি ইসলামের দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করে, তবে আমার সৃষ্ট জাগতে এমন বহু জীব আছে, যারা আপনার সহযোগিতা করতে প্রস্তুত।[১৫১]

---

১৫১ তদেক

www.amarboi.org

রাসূল (সা.) এর বিরুদ্ধে নোংরা অপপ্রচার

ইসলামী আন্দোলনের আদর্শ ও উদ্দেশ্যকে যখন কোন দিক দিয়েই হামলা করে ক্ষতিগ্রস্ত করার সুযোগ পাওয়া যায় না, তখন শয়তান তাকে পিঠের দিক দিয়ে আঘাত করার প্ররোচনা দেয়। আর শয়তানের দৃষ্টিতে পিঠের দিক দিয়ে আঘাত করার সর্বোত্তম পন্থা হলো, এর নেতার ব্যক্তিত্ব ও নেতৃত্বের ওপর কলঙ্ক লেপন করা। এ জন্যই এক পর্যায়ে ক্ষমতার মোহ এবং স্বার্থপরতার জঘন্য অপবাদ আরোপ করা হয় রাসূল (সা.) এর বিরুদ্ধে। এরপর অপপ্রচারণার এই ধারা আরো সামনে অগ্রসর হয় এবং ইসলামী আন্দোলনের সর্বোচ্চ নেতার পরিবারকে লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা হয়। আর এই পরিবারের কেন্দ্রের ওপর আঘাত হানাই ছিল ঐ অবকাঠামোকে ধ্বংস করার সবচেয়ে কার্যকর উপায়। শেষ পর্যন্ত নাশকতাবাদী শক্তি এই শেষ আঘাতটা হানতেও দ্বিধা করলো না। এই বৈরী আঘাতের মর্মন্তুদ কাহিনী কুরআন, হাদিস, ইতিহাস ও সিরাতের গ্রন্থাবলিতে "ইফকের ঘটনা" তথা "হযরত আয়েশার বিরুদ্ধে অপবাদের কাহিনী" নামে শিক্ষা গ্রহণের জন্য সংরক্ষিত রয়েছে।

এমন জঘন্য অপবাদের ভয়াবহ তাণ্ডব ইসলামী আন্দোলনের গড়া সৎ ও পুণ্যময় সমাজে এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সুসংগঠিত দলের অভ্যন্তরে সৃষ্টি হতে পারলো কিভাবে? কোন্ ছিদ্রপথ দিয়ে এই ভয়াবহ ঝড় ইসলামী সংগঠনের সুরক্ষিত দুর্গে ঢুকলো এবং কিছু সময়ের জন্য তা চরম বিভীষিকার সৃষ্টি করার সুযোগ পেল?

ইসলামী আন্দোলনের সাংগঠনিক ব্যবস্থা ছিল আগাগোড়া একটা নৈতিক ব্যবস্থা। এ পরিবেশটা শয়তানের কাজ করার জন্য সবচেয়ে প্রশস্ত ও উত্তম ক্ষেত্র। বিশেষত এর দুটো দিক বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারীদের অনুকূল। নৈতিক ব্যবস্থার একটা বিশেষ জটিলতা হলো, এতে সুস্পষ্ট আপত্তিকর ঘটনাবলি যতক্ষণ প্রামাণ্য তথ্যের আকারে আবির্ভূত না হয়, ততক্ষণ তার বিরুদ্ধে সংগঠনও কোন ব্যবস্থা নিতে পারে না, আর যারা বিব্রত বোধ করে, তারাও শেষ ফল বের হওয়ার আগে পরিস্থিতির ধাঁধালো পটভূমিকে জনসমক্ষে প্রকাশ করতে পারে না। ইসলামের নৈতিক বিধান ইসলামী সমাজের সদস্যদেরকে একে অপরের প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করতে নিষেধ করে। একজন ন্যায়নিষ্ঠ মানুষ তাঁর সাথীদের প্রতিটি সন্দেহজনক কার্যকলাপের যতদূর সম্ভব ভালো ব্যাখ্যা দিতে বাধ্য হয়ে থাকে। অতঃপর সে যদি একটা অবাঞ্ছিত ঘটনার সমস্ত তথ্য পর্যালোচনা করে আপন অন্তরের গভীরে একটা খারাপ ধারণা পোষণ করেও বসে, তাহলেও তাকে এ জন্য দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয় যে, তার খারাপ ধারণাকে খণ্ডন করার মত পাল্টা কোনো তথ্য পাওয়া যায় কি না?

www.amarboi.org

নিছক ধারণা, চাই তা যতই দৃঢ় হোক না কেন, তার ভিত্তিতে কারো বিরুদ্ধে কোন আনুষ্ঠানিক মামলা পরিচালনা করা ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে আসামির কাঠগড়ায় দাঁড় করানো যায় না। এসব কারণে মদিনার নিষ্ঠাবান মুসলমানরা গোপন সলাপরামর্শে লিপ্ত ফেতনাবাজ ও নৈরাজ্যবাদী লোকদের প্রাথমিক তৎপরতাকে কিছু অবাঞ্ছিত আলামত বলে প্রত্যক্ষ করা সত্ত্বেও নীরব দর্শক হয়ে দেখতে বাধ্য ছিলেন। তবে ফেতনা যখন যথারীতি ফসল ফলাতে শুরু করতো, কেবল তখনই সমাজের নৈতিক ব্যবস্থা তাদেরকে তার বিরুদ্ধে কথা বলার অনুমতি দিত এবং সামষ্টিক ব্যবস্থাকে সক্রিয় করার সুযোগ দিত।

নৈতিক ব্যবস্থার দ্বিতীয় জটিলতা ছিল এই যে, সংগঠনের সর্বোচ্চ নেতা ও অন্যান্য দায়িত্বশীলদের ওপর যদি কেউ অভিযোগ আরোপ করে, তাহলে তাদের অবস্থা খুবই নাজুক হয়ে পড়ে। একদিকে তাদের হাতে দলের প্রশাসনিক কর্তৃত্ব থাকে এবং তারাই সমস্ত ফেতনা তথা অরাজকতা ও বিভ্রান্তি খতম করার ক্ষমতা রাখেন। অপর দিকে তারাই ফেতনার শিকার হয়ে এমন অবস্থায় পতিত হন যে, মুসলিম জনগণের সামনে ফেতনাবাজ তথা হাঙ্গামা সৃষ্টিকারীদের মুখোশ খুলে যাওয়ার আগে তাদের বিরুদ্ধে যদি নেতারা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, তাহলে উল্টো নেতারাই সমালোচনা ও ভিন্নমত দমনের দায়ে অভিযুক্ত হন। তারা সত্যের আওয়াজ বুলন্দকারীদেরকে স্বৈরাচারী পন্থায় পরাভূত করার দোষে দোসী সাব্যস্ত হন। ব্যক্তির ক্ষেত্রে যেমন বলা যায় যে, ভদ্রতা সবচেয়ে বড় শক্তি হলেও ভদ্রতা সবচেয়ে বড় জটিলতাও বটে। এই জটিলতার একমাত্র সমাধান হলো, দলের সামষ্টিক মনমানসকে এত সজাগ ও সচেতন হতে হবে এবং তার সামষ্টি চরিত্রকে এত বলিষ্ঠ ও মজবুত হতে হবে যে, সে নিজের মেজাজ বা স্বভাবের বিরুদ্ধে কোন কিছুকেই দলের অভ্যন্তরে চালু থাকতে দেবে না। দলীয় পরিমণ্ডলে কেউ দলীয় শৃঙ্খলাবিরোধী কানাঘুষা, ফিসফিসানি, গুজব বা গোপন সলাপরামর্শে কর্ণপাত করতে প্রস্তুত হবে না, কর্ণগোচর হওয়া এ ধরনের কোন বিষয়কে কেউ এদিকে সেদিকে ছড়ানোর ধৃষ্টতা দেখাবে না। কিন্তু এই চূড়ান্ত ও উৎকৃষ্টতম মানদণ্ডে কোন দলের সামগ্রিকভাবে ও পরিপূর্ণভাবে উত্তীর্ণ হওয়া এবং উত্তীর্ণ হয়ে সর্বক্ষণ টিকে থাক কঠিন। মনমগজ দ্বারা কুচিন্ত করা, মুখ দিয়ে কুপ্ররোচনা দান ও খারাপ বিষয়ে ফুসলানো এবং কান দিয়ে এসব অবাঞ্ছিত জিনিস শোনা-ইত্যাকার কর্মকাণ্ডে লিপ্ত মানুষ থেকে কোন মানবসমাজ পুরোপুরি মুক্ত ও পবিত্র হতে পারে না। মানুষ যা ভাবে, যা বলে ও যা শোনে, তাতে শয়তান কিছু না কিছু অংশগ্রহণ না করেই ছাড়ে না।

www.amarboi.org

নৈতিক ব্যবস্থার এই নমনীয়তা ও উদারতা থেকে মোনাফেকরা পুরোপুরিভাবে উপকৃত হয়েছে এবং এর সুযোগ সুবিধা ভোগ করেছে। কিন্তু পরিণামে তারা এর প্রবল শক্তির পাকড়াও থেকে বাঁচতে পারেনি। কুরআনের ভাষায় তাদের সমগ্র কর্মকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত সার ছিল এই : "তারা যা চেয়েছিল, তা পায়নি।" কিন্তু ইসলামী সংগঠনকে বিব্রত অবশ্যই করেছে এবং তাকে বিশৃঙ্খলায় অবশ্যই ফেলেছে।

গোপন সলাপরামর্শ, গুজব রটনা, কানাঘুষা ও ফিসফিসানির এই পরিবেশে ইসলামী আন্দোলনের প্রধানতম নেতার ব্যক্তিত্ব শুরু থেকেই আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছিল এবং একের পর এক আক্রমণ চালানোও হচ্ছিল। এহেন পরিবেশে নাশকতাবাদী কুচক্রী ফেতনাবাজদের ভাগ্য যদি সুপ্রসন্ন হয়, তাহলে কুটিল থেকে কুটিলতর এবং জঘন্য থেকে জঘন্যতর অপবাদ রটনা করে কোন প্রলয়ঙ্করী বিপর্যয় ঘটিয়ে দেয়াও তাদের পক্ষে কিছুমাত্র অসম্ভব ছিল না। এই নমনীয় পরিবেশের সুযোগ গ্রহণ ও মোনাফেকদেরকে দক্ষতার সাথে কাজে লাগানোর জন্য শয়তানের দ্বিতীয় যে জিনিসটির প্রয়োজন ছিল, তা হলো এমন একজন ঝানু খলনায়ক, যার মস্তিষ্ক কুটিল চক্রান্ত উদ্ভাবনে অত্যন্ত সৃজনশীল ও দক্ষ হবে, এবং যার বুকে গোপন সলাপরামর্শকারীদের সৃষ্টি করা বারুদের স্তূপে জ্বলন্ত অঙ্গার নিক্ষেপের সাহস থাকবে। এ ধরনের একজন ঝানু খলনায়ক আব্দুল্লাহ বিন উবাইয়ের আকারে আগে থেকেই তৈরি ছিল। এই লোকটার মন নিজের ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদার অনুভূতিতে কানায় কানায় পূর্ণ ছিল। কেনই বা থাকবে না? হিজরতের প্রাক্কালে মদিনার বাদশাহীর মুকুট তো তারই মাথায় পরানোর প্রস্তুতি চলছিল। কেবল মুহাম্মদ (সা.) এর উপস্থিতি তার আশার গুড়ে বালি দিল। বাদশাহী দূরে থাক, নিজের চরিত্রের কারণে ইসলামী সংগঠনের প্রথম সারির তো নয়ই, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সারির মর্যাদাও তার কপালে জোটেনি। এই দুর্ঘটনা তার মনমস্তিষ্কে অত্যন্ত তিক্ত ও বিষময় প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং সেই প্রতিক্রিয়া থেকে মুহূর্তে জন্ম নিতে থাকে নতুন নতুন ফেতনা, নতুন নতুন ষড়যন্ত্র। শয়তান মানুষের ভেতরে প্রত্যক্ষভাবে খুব বেশি কাজ করে না। তার প্রয়োজন হয়ে থাকে তার বশংবদ মানুষ-শয়তানদের। আর এই মানুষ শয়তানদেরকে আল্লাহর দ্বীনের বিরুদ্ধে তৎপর রাখার জন্য তার প্রয়োজন হয় একজন যুতসই নেতার, একজন ষড়যন্ত্র বিশারদ নেতার। শয়তান এ ধরনের একজন যুতসই ষড়যন্ত্র বিশারদ নেতা রেডিমেড পেয়ে গেল। সে ছিল আবার ইসলামী আন্দোলনের বৃত্তের ভেতরেরই লোক। এই লোকটা একদিকে নবীর নেতৃত্বে পরিচালিত আন্দোলনকে মেনে নেয়ার ঘোষণাও দিয়েছিল, অপর দিকে প্রতিনিয়ত ঐ আন্দোলনের বিরুদ্ধে সন্ত্রাতেও লিপ্ত ছিল।

www.amarboi.org

ঝোপ বুঝে কোপ মারায় অভিজ্ঞ এই দাম্ভিক কূচক্রী খলনায়কটি এক ঐতিহাসিক মুহূর্তে নিজের বুকের ভেতরে জ্বলন্ত হিংসার অগ্নিকুণ্ড থেকে একটা দগদগে অঙ্গার বের করে রাসূল (সা.) এর পবিত্র পারিবারিক অঙ্গনে নিক্ষেপ করলো। নিক্ষেপ করার সাথে সাথেই গোটা সমাজ মানসিকভাবে দগ্ধ হতে লাগলো।

ভূতের মতো চারদিক দিয়ে ঘিরে ধরে, দূরবীক্ষণ ও অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে তাদের দোষ অন্বেষণের চেষ্টা করে। তাদের প্রতিটা কথা, কাজ ও ঘটনার চুলচেরা বিশ্লেষণ করে। তারপর বিন্দু পরিমাণ কোন বক্রতা বা ত্রুটি খুঁজে পেলেই ঢেড়া পিটিয়ে প্রচার করতে আরম্ভ করে যে, "ওহে জনমণ্ডলী! দেখ, এরা গোমরাহি, বিকৃতি ও কুফরিতে লিপ্ত। অমুক কাজ প্রাচীন মনীষীদের বিরোধী, বড় বড় ইমামদের অবমাননা, বড় বড় বুযুর্গের সমালোচনা। অন্ধ বিরোধিতার আবেগে যখন কোন ভালো লোকের ও তার জনহিতকর কাজের ক্ষতি সাধন করা কাঙ্ক্ষিত হয়, তখন একদিকে প্রত্যেক ভালো কাজের দোষত্রুটি বের করে দেখানো হয়। অপর দিকে যারা কাজ করে, তদের সামান্য ভুলত্রুটি হলেও তিলকে তাল বানিয়ে জনসমক্ষে প্রকাশ করে জনমতকে ক্ষেপিয়ে তোলা হয়। নাশকতাবাদীদের সবচেয়ে বড় সুযোগ হয়ে থাকে তখন, যখন কোন ঘটনা সাধারণ মানুষের ভ্রান্ত ধ্যান-ধারণা, কুসংস্কার ও কুপ্রথা ইত্যাদির বিরুদ্ধে ঘটে যায়। তখনই তারা তিলকে তাল বানিয়ে কাজে লাগায়।

পদলোভের অভিযোগ

সত্যের নিশানবাহী মাত্রেরই আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার ওপর একটা না একটা স্বার্থের কালিমা লেপনের জন্য বিরোধীরা প্রত্যেক যুগেই অপবাদ আরোপ করে থাকে যে, উনি একজন পদলোভী ব্যক্তি। উনি একটা বড় কিছু হতে চান। হযরত মূসা (আ.) ও হারুন (আ.)-এর রিরুদ্ধে এই অভিযোগই তোলা হয়েছিল যে, তারা রাষ্ট্রীয় গদি দখল করতে চান। হযরত ঈসা (আ.)-এর বিরুদ্ধে কুৎসা রটানো হয় যে, উনি ইহুদিদের বাদশাহ হতে চান। নাজরানের প্রতিনিধিদল যখন এলো, তখন ইহুদিরা রাসূল (সা.) এর ওপর অপবাদ আরোপ করলো যে, ঈসা (আ.) এর যে মর্যাদা ছিল, সেটা দখল করার জন্যই উনি এত মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলছেন। উনি চান খ্রিষ্টানরা ও অন্যরা তাঁর পূজা করতে লেগে যাক। লক্ষ্য করুন, রাসূল (সা.) কখনো এ ধরনের কোন দাবিই করেননি। এ ধরনের কোন গদি বা পদ লাভের ইচ্ছার আভাসও দেননি। অথচ বিরোধীদের উর্বর মস্তিষ্ক থেকে এমন কাল্পনিক অভিযোগ গড়া হলো এবং আবিষ্কার করা হলো যে, মুহাম্মদ (সা.) এর উদ্দেশ্য এটাই হবে যে, ঈসা (আ.)-এর মত নিজের পূজা করাবেন। মুখে দাবি করেননি, তাতে কী? তাঁর অন্তরে নিশ্চয়ই এই দাবি রয়েছে।

www.amarboi.org

আন্দোলনের অভ্যন্তরে বিভ্রান্তি সৃষ্টি

শয়তানের জন্য কোন সমাজে সবচেয়ে অনুকূল পরিবেশ হয়ে থাকে গোপন সলাপরামর্শ ও ফিসফিসানির পরিবেশ। কোন সমষ্টির ব্যবস্থায় যখন সমগ্র জনতার সামনে খোলাখুলি মতামত, পরামর্শ, সমালোচনা ও প্রশ্ন করার পরিবর্তে বিভিন্ন ব্যক্তি আলাদা আলাদাভাবে বসে গোপন সলাপরামর্শ করে, তখনই এই পরিবেশের সৃষ্টি হয়। কুরআনে এ জিনিসটাকে 'নাজওয়া' নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। বস্তুত নাজওয়া আসলে সামষ্টিক জীবনে একটা বিপজ্জনক পথে যাত্রা শুরু করার নাম। প্রকাশ্যে কাজ করতে মানুষ যখন সংকোচ বোধ করে তখন বুঝতে হবে এর পেছনে কিছু ব্যাপার অবশ্যই আছে। স্বচ্ছতা এড়িয়ে গোপন সলাপরামর্শ ও ফিসফিসানির এই প্রবণতাই শেষ পর্যন্ত ষড়যন্ত্র ও যোগসাজশে রূপান্তরিত হয়।

দুর্ভাগ্যবশত রাসূল (সা.) এর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত আন্দোলনের ভেতরে ইহুদিদের নেতৃত্বে মোনাফেকরা এই ফিসফিসানির পরিবেশ সৃষ্টি করে এবং তা আন্দোলনের নেতা ও কর্মীদের অনবরতই বিব্রত করতে থাকে। যারা এই পরিবেশ সৃষ্টি করছিল, কুরআন তাদেরকেও সংশোধন করতে থাকে। আর ইসলামী সংগঠনের পরিচালকদেরকেও সতর্ক করতে থাকে। কুরআন বলে :

"তোমরা দেখতে পাও না, যাদেরকে গোপন সলাপরামর্শ থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছিল, তারা আবারো সেই নিষিদ্ধ কাজের পুনরাবৃত্তি করছে তারা পরস্পরে অপকর্ম, অহঙ্কার ও রাসূলের বিরুদ্ধাচরণের ব্যাপারে গোপন পরামর্শে লিপ্ত থাকে।" (সূরা মুজাদালা-৮)

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখনই পৃথকভাবে পরস্পর পরামর্শ কর তখন অসৎ কাজ, অহঙ্কার ও রাসূলের অবাধ্যতার পরিকল্পনা করো না। বরং সততা ও খোদাভীতির জন্য পরামর্শ কর।" (সূরা মুজাদালা-১)

"ফিসফিসানি মুমিনদেরকে উত্ত্যক্ত করার জন্য পরিচালিত শয়তানী কাজ। অবশ্য আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোন জিনিসই তাদের ক্ষতি করতে পারে না।" (সূরা মুজাদালা-১০)

"এই সব গোপন পরামর্শকারীরা মানুষের চোখের আড়ালে যেতে পারে, কিন্তু আল্লাহর চোখ থেকে লুকাতে পারে না। তারা যখন রাতের অন্ধকারে ও নিভৃতে আল্লাহর অপছন্দনীয় কথাবার্তা বলে, তখন আল্লাহ তাদের সাথে থাকেন।" (সূরা নিসা-১০৮)

"গোপন সলাপরামর্শের জন্য যখনই তিনজন মানুষ একত্রিত হবে, তখন সেখানে আল্লাহ হয়ে থাকেন চতুর্থজন, পাঁচজন জমায়েত হলে আল্লাহ হন তাদের ষষ্ঠ

www.amarboi.org

জন এবং এর চেয়ে কম বা বেশি সংখ্যক জমায়েত হলেও আল্লাহ অবশ্যই তাদের সাথে থাকেন, চাই তারা যেখানেই থাক না কেন।" (সূরা মুজাদালা-৭)

"তারা মুখে বলে আমরা (সামষ্টিক ফায়সালা ও নেতার আদেশের) আনুগত্য করবো। কিন্তু যখন তারা তোমার কাছ থেকে বের হয়, তখন তাদের একটা দল রাতের বেলা তোমার কথাগুলোর বিরুদ্ধে সলাপরামর্শে লিপ্ত হয়। আর আল্লাহ তাদের পরিকল্পনাগুলো লিখে রাখেন।" (সূরা নিসা-৮)

এ আয়াতগুলোতে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে দেয়া হয়েছে, ইসলামী সমাজ, রাষ্ট্র ও সংগঠন সামষ্টিকভাবে যে স্থিরকৃত নীতিমালার ভিত্তিতে চলে এবং যেসব সামাজিক ফায়সালা ও দলীয় ঐতিহ্য চালু থাকে, তার সমর্থন, আনুগত্য, বাস্তবায়ন ও স্থায়িত্ব নিশ্চিত করার জন্য লোকেরা আলাদাভাবে পরস্পর গোপন বা প্রকাশ্যে স্বাধীনভাবে আলাপ আলোচনা করতে পারে। কিন্তু এগুলোকে অমান্য করা, দ্বিমত পোষণ করা, ব্যর্থ করা, এগুলোর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সংঘটিত করা, আপত্তি তোলা ও ব্যর্থ করে দেয়ার জন্য পরস্পরে আলাদা হয়ে গোপন পরামর্শ করা ও কানাঘুষা করা এমন জঘন্য গুণাহ, যা এসব ব্যক্তির চরিত্র ও পরিণামকে ধ্বংস করে দেয় এবং গোটা সামষ্টিক ব্যবস্থাকে বিব্রত ও সমস্যার জর্জরিত করে। গোপন বিদ্রোহী কানাঘুষা ও ফিসফিসানির আসল প্ররোচনাদাতা শয়তান। এই প্ররোচনা থেকে কুরআন ইসলামী সংগঠনকে সাবধান করে দিয়েছে।

উদাহরণস্বরূপ, পরবর্তীকালে যখন জাকাত আদায় ও বন্টনের ব্যবস্থা আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হলো, তখন রাসূল (সা.) এর ওপর একটা হীন অপবাদ এই মর্মে আরোপ করা হলো যে, তিনি বাইতুলমালে জমাকৃত জাকাত সদকার অর্থ নিজের খেয়ালখুশি মোতাবেক আত্মসাৎ করে ফেলেন। ব্যাপারটা ছিল এই যে, সকল সঞ্চিত সম্পত্তি, বাণিজ্যিক পুঁজি, গবাদিপশু ও কৃষিজাত সম্পদ থেকে যখন নিয়মিতভাবে জাকাত ও উশর আদায় করা হতে লাগলো, তখন বিপুল সম্পদ একই কেন্দ্রে জমা হতে লাগলো এবং রাসূল (সা.) এর হাতে তা বণ্টিত হতে লাগলো। ধনসম্পদের এই বিপুলাকৃতির স্তূপ দেখে ধনলোভীরা লালায়িত হয়ে উঠতো। তারা চাইতো জাহেলি যুগের ন্যায় আজও এই সম্পদ তাদের ন্যায় ধনাঢ্যদের হাতেই কেন্দ্রীভূত হোক। কিন্তু ইসলামী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পদকে দারিদ্র্যমুখী করে দেয়। বিত্তশালীরা এই বৈপ্লবিক পরিবর্তনে দারুণ অসন্তুষ্ট ছিল। তারা ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ওপর তো আক্রমণ চালাতে পারতো না, যা তাদের পকেট ভর্তি করার পরিবর্তে তাদেব কাছ থেকে আইনের জোরে 'জাকাত' নামক 'জরিমানা' আদায় করছিল। তারা মনের আক্রোশ মেটানোর জন্য রাসূল (সা.) কে আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করতো। তারা বলতো, রাসূল (সা.) নিজের সমর্থক ও আত্মীয় স্বজনের পেছনে

www.amarboi.org

সম্পদ ব্যয় করছেন এবং বিশেষভাবে মোহাজেরদের অকাতরে দান করছেন। অন্য কথায়, ইসলামী রাষ্ট্রের সরকারি কোষাগারের অর্থে পরিবার পরিজন ও স্বজন তোষণ করছেন। আল্লাহর নামে সাধারণ মানুষের কষ্টার্জিত সম্পদ কেড়ে নিচ্ছেন এবং সেই অর্থ নিজের প্রভাব প্রতিপত্তি ও আধিপত্য বিস্তারে ব্যয়িত হচ্ছে। সরকারি কোষাগারের অর্থ সম্পর্কে যে কোন শাসনব্যবস্থায় শাসকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আরোপিত হলে তা গুরুতর আকার ধারণ করে। কিন্তু বিশেষভাবে একটা ধর্মীয় ও নৈতিক সমাজ ব্যবস্থায়, যেখানে কোষাগারকে আল্লাহর সম্পদ বলা হয়ে থাকে এবং যার প্রতিটি আয়-ব্যয় আল্লাহর নামে এবং আল্লাহর বিধান অনুসারে পরিচালিত হয়ে থাকে, সেখানে এ ধরনের অভিযোগ থেকে নিদারুণ উত্তেজনার সৃষ্টি করা সম্ভব।

ভাববার বিষয় হলো, এ অপবাদ সেই আদর্শ মানবের বিরুদ্ধে আরোপ করা হচ্ছে যিনি জাকাত সরকার অর্থকে শুধু নিজের ও নিজের পরিবারের জন্য নয়, বরং গোটা বনু হাশেম গোত্রের জন্য আইনত হারাম করে দিয়েছেন। এমন নিঃস্বার্থ ব্যক্তিত্বের তুলনা সমগ্র মানবেতিহাসেও হয়তো কোথাও পাওয়া যাবে না। অথচ সেই উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের ললাটেও নিতান্ত হীন চরিত্রের চুনোপুটিরা কালিমা লেপনের ধৃষ্টতা দেখালো।

রাসূল (সা.) কে হত্যার ষড়যন্ত্র

সত্যের আহ্বান যখন আন্দোলনে পরিণত হয়, তখন তার বৈরী শক্তিগুলো অন্যায় বিরোধিতা করতে গিয়ে ক্রমাগত হীনতা ও নীচতার দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। শেষ পর্যন্ত তারা যখন মূল দাওয়াতের বিরুদ্ধে যুক্তিতেও হেরে যায়, এবং বিভ্রান্তি সৃষ্টি ও সহিংসতার অভিযান চালিয়েও ব্যর্থ হয়, তখন তাদের আজন্ম লালিত ঘৃণা বিদ্বেষ, গোয়ার্তুমি ও ইতরামি তাদের মধ্যে অপরাধপ্রবণ খুনি ও ডাকাতসুলভ মানসিকতা সৃষ্টি করে দেয়। এই পর্যায়ে এসে তারা ইসলামী আন্দোলনের নেতাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়। এ ধরনের কুচক্রী শত্রুরা যদি ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের গদিতে আসীন হয়, তাহলে তারা প্রতিপক্ষের ওপর রাজনৈতিক নির্যাতন চালায় এবং আইনের তরবারি চালিয়ে বিচারের নাটক মঞ্চস্থ করে মানবতার সেবকদের হত্যা করে। আর ক্ষমতা থেকে যারা বঞ্চিত থাকে, তারা সরাসরি হত্যার ষড়যন্ত্রমূলক পথই বেছে নেয়। মক্কার জাহেলি নেতৃত্ব এই শেষোক্ত পথই বেছে নিল।

হিজরি চতুর্থ সালের কথা। আমর বিন উমাইয়া যামরী আমের গোত্রের দুই ব্যক্তিকে হত্যা করলো। রাসূল (সা.) এই হত্যাকাণ্ডের দিয়ত আদায় করা ও শান্তিচুক্তির দায়দায়িত্ব স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য বনু নাজির গোত্রের

www.amarboi.org

লোকদের কাছে গেলেন। সেখানকার লোকেরা রাসূল (সা.) কে একটা দেয়ালের ছায়ার নিচে বসালো। তারপর গোপনে সলাপরামর্শ করতে লাগলো যে, একজন ওপরে গিয়ে তাঁর মাথার ওপর বিরাটকায় পাথর ফেলে দিয়ে হত্যা করবে। আমর বিন জাহ্‌হাশ বিন কা'ব এই দায়িত্বটা নিজের কাঁধে নিয়ে নিল। রাসূল (সা.) তাদের দুরভিসন্ধি টের পেয়ে আগে ভাগেই উঠে চলে এলেন। (সিরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড; রাহমাতুল্লিল আলামিন : কাযী সুলায়মান মানসুরপুরী; রাসূলে আকরাম কী সিয়াসী জিন্দেগি : ডক্টর মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ)

কুখ্যাত ইহুদি নেতা কা'ব বিন আশরাফের পিতা ছিল তাই গোত্রের লোক, আর তার মা ছিল বিত্তশালী ইহুদি নেতা আবু রাফে ইবনে আবি হাকিকের কন্যা। এই দ্বিমুখী সম্পর্কের কারণে কা'ব ইবনে আশরাফ আরব ও ইহুদিদের ওপর সমান প্রভাবশালী ছিল। এক দিকে সে ছিল ধনাঢ্য এবং অপরদিকে নামকরা কবি। ইসলামের বিরুদ্ধে তার বুক ছিল বিষে ভর্তি। (ফাতহুল বারীর) অপর এক রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে, কা'ব এক দিকে রাসূল (সা.) আসা মাত্রই তাকে হত্যা করে। এই রেওয়ায়াত সূত্রের দিক দিয়ে কিছুটা দুর্বল হলেও কাবের আক্রোশ ও তার সঠিক তৎপরতার আলোকে বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়।

যে সময় রাসূল (সা.) বনু কুরায়যার সাথে চুক্তি নবায়ন করেন, সে সময় বনু নাজির রাসূল (সা.) কে খবর পাঠায়, আপনি তিনজন লোক নিয়ে আসবেন। আমরাও তিনজন আলেম উপস্থিত করবো। আপনি এই বৈঠকের সামনে নিজের বক্তব্য পেশ করবেন। আমাদের আলেমরা যদি আপনার বক্তব্য সমর্থন করে, তাহলে আমরা সবাই আপনার প্রতি ঈমান আনবো। রাসূল (সা.) রওনা হলেন। কিন্তু পথিমধ্যে জানতে পারলেন, ইহুদিরা তাকে হত্যার প্রস্তুতি চালাচ্ছে। তাই তিনি ফিরে এলেন।

www.amarboi.org

সাহাবীদের ওপর নির্যাতন ও শাহাদাত

যারা ইসলাম গ্রহণ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করছিলেন সেসব সাহাবার ওপর মুশরিকরা ভীষণ অত্যাচার চালাতে লাগলো। প্রত্যেক গোত্র তার মধ্যকার মুসলমানদের ওপর সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো। কোথাও বা তাদেরকে অন্তরীণ রেখে মারপিট করে, ক্ষুৎপিপাসায় অবর্ণনীয় কষ্ট দিয়ে, কোথাও বা দ্বি-প্রহরের প্রচণ্ড গরমের সময় মক্কার রৌদ্রতপ্ত মরুপ্রান্তরে শুইয়ে দিয়ে নির্যাতন চালাতে থাকলো। যারা দুর্বল এভাবে নির্যাতন চালিয়ে তাদেরকে ইসলাম ত্যাগ করতে বাধ্য করা হতো। কেউ কেউ অসহ্য নির্যাতনের চাপে ইসলাম ত্যাগ করতো। আবর কেউ কেউ সাহায্য সমর্থন পেত এবং এভাবে আল্লাহ তাদেরকে রক্ষা করতেন।

সাহাবায়ে আজমাঈন এর ওপর যে জুলুম নির্যাতন হয়েছে এবার দেখুন সেই চিত্রটি-

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ

আর যারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় নিহত হয়, তাদের মৃত বলো না। বরং তারা জীবিত, কিন্তু তোমরা তা বুঝ না।[১৫২]

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ

আর যারা আল্লাহ্‌র রাহে নিহত হয়, তাদেরকে তুমি কখনো মৃত মনে করো না। বরং তারা নিজেদের পালনকর্তার নিকট জীবিত ও জীবিকাপ্রাপ্ত।[১৫৩]

وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ (-) سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ (-) وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ

যারা আল্লাহ্‌র পথে শহীদ হয়, আল্লাহ্ কখনই তাদের কর্ম বিনষ্ট করবেন না। তিনি তাদেরকে পথ প্রদর্শন করবেন এবং তাদের অবস্থা ভাল করবেন। অতঃপর তিনি তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করবেন, যা তাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন।[১৫৪]

فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ

---

১৫২ সূরা বাকারা, ১৫৪
১৫৩ সূরা আল ইমরান, ১৬৯
১৫৪ সূরা মুহাম্মদ, ৪-৬

www.amarboi.org

যারা হিজরত করেছে, তাদেরকে নিজেদের দেশ থেকে বের করে দেয়া হয়েছে এবং তাদের প্রতি উৎপীড়ন করা হয়েছে আমার পথে এবং যারা লড়াই করেছে ও মৃত্যুবরণ করেছে, অবশ্যই আমি তাদের ওপর থেকে অকল্যাণকে অপসারিত করব। এবং তাদেরকে প্রবিষ্ট করব জান্নাতে যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত। এই হলো বিনিময় আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে। আর আল্লাহ্‌র নিকট রয়েছে উত্তম বিনিময়।[১৫৫]

وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

তারা তাদেরকে শাস্তি দিয়েছিল শুধু এ কারণে যে, তারা প্রশংসিত, পরাক্রান্ত আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল। যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের ক্ষমতার মালিক, আল্লাহ্‌র সামনে রয়েছে সবকিছু।[১৫৬]

قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ

তাকে বলা হল, জান্নাতে প্রবেশ কর। সে বলল হায়, আমার সম্প্রদায় যদি কোন ক্রমে জানতে পারত।[১৫৭]

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ

আর যারা আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে তারাই তাদের পালনকর্তার কাছে সিদ্দীক ও শহীদ বলে বিবেচিত। তাদের জন্য রয়েছে পুরস্কার ও জ্যোতি এবং যারা কাফের ও আমার নিদর্শন অস্বীকারকারী তারাই জাহান্নামের অধিবাসী হবে।[১৫৮]

إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

তোমরা যদি আহত হয়ে থাক, তবে তারাও তো তেমনি আহত হয়েছে। আর এ দিনগুলোকে আমি মানুষের মধ্যে পালাক্রমে আবর্তন ঘটিয়ে থাকি। এভাবে আল্লাহ্‌ জানতে চান কারা ঈমানদার আর তিনি তোমাদের কিছু লোককে শহীদ হিসাবে গ্রহণ করতে চান। আর আল্লাহ্‌ অত্যাচারীদেরকে ভালবাসেন না।

---

১৫৫ সূরা আল ইমরান, ১৯৫
১৫৬ সূরা বুরুজ, ৮-৯
১৫৭ সূরা ইয়াসিন, ২৬
১৫৮ সূরা হাদীদ, ১৯

www.amarboi.org

وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا

হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্‌র নির্দেশ মান্য কর, নির্দেশ মান্য কর রসূলের এবং তোমাদের মধ্যে যারা বিচারক তাদের। তারপর যদি তোমরা কোন বিষয়ে বিবাদে প্রবৃত্ত হয়ে পড়, তাহলে তা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি প্রত্যর্পণ কর- যদি তোমরা আল্লাহ্ ও কেয়ামত দিবসের ওপর বিশ্বাসী হয়ে থাক। আর এটাই কল্যাণকর এবং পরিণতির দিক দিয়ে উত্তম।

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ

যারা আল্লাহ্‌র পথে গৃহ ত্যাগ করেছে, এরপর নিহত হয়েছে অথবা মরে গেছে; আল্লাহ্ তাদেরকে অবশ্যই উৎকৃষ্ট জীবিকা দান করবেন এবং আল্লাহ্ সর্বোৎকৃষ্ট রিযিকদাতা। তাদেরকে অবশ্যই এমন এক স্থানে পৌছাবেন, যাকে তারা পছন্দ করবে এবং আল্লাহ্ জ্ঞানময়, সহনশীল।[১৫৯]

وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

আর তোমরা যদি আল্লাহ্‌র পথে নিহত হও কিংবা মৃত্যুবরণ কর, তোমরা যা কিছু সংগ্রহ করে থাক আল্লাহ্ তা'আলার ক্ষমা ও করুণা সে সবকিছুর চেয়ে উত্তম।[১৬০]

হযরত বেলাল (রা.)

এক হযরত বেলাল (রা.) ইসলামে দীক্ষিত হওয়ায় যে নির্যাতন ভোগ করেছেন তার জীবনের একটি মুহূর্ত আমাদের কারো কারো সারাজীবন এক সাথ করলে এক হবে না। ইসলাম গ্রহণের পর তার মনিব ওমাইয়া বিন খালফ তাকে নানাভাবে নির্যাতন করতো। দ্বিপ্রহরের খরতাপে তপ্ত বালুর ওপর শুইয়ে বুকের ওপর পাথর চাপা দিত। সারাদিন এভাবে নির্যাতনের পর রাতের পালা। রাতে এ আঘাতের ওপর আবার বেত মারা হতো। এতে পূর্বের জখমগুলো রক্তাক্ত হয়ে উঠত। পুনরায় সেই একই নির্যাতন পালাক্রমে চলত। মাঝে মধ্যে মক্কার দুষ্ট বালকদের হাতে বেলালের গলায় রশি বেঁধে ছেড়ে দেয়া হতো। ঐ বালকগুলো সারাদিন টেনেহিঁচড়ে বেড়াত। উদ্দেশ্য ছিল হয় মরে যাবে নতুবা

---

১৫৯ সূরা হজ্ব, ৫৮-৫৯
১৬০ সূরা ইমরান, ১৫৭

www.amarboi.org

ইসলাম ত্যাগ করবে। কিন্তু দেখা গেল হযরত বেলাল (রা.) এই অমানবিক হৃদয়বিদারক ও ওষ্ঠাগত প্রাণে মাঝে মধ্যে চিৎকার করে বলে উঠেছেন আহাদ আহাদ।

হযরত খাব্বাব (রা.)

প্রাথমিক স্তরের ইসলাম গ্রহণকারীদের তালিকায় হযরত খাব্বাব (রা.) যেমন ৫-৬ জনের একজন, তেমনি ঈমানের অগ্নিপরীক্ষায়ও তিনি ছিলেন অন্যতম। হৃদয়বিদারক অত্যাচার নির্যাতন হয়েছিল তাঁর ওপর। মরুভূমির প্রচণ্ড রোদে লোহার জেরা পরিয়ে উত্তপ্ত বালুর ওপর শুয়ে রাখা হতো আর উত্তাপে খাব্বাবের কোমরের গোশত পর্যন্ত গলে যেত।

হযরত খাব্বাব মুহাম্মদ (সা.) এর সাথে মিলিত হয়েছে একথা শুনে তাঁর মনিব জনৈকা মহিলা লোহার শলাকা গরম করে খাব্বাবের মাথায় দাগ দিতে লাগলো। এতেও খাব্বাবকে বিচলিত করা যাচ্ছে না বিধায় একদিন কোরাইশ দলপতিগণ মাটিতে প্রজ্বলিত অঙ্গার বিছিয়ে তার ওপর খাব্বাবকে চিৎ করে শায়িত করতো এবং কতিপয় পাষণ্ড তার বুকে পা দিয়ে চেপে ধরতো। অঙ্গারগুলো তার পিঠের গোশত-চর্বি পুড়তে পুড়তে এক সময় নিভে যেত। তবুও নরাধমরা তাকে ছাড়ত না। এভাবে তার শরীরে বড় বড় গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। হযরত খাব্বাব (রা.) তার এই নির্যাতনের চিহ্ন যাতে কেউ না দেখে সে জন্য চাদর গায়ে দিয়ে থাকতেন। একদিন হযরত ওমর (রা.) তার শরীর দেখে বললেন, হে ভাই খাব্বাব তোমার শরীরে এমন বড় বড় গর্তগুলো কিসের? হযরত খাব্বাব (রা.) বললেন, আমাকে আগুনের অঙ্গারে চেপে ধরে রাখা হতো, আর আমার শরীরের রক্ত এবং চর্বি গলে আগুন নিভে যেত।

হযরত আম্মার (রা.)

হযরত আম্মার (রা.) ও তার মাতা-পিতা ইসলাম গ্রহণ করার পর ইসলামের দুশমনরা তাদের ওপরে লোমহর্ষক নির্যাতন চালায়। মরুভূমির উত্তপ্ত বালুর ওপরে তাদেরকে শাস্তি দেয়া হতো। আঘাতের পর আঘাতে অনেক সময় জ্ঞান হারা হয়ে যেতেন। তার পাশ দিয়ে নবী করীম (সা.) যাবার সময় তাকে ধৈর্য ধারণ করার উপদেশ ও জান্নাতের সুসংবাদ দিতেন।

আম্মার ইবনে হযরত ইয়াসির

হযরত আম্মার (রা.) এর পিতা হযরত ইয়াসির (রা.) কে ইসলামের দুশমনরা তার দুই পায়ে দুটো রশি বেঁধে তা দুটো উটের পায়ে বেঁধে দেয়া হলো। এর উট দু'টি দু'দিকে চালিয়ে দেয়ার পর হযরত ইয়াসিরের দেহ ছিঁড়ে দুইভাগ হয়ে গেল এবং তিনি শাহাদাতের অমিয় সুধা পান করলেন।

www.amarboi.org

একদিন নরপশুরা হযরত আম্মারকে প্রহার করতে করতে অচেতন করে ফেলে। তার গর্ভধারণী মা হযরত সুমাইয়া রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা তার কলিজার টুকরা সন্তানের ওপর নির্যাতনের এই দৃশ্য দেখে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেন–

"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" তার মুখে কালেমার ঘোষণা শুনে নরাধম আবু জেহেল ক্রুদ্ধ হয়ে হযরত সুমাইয়াকে বর্শা বিদ্ধ করে হত্যা করলো। নারীদের মধ্যে হযরত সুমাইয়া রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহাই সর্বপ্রথম শাহাদাত বরণ করেন।

হযরত আম্মার (রা.)-এর শাহাদাতের ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন নবী করীম (সা.)। তিনি বলেছিলেন, "তোমার জীবনের সবশেষ চুমুকে তুমি যা পান করবে তা হবে দুধ।"

তিনি অসীম সাহসিকতা ও বলিষ্ঠতার সাথে যুবকদের ন্যায় যুদ্ধ করতে থাকেন। যুদ্ধ করতে করতে তিনি তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়েন। সম্মুখে পেলেন দুধ, তাই দুধ পান করতে রাসূল (সা.) সেই ভবিষ্যদ্বাণীর কথা মনে পড়ল। বুঝতে আর বাকি রইল না এটিই তার জীবনের শেষ মুহূর্ত।

তিনি শেষবারের মতো যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লেন শত্রুবাহিনীর ওপর। তিনি যেদিকে যেতেন, শত্রুসৈন্যের রণব্যূহ ভেঙে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যেত। এভাবে যুদ্ধ করতে করতে তিনি শাহাদাত বরণ করেন।

হযরত হামজা (রা.)-এর শাহাদাত

বদর যুদ্ধের দিন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় চাচা হযরত হামজা রাদিয়াআল্লাহু তা'য়ালা আনহু তাঁর মাথার পাগড়ির সাথে উট পাখির পালক লাগিয়ে ছিলেন। সেদিনও তিনি দু'হাতে তরবারি চালনা করে বাতিল শক্তির ভেতরে ত্রাস সৃষ্টি করেছিলেন। মাথায় পাখির পালক থাকার কারণে তিনি যেদিকেই অগ্রসর হচ্ছিলেন, তাঁকে সহজেই চেনা যাচ্ছিলো।

নিহত হওয়ার আগে হযরত বিলালকে নির্যাতনকারী মক্কার কাফির নেতা উমাইয়া হযরত আব্দুর রহমান রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'মাথায় উট পাখির পালক লাগনো লোকটি কে?'

হযরত আব্দুর রহমান বলেছিলেন, 'তিনি বিশ্বনবীর চাচা হযরত হামাজা।' উমাইয়া আক্ষেপ করে বলেছিল, 'ঐ ব্যক্তি আজ আমাদের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করেছে।' বদরের ময়দানে মক্কার জুবায়ের ইবনে মুতায়িমের চাচা হযরত হামজা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর হাতে নিহত হয়েছিল। ওহুদের দিন সে তার গোলাম ওয়াহশীকে শর্ত দিয়েছিল, 'তুমি যদি হামজাকে হত্যা করে আমার চাচা হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারো তাহলো আমি তোমাকে দাসত্বের এই ঘৃণ্য

www.amarboi.org

জীবন থেকে মুক্তি দেবো।' ওয়াহশী ওহুদের প্রান্তরে একটি বিশাল পাথর খণ্ডের আড়ালে এমন একটি বর্শা হাতে ওঁৎ পেতে বসেছিল, যে বর্শা দূর থেকে ছুড়ে প্রতিপক্ষকে হত্যা করা যায়। হযরত হামজা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু দু'হাতে তরবারি পরিচালনা করছেন আর কাফিরদের ব্যূহ ভেঙে সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। শত্রু পক্ষ তাঁর সূতীক্ষ্ণ ধার তরবারির সামনে কাটা কলা গাছের মতই মাটিতে লুটিয়ে পড়ছিল। হযরত হামজা যে মুহূর্তে পাথর খণ্ড অতিক্রম করছিলেন, পাথরের আড়ালে ওঁৎ পেতে বসে থাকা ওয়াহশী তার হাতের বর্শা হযরত হামজার নাভি লক্ষ্য করে ছুড়ে মারলো।

তীক্ষ্ণ বর্শা নবীর প্রিয় চাচার নাভিমূলে বিদ্ধ হয়ে পৃষ্ঠদেশ পার হয়ে গেল। জীবনের এই শেষ মুহূর্তেও ইসলামের এই বীর সেনানী শত্রুকে আঘাত করার জন্য সামনের দিকে অগ্রসর হলেন। কিন্তু তাঁর জীবনীশক্তি আর অবশিষ্ট ছিল না। তিনি রক্তাক্ত দেহে ওহুদের রণপ্রান্তরের লুটিয়ে পড়লেন। মক্কায় আবু জাহিল নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সামান্য আঘাত করেছিল, চাচা হামজা তা সহ্য করতে না পেরে আবু জেহেলকে আঘাত করে রক্তাক্ত করে দিয়েছিলেন। কিন্তু ওহুদের প্রান্তরে যখন আব্দুল্লাহ-ইবনে কামিয়াহ আল্লাহর নবীকে আঘাত করে রক্তাক্ত করে দিল তখন হযরত হামজা প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য এগিয়ে আসতে পারলেন না। ওয়াহশীর নিক্ষিপ্ত বর্শার আঘাত তাঁকে চিরদিনের মতই নিথর নিস্তব্ধ স্পন্দনহীন করে দিয়েছে। তিনি আর কোনদিন আল্লাহর নবীর সামনে এসে দাঁড়াবেন না।

হযরত হামজা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে হত্যা করে ওয়াহশী যুদ্ধ করার আগ্রহ হরিয়ে ফেলেছিল। সেদিন আর তার পক্ষে যুদ্ধ করা সম্ভব হয়নি। দাসের জীবন থেকে সে মুক্তি লাভ করে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। ওয়াহশী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু আল্লাহর রাসূলের সামনে এসে দাঁড়াতেই রাসূলের মানসপটে প্রিয় চাচা হামজার শত সহস্র স্মৃতি ভেসে উঠেছিল। তিনি বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে হযরত ওয়াহশীকে বলেছিলেন, 'ওয়াহশী! তুমি আমার সামনে এসো না। তোমাকে দেখলেই আমার চাচার কথা মনে পড়ে।'

হযরত ওয়াহশী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু প্রতীক্ষা করেছিলেন, হযরত হামজা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে হত্যা করে যে পাপ তিনি করেছেন, জীবন দান করে হলেও তিনি সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবেন। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর খেলাফতকালে হযরত ওয়াহশী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ভণ্ডনবী মুসাইলামাকে হত্যা করে তাঁর সে কৃতকর্মের কাফফারা আদায় করেছিলেন।

www.amarboi.org

কুরাইশদের নারী বাহিনী মুসলিম বাহিনীর শাহাদাত বরণকারীদের নিথর লাশের ওপরে শকুনের মতোই ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। শহীদের লাশের নাক, কান ও বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে মালা বানিয়ে তাদের গলায় পরেছে। আল্লাহর নবীর প্রিয় চাচা হযরত হামজা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর স্পন্দনহীন লাশ নিয়ে মক্কার হিংস্র হায়েনার দল পৈশাচিক উল্লাসে মেতে উঠেছিল। তাঁর পবিত্র নাক-কান ও দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিচ্ছিন্ন করে মালা বানিয়ে তা গলায় পরে নগ্ন উল্লাস প্রকাশ করেছিল।

এতেও তাদের হিংস্র আক্রোশ চরিতার্থ হলো না, আবু সুফিয়ানের স্ত্রী, আমীরে মুয়াবিয়ার মাতা হিন্দা হযরত হামজার পেট-বুক চিরে ফেললো। রাসূলের চাচার বুকের ভেতর থেকে হিন্দা কলিজা বের করে আনলো। সে কলিজা হিন্দা চিবিয়ে খেয়ে ফেলার চেষ্টা করলো। কিন্তু আল্লাহর ফায়সালা ছিল ভিন্ন ধরনের। হিন্দা সে কলিজা গিলতে না পেরে বমি করে ফেলে দিল। ইতিহাস মক্কার এই নারীকে 'কলিজা ভক্ষণকারিণী' হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

যুদ্ধ অবসানে শহীদদের লাশ দাফন করা হচ্ছে। শাহাদাতের রক্তাক্ত ময়দানে আল্লাহর নবীর প্রিয় চাচার প্রাণহীন দেহ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন অবস্থায় পড়ে আছে। হযরত হামজা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর লাশের এ অবস্থা দেখে সাহাবায়ে কেরাম ফুঁফিয়ে কেঁদে উঠলেন। আল্লাহর নবী অশ্রু সংবরণ করতে পারেননি। তিনি বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, চাচা! তোমার ওপর আল্লাহ রহম করুন কিয়ামতের ময়দানে তুমি হবে শহীদদের নেতা। আমার মন চায় তোমাকে এভাবেই এখানে ফেলে রাখি। পশু-পাখি তোমার লাশ ভক্ষণ করতো। কিয়ামতের দিন তোমাকে পশু-পাখির পেট থেকে জীবন্ত বের করা হতো। কিন্তু তোমার লাশ এভাবে ফেলে গেলে তোমার বোন শোকে অধির হয়ে পড়বে। চাচা! তুমি কাজে অগ্রগামী ছিলে। আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি তোমার কতই না মমতা ছিল!'

আপন ভাই হযরত হামজা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর শাহাদাতের সংবাদ পেয়ে তাঁর বোন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফুফু হযরত সাফিয়া রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা শোকে অধীর হয়ে ওহুদের প্রান্তরে ছুটে এলেন। আল্লাহর নবী হযরত সাফিয়ার সন্তান হযরত যুবায়েরকে বললেন, তোমার মাকে তার ভাইয়ের এই করুণ অবস্থা দেখতে দিও না। সে সহ্য করতে পারবে না।'

হযরত যুবায়ের রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তাঁর মাতাকে লাশ দেখতে নিষেধ করলেন। হযরত সাফিয়া বললেন, 'আমার আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাঁর নাক-

www.amarboi.org

কান ও বুকের কলিজা দান করেছে, এর চেয়ে সৌভাগ্যের আর কী আছে! আমিও আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ধৈর্য ধারণ করবো।'

হযরত সাফিয়া রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহার এ কথা শুনে আল্লাহর রাসূল তাঁকে হযরত হামজার লাশ দেখার অনুমতি দিলেন। হযরত সাফিয়া ময়দানে আসার পথেই ভাইয়ের কাফনের জন্য দুটো কাপড় এনেছিলেন। মুসলিম বাহিনী আল্লাহর পথে সমস্ত কিছুই উৎসর্গ করেছিলেন। বাকি ছিল শুধু প্রাণ, সে প্রাণও উৎসর্গ করলেন। কাফন দেয়ার মত কাপড়ও ছিল না। হযরত হামজার পাশেই হযরত ছুহায়েন আনসারীর প্রাণহীন দেহ পড়েছিল। তাঁর লাশকেও কাফিররা বিকৃত করেছিল। শহীদদের লাশ একত্র করা হলো। কাফনের যে কাপড় দেয়া হলো, সে কাপড়ে মাথা ঢাকলে পা বের হয়ে যায় আর পা ঢাকলে মাথা বের হয়ে থাকে। অবশেষে মাথার দিক ঢেকে পায়ের দিকে ইজখির নামক এক ধরনের সুগন্ধ বিশিষ্ট ঘাস দিয়ে দোজাহানের বাদশাহর চাচার লাশ ওহুদের প্রান্তরেই দাফন করা হয়েছিল।

জীবন্ত শহীদ হযরত তালহা (রা.)

ওহুদের ময়দানে নেতার আদেশ অমান্য করার কারণে সুস্পষ্ট বিজয় পরাজয়ে রূপান্তরিত হলো। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তীরন্দাজ বাহিনীর প্রতি আদেশ দিয়েছিলেন, তাঁরা কোন অবস্থাতেই যেন গিরি পথ থেকে সরে না আসেন। কিন্তু যুদ্ধে বিজয় অর্জিত হয়েছে দেখে তাদের একদল বলছিল, রাসূলের আদেশ বলবৎ ছিল যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার সময় পর্যন্ত । সুতরাং এখন বিজয় অর্জিত হয়েছে, এখন আর এখানে প্রহরা দেয়ার কোন প্রয়োজন নেই। আরেক দলের অভিমত ছিল, যুদ্ধে জয়-পরাজয় বলে নয়, রাসূলের পরবর্তী আদেশ না আসা পর্যন্ত এখান থেকে সরা যাবে না।

এ ধরনের মতানৈক্য সৃষ্টি হওয়ার ফলে বেশ কিছু সংখ্যক সাহাবা স্থান ত্যাগ করে সরে এসেছিলেন। এই সুযোগে মক্কার কুরাইশ বাহিনী অরক্ষিত সেই গিরি পথেই আক্রমণ করেছিল। তাদের আক্রমণে ওহুদের রণপ্রান্তরে মুসলিম বাহিনী চরমভাবে পর্যুদস্ত হয়ে পড়েছিল। মুসলমানদের রক্তে ওহুদের প্রান্তরে যেন প্লাবন বয়ে যাচ্ছে। ইসলাম বিরোধীদের একমাত্র লক্ষ্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেয়া।

সাহাবায়ে কেরাম তখন ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছেন। মুষ্টিমেয় কয়েকজন জানবাজ সাহাবা নিজেদের প্রাণের মায়া ত্যাগ করে আল্লাহর নবীকে ঘিরে রেখেছেন। শত্রুদের অস্ত্রের আঘাত রাসূলের পবিত্র শরীরে যেন না লাগে, এ জন্য সাহাবায়ে কেরাম রাসূলকে ঘিরে মানববন্ধন তৈরি করে নিজেদের শরীরকে ঢাল হিসেবে

www.amarboi.org

ব্যবহার করেছেন। আল্লাহর রাসূলকে হেফাজত করতে যেয়ে হযরত আম্মার ইবনে ইয়াজিদ শাহাদাত বরণ করলন। কাফির বাহিনী নানা ধরনের অস্ত্র দিয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আক্রমণ করছিল।

এ সময় কাফিরদের তীরের আঘাতে হযরত কাতাদা ইবনে নুমান রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর চোখ কোটর ছেড়ে বের হয়ে এলো। মুখের কাছে এসে চোখ ঝুলতে থাকলো। হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশে অবস্থান করে কাফিরদের দিকে তীর ছুড়তে থাকলেন। আল্লাহর নবী তুনীর থেকে তীর বের করে হযরত সা'দের হাতে দিচ্ছিলেন, হে সা'দ! তোমার ওপর আমার মাতা পিতা কুরবান হোক, তুমি তীর চালাও।' হযরত আবু দুজানা আল্লাহর নবীকে এমনভাবে বেষ্টন করেছিলেন যে, কাফিরদের সমস্ত আঘাত তাঁর দেহেই লাগে এবং আল্লাহর রাসূল যেন অক্ষত থাকেন। হযরত তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এক হাতে তরবারি ও অন্য হাতে বর্শা নিয়ে নবীর ওপর আক্রমণকারীদেরকে প্রতিহত করছিলেন। এক সময় শত্রুর আক্রমণ এতটা তীব্র হলো যে, মাত্র ১২ জন আনসার আর মক্কার মোহাজির হযরত তালহা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ব্যতীত আর কেউ নবীর পাশে স্থির থাকতে পারলেন না। এ অবস্থায় কাফিরদের প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করলেন, 'আক্রমণের মুখে শত্রুদেরকে যে পিছু হটাতে বাধ্য করবে সে জান্নাতে আমার সাথে অবস্থান করবে।'

হযরত তালহা বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমি শত্রুদেরকে আক্রমণ করবো।' আল্লাহর নবী তাঁকে অনুমতি দিলেন না। আনসারদের মধ্যে একজন বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমি আক্রমণ করতে যাবো।'

আল্লাহর নবী তাঁকে অনুমতি দিলেন। কিছুক্ষণ পরই তিনি শাহাদাত বরণ করলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার সেই পূর্বের ঘোষণা দিলেন। হযরত তালহা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু পুনরায় এগিয়ে এলেন। এভারও আল্লাহর নবী তাঁকে নিষেধ করলেন। এভাবে পরপর ১২ জন আনসারই শাহাদাতবরণ করলেন। এবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত তালহাকে এগিয়ে যাবার অনুমতি দিলেন। হযরত তালহা সিংহ বিক্রমে কাফিরদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

এর মধ্যেই পাপিষ্ঠ আব্দুল্লাহ ইবনে কামিয়াহ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আঘাত করে তাঁর দান্দান মোবারক শহীদ করলো। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রক্তাক্ত হয়ে পড়লেন। হযরত তালহা আল্লাহর

www.amarboi.org

নবীকে হেফাজত করতে গিয়ে নিজের একটি হাত হারালেন। তিনি রক্তাক্ত দেহে এক হাতেই তরবারি ধারণ করে কাফিরদের আক্রমণ প্রতিরোধ করছেন এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিজের কাঁধে উঠিয়ে নিলেন। আল্লাহর নবী তাঁর কাঁধে, কাফিরদের আঘাতে নিজের এক হাত বিচ্ছিন্ন। একটি মাত্র হাত দিয়ে তরবারি চালনা করে কাফিরদের আক্রমণ প্রতিহত করছেন এবং রাসূলকে নিয়ে নিরাপদ স্থানের দিকে সরে যাবার চেষ্টা করছেন। চরমভাবে আহত অবস্থায় একজন মানুষকে কাঁধে নিয়ে পাহাড় বেয়ে ওপরে ওঠা এবং শত্রুকে প্রতিহত করা ছিলো খুবই কঠিন ব্যাপার। হযরত তালহা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর নিজের দেহের প্রতি লক্ষ্য ছিলো না। তাঁর দেহ থেকে তখন অবিরাম ধারায় রক্ত ঝরছিল। সেদিকে তাঁর ভ্রূক্ষেপ ছিল না। তাঁর সমস্ত সত্তা দিয়ে তিনি তখন অনুভব করছিলেন আল্লাহর নবীকে হেফাজত করতে হবে। এক সময় তিনি আল্লাহর নবীকে নিয়ে পাহাড়ের এক গুহায় পৌঁছে নবীকে কাঁধ থেকে নামিয়েই জ্ঞানহারা হয়ে লুটিয়ে পড়েছিলেন।

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, 'আমি আর হযরত উবাইদাসহ অনেকেই অন্য দিকে যুদ্ধ করছিলাম। নবীর সন্ধানে এসে দেখলাম তিনি আহত অবস্থায় পড়ে আছেন। আমরা তাঁর সেবা-যত্ন করতে অগ্রসর হতেই তিনি বলেন, 'আমাকে নয়, তোমাদের বন্ধু তালহাকে দেখো।'

হযরত আবু বকর বলেন, আমরা দেখলাম তিনি জ্ঞানহারা হয়ে পড়ে আছেন। তাঁর শরীর থেকে একটি হাত বিচ্ছিন্ন প্রায়। গোটা শরীর অস্ত্রের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত। ৮০টিরও বেশি আঘাত ছিল তাঁর শরীরে। নবী (সা.)-কে হেফাজত করতে গিয়েই তিনি তাঁর হাত হারিয়ে ছিলেন এবং এতগুলো আঘাত সহ্য করেছিলেন।

আল্লাহর নবী পরবর্তীকালে হযরত তালহা সম্পর্কে বলতেন, 'কেউ যদি কোন মৃত মানুষকে পৃথিবীতে বিচরণশীল দেখতে চায়, তাহলে সে যেন তালহাকে দেখে নেয়।' হযরত তালহাকে 'জীবন্ত শহীদ' বলা হতো। ওহুদের প্রসঙ্গ উঠলেই হযরত আবু বকর বলতেন, 'সেদিনের যুদ্ধে সমস্ত কৃতিত্বের অধিকারী ছিলেন তালহা। নবী করীম (সা.) হযরত তালহা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে পৃথিবীতে জীবিত থাকতেই জান্নাতের সুসংবাদ দান করেন।

হযরত মুসআব (রা.)-এর শাহাদাত

ওহুদের রণপ্রান্তরে ইসলামের শত্রুরা নবী করীম (সা.) কে হত্যা করার লক্ষ্যে এগিয়ে এলো। হযরত মুসআব ইবনে ওমায়ের রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বিপদের ভয়াবহতা উপলব্ধি করলেন। তিনি ছিলেন ওহুদ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর

www.amarboi.org

পতাকাবাহক। তিনি ক্ষণিকের মধ্যেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন, তাঁর দেহে প্রাণ থাকা পর্যন্ত তিনি রাসূলের দেহে সামান্যতম আঘাত বরদাশত করবেন না। আল্লাহর নবীর দিকে কাফির বাহিনী শাণিত অস্ত্র হাতে ছুটে আসছে। হযরত মুসআব এক হাতে পতাকা আরেক হাতে তরবারি নিয়ে রাসূলকে নিজের পেছনে রেখে কাফিরদের আক্রমণ প্রতিহত করতে থাকলেন। কাফিরদের ভেতরে ত্রাস সৃষ্টি করার জন্য তিনি তাদের সামনে ভয়ঙ্কররূপ ধারণ করে মুখ দিয়ে ভীতিকর শব্দ সৃষ্টি করতে লাগলেন। এ ধরনের ভূমিকা গ্রহণ করার কারণ হলো কাফিরদের দৃষ্টি রাসূলের ওপর থেকে সরিয়ে তাঁর নিজের ওপরে নিয়ে আসা। রাসূল যেন নিরাপদে থাকতে পারেন, এটাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। এভাবে হযরত মুসআব ওহুদের প্রান্তরে মুসলিম বাহিনীর এক করুণ মুহূর্তে নিজের একটি মাত্র সত্তাকে একটি বাহিনীতে পরিণত করেছিলেন। তিনি কাফিরদের সামনে ঢালের মতোই ভূমিকা পালন করছিলেন। শত্রুরা তাঁর দেহের ওপর দিয়েই আল্লাহর নবীকে আক্রমণ করছিল। শত্রুদের তীব্র আক্রমণের মুখে যখন মুসলিম সৈন্য বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়তো, তখন হযরত মুসআব একাই শত্রুর সামনে পাহাড়ের মতই অটল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন। রাসূলকে আঘাতকারী জালিম ইবনে কামিয়াহ এগিয়ে এলো। হযরত মুসআব রাদিয়াআল্লাহু তা'য়ালা আনহু তাকে বাধা দিলেন। পাপিষ্ঠ কামিয়াহ তরবারি দিয়ে আঘাত করে হযরত মুসআবের ডান হাত বিচ্ছিন্ন করে দিল।

কাফিরদের তরবারির আকেটি আঘাতে হযরত মুসআবের আরেকটি হাত বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। তিনি তাঁর কাটা হাতের বাহু দিয়ে ইসলামের পতাকা জড়িয়ে ধরে উড্ডীয়মান রাখলেন। ইসলামের শত্রুরা এবার তাঁর ওপর বর্শার আঘাত হেনে তাঁকে পৃথিবী থেকে চিরদিনের জন্য বিদায় করে দিল। তিনি শাহাদাতের অমিয় সুধা পান করলেন।

দাফন-কাফনের সময় হযরত মুসআব রাদিয়াল্লাহু তা'য়াআলা আনহুর লাশ পাওয়া গেল। হাত দুটো তাঁর নেই। তিনি হাত দুটো দিয়ে মহাসত্যের পতাকা ধারণ করেছিলেন, এ অপরাধে শত্রুরা তাঁর হাত দুটো দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। তাঁর পবিত্র শরীরে রয়েছে জোড়াতালি দেয়া শত ছিন্ন জামা। সে জামাও রক্ত আর বালুতে বিবর্ণ। তবুও তাঁর গৌর মুখমণ্ডল দিয়ে যেন জান্নাতের দ্যুতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। আল্লাহর রাসূল (সা.) হযরত মুসআবের এই অবস্থা দেখে চোখের পানি ধরে রাখতে পারলেন না।

সাহাবায়ে কেরাম এতক্ষণ নীরবে চোখের পানি ফেলছিলেন, রাসূলের চোখে পানি ঝরতে দেখে সহাবায়ে কেরাম ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। তাঁকে কাফন

www.amarboi.org

দেয়ার মত ছোট এক টুকরা কাপড় ছাড়া আর কিছুই পাওয়া গেল না। সে কাপড় দিয়ে পা ঢাকলে মাথা উন্মুক্ত থাকে, মাথা ঢাকলে পা উন্মুক্ত থাকে। তিনি ছিলেন মক্কার ধনীর আদরের দুলাল। তাঁর কাফনের আজ এই করুণ অবস্থা। অথচ ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তাঁর মত জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক আর সুগন্ধি কেউ ব্যবহার করতো না। আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি তরুণ বয়সেই পৃথিবীর সমস্ত বিলাসিতা আর ধন-সম্পদের পাহাড়কে পদাঘাত করে রাসূলের সাথী হয়েছিলেন। হযরত মুসআব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু অত্যন্ত সুদর্শন ও বিশাল ধন-সম্পদের উত্তরাধিকারী ছিলেন। দৃষ্টি আকর্ষণকারী মূল্যবান পোশাক ব্যবহার করা ছিল তাঁর অভ্যাস। শরীরে তিনি এমন সুগন্ধি ব্যবহার করতেন যে, তাঁর বিচরণ ক্ষেত্র আকর্ষণীয় গন্ধে আমোদিত হয়ে উঠতো। ওহুদের যুদ্ধে তাঁর মা ছিল ইসলামের শত্রুদের দলে। ইসলাম গ্রহণের অপরাধে তাঁর মা তাঁকে বন্দী করে রাখতো। অসহনীয় অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে তিনি আবিসিনিয়ায় হিজরত করেছিলেন। নবী করীম (সা.) ইসলামের প্রথম দূত হিসেবেই তাঁকে মক্কা থেকে মদিনায় প্রেরণ করেছিলেন। মদিনার ঘরে ঘরে ইসলামের আলো জ্বালিয়ে দেয়ার একক কৃতিত্ব যেন তাঁরই।[১৬১]

হযরত হানযালা (রা.) এর শাহাদাত

হযরত হানযালা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ওহুদের যুদ্ধে প্রথমে যোগ দিতে পারেননি। ছিলেন সুন্দর সুঠাম দেহের অধিকারী সুদর্শন যুবক। কথিত রয়েছে, সুন্দরী তন্বী-তরুণী এক ষোড়শীকে তিনি সবেমাত্র পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করেছিলেন। সেদিন ছিল তাঁর বাসর রাত। স্ত্রীকে নিয়ে তিনি বাসর রাত অতিবাহিত করেছেন। ফরজ গোছল আদায়ের প্রস্তুতি গ্রহণ করছেন হযরত হানযালা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু। এমন সময় তিনি সংবাদ পেলেন ওহুদের ময়দানে আল্লাহর রাসূল (সা.) বাতিল কর্তৃক আক্রান্ত হয়েছেন। তিনি ফরজ গোছল উপেক্ষা করে তরবারি হাতে ওহুদের ময়দানের দিকে ছুটলেন। আল্লাহর এই ব্যঘ্র 'আল্লাহু আকবার' বলে গর্জন করে শত্রু বাহিনীর ভেতরে প্রবেশ করে শত্রু নিধন করতে থাকলেন। শত্রুর অস্ত্রের আঘাতে এক সময় তিনি শাহাদাত বরণ করলেন। যুদ্ধ শেষে নবী করীম (সা.) শহীদানদের দাফন করছেন। এমন সময় হযরত হানযালা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর সদ্য বিবাহিতা এবং বিধবা স্ত্রী এসে আল্লাহর রাসূলকে জানালেন, 'হে আল্লাহর রাসূল (সা.) আমার স্বামীর ওপর গোছল ফরজ ছিল, তাঁকে গোছল না দিয়ে দাফন করবেন না।'

---

১৬১ মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী, ঈমানের অগ্নিপরীক্ষা।

www.amarboi.org

নবী করীম (সা.) তাঁর প্রিয় সাহাবীর লাশের সন্ধান করবেন, এ সময়ে হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম এসে নবীকে অবগত করলেন, ইয়া রাসূল (সা.)! হানযালাকে গোছল দেয়ার কোন প্রয়োজন নেই। মহান আল্লাহ তাঁর ওপর এত খুশি হয়েছেন যে, ফেরেশতাদের মাধ্যমে তাঁকে গোছল করিয়েছেন।' রাসূল (সা.) সাহাবায়ে কেরামকে এ কথা জানিয়ে দিলেন। উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম হযরত হানযালা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর লাশের কাছে গিয়ে দেখলেন, তাঁর লাশ থেকে জান্নাতি সুঘ্রাণ ছড়িয়ে পড়ছে আর মাথার চুল ও মুখের দাড়ি থেকে সুগন্ধযুক্ত পানি ঝরছে। পৃথিবীর সমস্ত আকর্ষণের মাথায় পদাঘাত করে হযরত হানযালা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ওহুদের রণক্ষেত্রে ছুটে এসেছিলেন। মহান আল্লাহ তাঁকে তাঁর এই উত্তম কর্মের পুরস্কার কিভাবে দান করেছিলেন, পৃথিবীর মানুষ তা ওহুদের রণক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ করেছিল।

হযরত আমর ইবনে জমুহ্ (রা.) এর শাহাদাত

হযরত আমর ইবনে জুমুহ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ছিলেন পঙ্গু। মসজিদে নব্বীর অদূরেই তিনি বাস করতেন। নবীর এই সাহাবী ঠিকভাবে হাঁটতে পারতেন না। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতেন তিনি। তবুও তিনি যুদ্ধে যাবেন। পিতার জিদ দেখে তাঁর সন্তানগণ তাঁকে আটকিয়ে রেখে তাঁর চার সন্তান ওহুদের দিকে যাওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করলো। তিনি নবী করীম (সা.) এর কাছে উপস্থিত হয়ে আবেদন করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমার সন্তানগণ আমাকে যুদ্ধে যেতে দিতে দিচ্ছে না। আমার ইচ্ছা আমি আল্লাহর পথে শাহাদাতবরণ করে জান্নাতে এভাবে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটবো।'

নবী করীম (সা.) তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'আল্লাহ তোমাকে জিহাদের দায়িত্ব থেকে মুক্তিদান করেছেন। এরপর তিনি হযরত আমরের সন্তানদের বললেন, 'তোমাদের পিতা যদি যেতে চায় তাহলে বাধা না দিলেও পারো। আল্লাহ তাঁর ভাগ্যে শাহাদাত লিখে রাখতে পারেন।'

হযরত আমরের সন্তানগণ ওহুদের দিকে চলে গেল। তিনি ভাবলেন, তাঁর সন্তানগণ যদি শাহাদাতবরণ করে, তাহলে তাঁর আগেই তাঁরা আল্লাহর জান্নাতে যাবে। হযরত আমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু দেখলেন, একজন কিশোর তরবারি ঝুলিয়ে তাঁর দিকেই আসছে। কিশোর এসে তাঁর কাছে দোয়া চেয়ে ওহুদের দিকে চলে গেল। তিনি নিজেকে আর স্থির রাখতে পারলেন না। তিনি আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন, 'হে আমার আল্লাহ! তুমি আমাকে আর আমার বাড়িতে ফিরিয়ে এনো না।'

www.amarboi.org

হযরত আমর ইবনে জমুহ রাদিয়াল্লাহ তা'য়ালা আনহু ওহুদের রণপ্রান্তরে উপস্থিত হলেন। মক্কার ইসলামবিরোধী বাহিনীর ভেতরে তিনি প্রবেশ করে বীর বিক্রমে আক্রমণ করলেন। তিনি তাকিয়ে দেখলেন, তাঁর আশপাশেই তাঁর সন্তানগণ যুদ্ধ করছে। তাঁর চোখের সামনে একে একে তাঁর চার সন্তান শাহাদাতবরণ করলেন। কাফিরদের শাণিত অস্ত্র এক সময় তাঁর পঙ্গু দেহকে দ্বিখণ্ডিত করে দিল। তিনি শাহাদাতবরণ করলেন। হযরত আমরের স্ত্রী তাঁর স্বামীর এবং সন্তানদের লাশ গ্রহণ করার জন্য উট নিয়ে রাসূলের সামনে ওহুদের ময়দানে এলেন। লাশ উটের পিঠে উঠিয়ে তিনি উটকে বাড়ির দিকে নিতে চাইলেন। উট স্থির থাকলো। রাসূলকে এ কথা জানানোর পর তিনি হযরত আমরের স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার স্বামী বাড়ি থেকে আসার সময় কি কিছু বলেছিল?'

হযরত আমর ইবনে জমুহ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর স্ত্রী জানালেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমার স্বামী আল্লাহর কাছে দোয়া করে বলেছিল, 'হে আমার আল্লাহ! তুমি আমাকে আর আমার বাড়িতে ফিরিয়ে এনো না।' এ কথা শোনার পর আল্লাহর নবী করীম (সা.) বললেন, 'আল্লাহ আমরের দোয়া কবুল করে নিয়েছেন। তাকে ওহুদের ময়দানেই অন্তিম শয়ানে শুইয়ে দাও।'

হযরত আনাস বিন নযর (রা.)-এর শাহাদাত

হযরত আনাস বিন নযর একজন আল্লাহর রাসূলের সম্মানিত সাহাবী ছিলেন। তিনি বদরের যুদ্ধে যোগ দিতে পারেননি। এ কারণে তিনি এই বলে আক্ষেপ করতেন, ইসলামের গৌরবোজ্জ্বল প্রথম যুদ্ধে সকলেই অংশগ্রহণ করলো। কেউ শহীদ কেউ গাজী হয়ে ইসলামের ইতিহাসে অমর হয়ে রইলো আর আমি হতভাগ্য এতে যোগ দেয়ার কোন সুযোগই পেলাম না।

দুঃখ ও আক্ষেপে অত্যন্ত মনোক্ষুণ্ন হয়ে তিনি সঙ্কল্প করলেন যে, যদি ভবিষ্যতে কোন জিহাদের সুযোগ মিলে তবে তাঁর এই অসম্পূর্ণ আকাঙ্ক্ষা নিয়ে যুদ্ধে যোগ দেবেন। ওহুদের যুদ্ধে প্রথমতঃ মুসলমানদের বিজয় লাভ হয়, কিন্তু শেষ দিকে একটি মাত্র ভুলে জন্য তাঁদেরকে পরাজয় বরণ করতে হয়েছিল। তাঁদের এই ভুলটি নবী করীম (সা.) এর আদেশ অমান্য করার কারণেই সংঘটিত হয়েছিল। আল্লাহর নবী পঞ্চাশ জন তীরন্দাজকে ওহুদ পর্বতের পেছনের দিকে একটি গিরিপথ প্রহরা দেয়ার জন্য আদেশ দিয়েছিলেন। তাঁদের নির্দেশ ছিলো, কোন অবস্থাতেই যেন তারা ঐ স্থান পরিত্যাগ না করেন। কারণ ঐ পথ দিয়ে শত্রুদের আক্রমণ করার আশঙ্কা ছিল।

www.amarboi.org

যুদ্ধের শুরুতেই মুসলমানদের যখন বিজয় ঘটলো এবং কাফিরা ছত্রভঙ্গ হয়ে এদিকে ওদিক ছুটে পালাতে লাগলো, তখন সেই তীরন্দাযগণ মনে করলেন যে, যুদ্ধ শেষ হয়ে গিয়েছে এখন ঐ স্থান পরিত্যাগ করে শত্রুগণের পশ্চাদ্ধাবন করা এবং তাদের পরিত্যক্ত সম্পদ কুড়িয়ে নেয়া যেতে পারে। তাঁদের নেতা তাঁদেরকে স্থান ত্যাগ করতে নিষেধও করেছিলেন এবং আল্লাহর নবীর আদেশের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরা মনে করলেন যে, আল্লাহর নবীর আদেশ শুধু যুদ্ধের সময়ের জন্যই দেয়া হয়েছিল অন্য সময়ের জন্য তা প্রযোজ্য নয়। এ কথা মনে করে তাঁরা ঐ স্থান পরিত্যাগ করে যুদ্ধক্ষেত্রে এসে উপস্থিত হলেন এবং শত্রুর পরিত্যক্ত সম্পদ কুড়াতে আরম্ভ করলেন।

পলায়নরত শত্রুরা গিরিপথটি অরক্ষিত অবস্থায় দেখতে পেয়ে প্রতি আক্রমণের মহাসুযোগ পেয়ে গেলো। তারা ঐ পথ দিয়ে প্রবেশ করে অপ্রস্তুত মুসলমানদের ওপর প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করলো। এ অতর্কিত আক্রমণে মুসলমানরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়লেন। সামনে ও পেছনে দু'দিকের আক্রমণে তারা শত্রুর দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে পড়লেন। এবং নিতান্ত অসহায়ের মতো প্রতিপক্ষের হাতে নির্মমভাবে শাহাদাত বরণ করতে লাগলেন।

হযরত আনাস মুসলমানদের এ দুরবস্থা দেখ অত্যন্ত মর্মাহত হলেন। তার সম্মুখে হযরত সায়াদকে দেখতে পেয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় যাচ্ছো সায়াদ? আল্লাহর কসম আমি ওহুদের পর্বত থেকে জান্নাতের খুশবু পাচ্ছি। এই কথা বলেই তিনি শত্রুদের মধ্যে ঢুকে পড়লেন এবং যে পর্যন্ত না শহীদ হলেন, অবিরত তলোয়ার চালিয়ে গেলেন।

যুদ্ধ শেষে শহীদানদের লাশ দাফন-কাফনের জন্য একত্রিত করা হলো। হযরত আনাসের লাশ এমনভাবে বিকৃত করা হয়েছিলো যে, কারো পক্ষে তা সনাক্ত করা সম্ভব ছিলো না। নানা ধরনের অস্ত্রের আঘাতে তাঁর লাশ ক্ষত-বিক্ষত ও রক্তাক্ত হয়ে গিয়েছিলো। তাঁর বোন তাঁর হাতের একটি আঙুল দেখে লাশ সনাক্ত করেছিলেন। যাঁরা অকৃত্রিম মন-মানসিকতা নিয়ে আল্লাহর কাজে নিজেকে বিলিয়ে দেন, তাঁরা বাস্তবিকই পৃথিবীতে জান্নাতের সুগন্ধ পেয়ে থাকেন; হযরত আনাস জীবিত অবস্থায় জান্নাতের সুগন্ধ পেয়েছিলেন।

ওসমান ইবনে মাজউন (রা.)-এর উজ্জ্বল ঈমান

ওসমান ইবনে মাজউর (রা.) ইসলাম গ্রহণের পরও ওলিদ ইবনে মুগিরার নিরাপত্তায় ছিলেন। কিন্তু মক্কায় রাসূল (সা.) এবং সাহাবাদের ওপর নির্যাতনের দৃশ্য দেখে তিনি স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি মানবিক যন্ত্রণায় ছটফট করছিলেন। মনে মনে বললেন একজন পৌত্তলিকের অধীনে নিরাপত্তা শান্তিতে

www.amarboi.org

অবস্থান আমার জন্য দুঃখজনক। অথচ আমার সঙ্গীরা পৌত্তলিকদের অত্যাচারের যাঁতাকলে পিষ্ট হচ্ছেন।

হযরত ওসমান (রা.) ওলিদের কাছে গেলেন এবং ধন্যবাদের সাথে তাকে দেয়া নিরাপত্তার সুযোগ প্রত্যাখ্যান করলেন। ওলিদের নিরাপত্তা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর একজন পৌত্তলিক অকারণে হযরত ওসমান ইবনে মাজউন (রা.)-কে চপেটাঘাত করলো এবং ঝগড়া বাধিয়ে দিল। সেই আঘাত এমনভাবে করা হয়েছিলো যে, হযরত ওসমানের একটা চোখ অন্ধ হয়ে গেলো। তার এ অবস্থায় একজন সাহাবী বলেলেন, ওহে ওসমান তুমি ক্ষমতাদর্পী ওলিদের নিরাপত্তায় ছিলে। বড় শান্তিতে ছিলে অথচ সে সুযোগ প্রত্যাখ্যান করেছো। যদি প্রত্যাখ্যান না করতে তবে আজ তোমাকে একটি চোখ হারাতে হতো না। হযরত ওসমান বললেন, আল্লাহর পানাহ অধিকতর নির্ভরযোগ্য এবং সম্মানজনক। আমার যে চোখে দৃষ্টি আছে সেই চোখের চেয়ে অন্ধ হয়ে যাওয়া চোখ বেশি মূল্যবান। রাসূল (সা.) এবং তাঁর সাহাবীদের জীবনে আমাদের জন্য উত্তম আদর্শ বিদ্যমান রয়েছে। কঠিন পরীক্ষকালীন সময়ে হযরত ওসমানকে অমুসলিমদের পক্ষ থেকে পুনরায় নিরাপত্তা হেফাযতে থাকার প্রস্তাব দেয় হয়। কিন্তু তিনি সে সুযোগ গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পথে অবিচল থাকার কথা জানিয়ে দেন। ওলিদ ইবনে মুগিরা নিজেও ওসমানের কাছে এসে এই প্রস্তাব দিয়েছিলো, কিন্তু তিনি এতটুকু নমনীয় হলেন না। তিনি দৃঢ়তার সাথে বললেন, আল্লাহর আশ্রয় ছাড়া অন্য কারো আশ্রয়ের আমার দরকার নেই।

আল্লাহর প্রেমে পাগলপারা

হযরত আবু ফকিহা (রা.) ইসলাম প্রচারের প্রথম দিকেই ইসলামে দীক্ষিত হন। তিনি মক্কার বিশিষ্ট সরদার উমাইয়া ইবনে খালফের ক্রীতদাস ছিলেন। আবু ফকিহা ইসলাম গ্রহণ করার কারণে তার মালিক ভীষণ নাখোশ হয়। দুর্বৃত্ত স্বভাব মালিক উমাইয়া আবু ফকিহা (রা.)-কে নানাভাবে নির্যাতন করতে থাকে। আবু ফকিহার দুই পা দড়িতে বেঁধে মক্কার উঁচু-নিচু জমিতে টেনে নেয়া হতো। এতে হযরত আবু ফকিহার সারা দেহ রক্তাক্ত হয়ে যেতো। এরপর মক্কার উত্তপ্ত বালুকাময় মরুভূমিতে শুইয়ে বুকে ভারী পাথর চাপা দেয়া হতো। হযরত আবু ফকিহার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসতো। উমাইয়া ইবনে খালফের ভাই উবাই ইবনে খালফ ছিলো ইসলামের শত্রুতায় উমাইয়ার চেয়েও ভয়ঙ্কর। সে তার ভাইকে বলতো আরো বেশি অত্যাচার করো। তার ওপর এতো বেশি নির্যাতন এতো বেশি অত্যাচার করা হতো যে, হযরত আবু ফকিহা বেহুঁশ হয়ে যেতেন। মাঝে মাঝে শত্রুরা মনে করতো আবু ফকিহা হয়তো শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন।

www.amarboi.org

একজন বিশিষ্ট সাহাবা হযরত আবু ফকিহাকে ক্রয় করে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মুক্ত করে দেন। আবু ফকিহার নাম ছিলো ইয়াসার।

শাহাদাতের প্রেরণা

রাসূলে আকরাম (সা.) বদরের যুদ্ধের জন্যে রওনা হওয়ার সময়ে ছোট বালকদেরকে সেনাদল থেকে ফিরিয়ে দিলেন। আমর ইবনে ওয়াক্কাসের বয়স ছিলো ১৬ বছর। তাকে ফিরে যেতে বলা হলে তিনি কাঁদতে শুরু করলেন। তার জোরালো আবেদনের পর অবশেষে তাকে জেহাদে অংশগ্রহণের অনুমতি দেয়া হলো। বদরের যুদ্ধে তিনি বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেন এবং শহীদ হন। একজন আনসার যুবককে রাসূল (সা.) জেহাদে অংশগ্রহণের অনুমিত দিলে সামুরা ইবনে যুন্দবও অনুমতি চান। তিনি ছিলেন বেঁটে এবং বয়সে ছোট। এ কারণে রাসূল (সা.) তাকে অনুমতি দিলেন না। হযরত সামুরা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি অমুককে অনুমতি দিলেন অথচ কুস্তিতে তাকে আমি হারিয়ে দিতে পারি। রাসূল (সা.) বললেন, ঠিক আছে তবে কুস্তি লড়ে দেখাও। উভয়ের মধ্যে কুস্তি হলো। সামুরা তার সাথীকে চিৎপাত করে ফেললেন। এরপর তাকে যুদ্ধে অংশগ্রহণের অনুমতি দেয়া হলো।

www.amarboi.org

যুগে যুগে নির্যাতন

ইমাম আবু হানিফা (রহ)

ইমাম আবু হানিফা প্রধান বিচারপতি হওয়ার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় খলিফা আবুল মুনসুর ইমাম আবু হানিফাকে ৩০টি বেত্রাঘাত করে জখম করে এবং তাকে এক হাজার দিরহাম দিলে তিনি তাও প্রত্যাখ্যান করেন। ফলে তাকে চাবুকাঘাত, নজরবন্দী করে আটকে রাখে। পরে বিষপানে তার মৃত্যু হয়।

ইমাম মালেক (রহ)

খলিফা মুনসুরের চাচাতো ভাই মদিনার গভর্নর জাফরের নির্দেশে ইমাম মালেককে কথামতো ফতোয়া আদায় করতে দেহের কাপড় খুলে চাবুকাঘাত করে এবং ক্ষত বিক্ষত দেহ নিয়ে উটের ওপর বসিয়ে সারা শহর প্রদক্ষিণ করানো হয়।

ইমাম হাম্বল (রহ)

হিজরিতে মুতাজিলা আকিদায় বিশ্বাস করাতে ইমাম আহমদ ইবন হাম্বলকে হাতে-পায়ে বেড়ি পরিয়ে খলিফা মামুনের দরবারে নিয়ে যাওয়ার জন্য রওয়ানা হলে পথিমধ্যে খলিফার মৃত্যুর খবর আসে। পরবর্তীতে মুতাসিমের সময় ইমামকে চারটি ভারী বেড়ি পরিয়ে রমজান মাসে রোদে বসিয়ে চাবুকাঘাত করা হয়। তিনি সংজ্ঞাহীন হলে তলোয়ার ফলা দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তার সংজ্ঞা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা হয়।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া

ইমাম ইবনে তাইমিয়াকে ৭২০ হিরজিতে ফতোয়া দেয়াকে কেন্দ্র করে ইমাম ইবনে তাইমিয়াকে একাধিকবার নজরবন্দী ও কারাবরণ করতে হয়েছে। সপ্তম অষ্টম হিজরি শতকে ইবনে তাইমিয়া ছিল একটি নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের নাম। তিনি সংগ্রাম করেন শিরক ও বিদআতের বিরুদ্ধে। তিনি সংগ্রাম করেন অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে, জুলুম ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে। তাঁর নির্ভীক ও বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বরে অমিততেজ রাজশক্তির হৃদয়ও কেঁপে ওঠে। দুর্জনদের পরামর্শে পরাক্রান্ত রাজশক্তি তাঁকে লৌহ কপাটের অন্তরালে নিক্ষেপ করে। কারাগারে বসেও তিনি লেখনী চালাতে থাকেন অতি দ্রুত বেগে। তাঁর নির্জলা সত্যের প্রকাশে কারাপ্রাচীর বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। বিরোধী পক্ষ হিংসার আগুনে তাঁকে পুড়িয়ে ছারখার করে ফেলতে চায়। এবার রাজার হুকুমে তাঁর কাছ থেকে বইপত্র, খাতা, কলম, কালি দোয়াত সব কিছুই ছিনিয়ে নেয়া হয়, তবুও তিনি

www.amarboi.org

দমেননি। ছেঁড়া টুকরো কাগজ জমা করে কয়লা দিয়ে তাতে লিখতে থাকেন। এভাবে সত্যের নির্ভীক সেনানী আমৃত্যু লড়ে যেতে থাকেন অসত্যের বিরুদ্ধে।

তাঁর সাতষট্টি বছরের জীবনকাল ছিল মিথ্যা ও বাতিল, অন্যায় ও অসত্যের ন্যক্কারজনক পরাজয়ের ইতিবৃত্ত। ইবনে তাইমিয়ার খুরধার লেখনী আজও মিথ্যা ও বাতিলের পরাজয়ের কাহিনী লিখে চলছে।

কুরআন ও সুন্নাহ হচ্ছে ইসলামের সত্য জ্ঞানের দু'টি মূল উৎস। ইমাম ইবনে তাইমিয়া ইসলামী জ্ঞানের সমস্ত শাখা-প্রশাখাকে আবার এই মূল উৎস দু'টির সাথে সংযুক্ত করে দিয়ে যান। এর জন্য তাঁর সমস্ত ইসলামী যোগ্যতা ও বুদ্ধিবৃত্তিকে ব্যবহার করেন। এ পথে তিনি কোন দোর্দণ্ড প্রতাপ শাসক ও অসীম ক্ষমতাধর প্রতিপক্ষের রক্তচক্ষুকে একটুও আমল দেননি। সত্যের জন্য তাঁর এই অকুতোভয় সংগ্রাম ও সাধনা কিয়ামত পর্যন্ত এই মিল্লাতকে জীবনীশক্তি জোগাতে থাকবে। ইবনে তাইমিয়ার মতো মনীষী তাই যেমন হাজার বছরে জন্মে না তেমনি হাজার বছরেও তার মৃত্যু হয় না।

সাইয়েদ কুতুব (রহ)

১৯৪৫ সালে জামাল আব্দুল নাসের ও ইংরেজদের মধ্যে চুক্তি হয় ইখওয়ান ও মিসর চুক্তির বিরোধিতা করলে চালানো হয় দমন-নিপীড়ন ও নির্যাতন। কয়েক সপ্তাহে সাইয়েদ কুতুবসহ ৫৩ হাজার নেতাকর্মীকে কারাবন্দী করা হয়। জ্বরে আক্রান্ত কুতুবকে চালানো হয় ৬ ঘণ্টার সশস্ত্র অমানবিক নির্যাতন। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর কামড়িয়ে সাইয়েদ কুতুবকে এদিক সেদিক নিয়ে যেত। এরপর রক্তাক্ত অবস্থায় ৭ ঘণ্টার রিমান্ডে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে তাকে। আগুন দ্বারা সারা শরীর ঝলসে দেয়া হয়। মাথার ওপর উত্তপ্ত গরম পানি দিয়ে আবার ঢালা হতো বরফ। পুলিশের লাথি আর ঘুষি ছিলো। এদিক থেকে অন্য দিকে নেয়ার মাধ্যম একাধারে ৪ দিন খাওয়া দাওয়া ছাড়া বসিয়ে রাখা হতো।

১ বছর পর প্রস্তাব দেয়া হয় সরকারের পক্ষ থেকে এই বলে যদি আপনি ক্ষমা চেয়ে কয়েকটি লাইন লিখে দেন, যা বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশ করা হবে। তাহলে আপনাদের মুক্তি দেয়া হবে।

কুতুব জবাব দিলেন, 'আমার অবাক লাগে যে, এ সকল লোক মজলুমকে বলছে জালিমের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চাইতে। আল্লাহর শপথ! যদি কয়েকটি শব্দ উচ্চারণের ফলে আমাকে ফাঁসির মঞ্চ থেকে নাজাত দেয় তবু আমি তা বলতে প্রস্তুত নই। আমি আমার রবের দরবারে এমনভাবে হাজির হতে চাই যে, আমি তার ওপর সন্তুষ্ট আর তিনি আমার ওপর সন্তুষ্ট।

www.amarboi.org

জেলখানায় যখন তাকে ক্ষমা চাইতে বলা হতো তখন তিনি বলতেন, যদি আমাকে কারাবন্দী করা সঠিক হয় তাহলে সঠিক সিদ্ধান্তের ওপর আমার সন্তুষ্ট থাকা উচিত। আর যদি অন্যায়ভাবে আমাকে আটক রাখা হয় তাহলে আমি জালিমের কাছে করুণা ভিক্ষা চাইতে রাজি নই। এরপর তাকে সরকার শিক্ষামন্ত্রীর পদ দিতে টোপ দেয়। তিনি বলেন, আমি দুঃখিত। মন্ত্রিত্ব গ্রহণ আমার পক্ষে সেই পর্যন্ত সম্ভব নয়, যতক্ষণ মিসরের পুরো শিক্ষাব্যবস্থাকে ইসলামী ছাঁচে ঢেলে সাজানোর এখতিয়ার দেয়া না হবে। ইখওয়ানের কাউকে পেট্রল ঢেলে আগুনে নিক্ষেপ, শরীরে সিগারেটের আগুন ও লোহার শেকলে বেঁধে বৈদ্যুতিক শক, উলঙ্গ করে ভাইয়ের সামনে বোনকে নির্যাতন করা ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। ১৯৬৬ সালের ২৮ আগস্ট রাতে সাইয়েদ কুতুব তার সঙ্গী মুহাম্মদ হাওয়াল ও ভোররাতে তাদের ফাঁসি কার্যকর করা হলো।

ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইল্লাইহি রাজিউন। তিনি চলে গেলেন আল্লাহর সান্নিধ্যে। তার জীবন ও কর্ম অনাগত পৃথিবীর জন্য প্রযোজ্য রেখে গেলেন ঐতিহাসিক সাহসী দৃষ্টান্ত।

সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী (রহ)

মাওলানা মওদূদী (রহ)কে ১৯৪৮ সালে ৪ঠা অক্টোবর পাকিস্তান সরকার জননিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার করে।

অনেকবার তিনি কারাবরণ করেছিলেন। আবার আন্দোলনের মুখে মুক্তও হয়েছেন। মাওলানা মওদূদী কাদিয়ানি সমস্যা শীর্ষক একটি গ্রন্থ রচনার জন্য সামরিক আদালত মওদূদীকে মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রদান করেন। মাওলানা মওদূদীকে যখন উক্ত আদেশ শোনানো হয়, তিনি তখন শান্ত। ফাঁসির সেলে নিজেই হেঁটে যান। মওদূদীকে প্রাণভিক্ষা করার কথা বলা হলো। তিনি তা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে বলেন, আপনারা মনে রাখবেন আমি কোন অপরাধ করিনি। আমি কিছুতেই তাদের কাছে প্রাণভিক্ষা চাইব না এবং আমার পক্ষে অন্য কেউ যেন প্রাণভিক্ষা না চায়। না আমার মা, না আমার ভাই, না আমার স্ত্রী-পুত্র পরিজন। জামায়াতের লোকদের কাছেও আমার এই অনুরোধ।

কারণ জীবন ও মরণের সিদ্ধান্ত হয় আসমানে, জমিনে নয়। তিনি শাহাদাতের জন্য প্রস্তুত হন। এই আদেশ রেডিও-টিভিতে প্রচারিত হওয়ার পর দেশে-বিদেশে প্রতিবাদে সরকারও ফাঁসির আদেশ কারাদণ্ডে রূপান্তরিত করে। তারপরও বিশ্বব্যাপী প্রতিবাদের ঝড় অব্যাহত থাকলে পাকিস্তান সরকার ১৯৫৫ সালে মাওলানা মওদূদীকে নিঃশর্ত মুক্তি দিতে বাধ্য হয়।

www.amarboi.org

পঞ্চম অধ্যায়

দুঃসাহসিকতার ইতিহাস যুগে যুগে

পৃথিবীর সকল আন্দোলন এগিয়ে যাওয়ার পেছনে যুবকদের এক ঐতিহাসিক ভূমিকা আছে। সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী বলেছেন-এ কাজের জন্য এমন একদল দুঃসাহসী যুবকের প্রয়োজন, যারা সত্যের প্রতি ঈমান এনে তার ওপর পাহাড়ের মতো অটল হয়ে থাকবে। অন্য কোনো দিকে তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হবে না। পৃথিবীতে যা-ই ঘটুক না কেন, তারা নিজেদের লক্ষ্য উদ্দেশ্যের পথ থেকে এক ইঞ্চিও বিচ্যুত হবে না।

এই কঠিন অবস্থাতে মুহাম্মদ (সা.) এর সাথী কেবল তারাই হলো, যাদের ধ্যান ধারণা ও মনমগজ ছিলো পরিষ্কার ও পরিশুদ্ধ। যাদের মধ্যে যোগ্যতা ছিলো সত্যকে বুঝবার এবং গ্রহণ করবার। যাদের মধ্যে সত্যপ্রিয়তা ছিলো এতটা প্রবল যে, সত্য উপলব্ধির পর সে জন্য অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দেয়ার এবং মৃত্যুকে আলিঙ্গন করবার জন্য তারা ছিলো সদা প্রস্তুত।

আমাদের চেতনার কবি কাজী নজরুল ইসলাম তার নিত্য প্রবল হও কবিতায়-

"আমি তক্‌বীর-ধ্বনি করি শুধু কর্ম-বধির কানে,
সত্যের যারা সৈনিক তারা জমা হবে ময়দানে!
অনাগত "নবযুগ"-সূর্যের তূর্য বাজায়ে যাই,
মৃত্যু বা কারাগারে আমার কোন ভয় দ্বিধা নাই।

ভাগ্যের ওপর বিশ্বাস

এই বিশ্বাসের রয়েছে দু'টি দিক। একটি হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে যাওয়া সিদ্ধান্তের ব্যাপারে তালাঝালা না করে ধৈর্য ধারণ করো। মনকে এই বলে প্রবোধ দাও যে, এ সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হবে না। অন্যটি হচ্ছে নিজের সাধ্য

www.amarboi.org

অনুযায়ী নেকি করার চেষ্টা চালানো এবং পাপ থেকে দূরে থাক। চিন্তা-ভাবনা ছাড়া কোনো কূপে ঝাঁপিয়ে না পড়া।

হুযুর আকরাম (সা.) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কোনো ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানের স্বাদ লাভে সক্ষম হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সে এই বিশ্বাস মনে পোষণ না করে যে, তার ওপর আপতিত বিপদ কোনো অবস্থায়ই না আসা সম্ভব ছিলো না।

আল এছাবা গ্রন্থে হযরত ঈসা (আ.) সম্বন্ধে একটি ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। শয়তান মানুষের আকৃতি ধারণ করে একদিন হযরত ঈসা (আ.)-এর সাথে দেখা করে বললো, আপনি কি একথা বিশ্বাস করেন যে, আপনি তাই পাবেন যা আপনার কপালে লেখা আছে? হযরত ঈসা (আ.) বললেন হ্যাঁ। শয়তান বললো, বেশ তাহলে সামনের ওই উঁচু পাহাড়ে উঠে নিচে লাফ দিন। হযরত ঈসা (আ.) বললেন, আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাকে পরীক্ষা করেন কিন্তু আল্লাহকে পরীক্ষা করার ক্ষমতা বান্দার নেই। (আল এছাবা তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৩)

রবী ইবনে সালেহ বলেন, হাজ্জাজের নির্দেশে হযরত সাঈদ ইবনে যোবায়েরকে গ্রেফতারের পর আমি কাঁদতে লাগলাম। হযরত সাঈদ জিজ্ঞাসা করলেন তুমি কাঁদো কেন? আমি বললাম, আপনার গ্রেফতার হওয়ার বিপদের কথা স্মরণ করে কাঁদছি। হযরত সাঈদ বললেন, না কেঁদো না কিছুতেই না, আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, 'পৃথিবীতে (সামগ্রিকভাবে) অথবা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের ওপর যে বিপর্যয় আসে আমি তা সংঘটিত করার আগেই সেটা লিপিবদ্ধ থাকে। আল্লাহর পক্ষে এটা খুবই সহজ।' (সূরা হাদীদ, আয়াত ২২)

বিপদের মূল্যায়ন

বিপদের মূল্যায়ন এবং ওজন যদি আমরা নিজেদের অপূর্ণ বিচার বুদ্ধি দিয়ে করতে থাকি তবে সেটা হবে বড় রকমের ভুল। আল্লাহ তায়ালার ব্যাপক জ্ঞান এবং সীমাহীন ক্ষমতা আমরা কিভাবে ওজন করতে পারি? ভাগ্যের ওপর যেভাবে ঈমান আনতে বলা হয়েছে আমরা যদি সেভাবে ঈমান আনি এবং নিজেদের যুক্তি দর্শন জ্ঞান প্রয়োগ থেকে বিরত থাকি তবে বহু সমস্যা বহু জটিলতা থেকে মুক্ত থাকতে পারবো। আমাদের জ্ঞানের পরিধি কতটুকু? আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, তোমাদেরকে খুব সামান্য জ্ঞানই দেয়া হয়েছে।

বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত স্থাপন

হযরত আনাস ইবনে মালেকের চাচা আনাস ইবনে নযর (রা.) ওহুদের যুদ্ধের দিন এক বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। হুজুর (সা.) এর শাহাদাতের গুজব ছড়িয়ে পড়ার পর মোনাফেকরা বলাবলি করতে লাগলো, তিনি যদি আল্লাহর

www.amarboi.org

নবী হতেন তাহলে নিহত হতেন না। কেউ কেউ বললো, আহা কেউ যদি আবু সুফিয়ানের কাছে থেকে আমাদেরকে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিতো, হযরত আনাস ইবনে নযর (রা.) এসব কথা শুনে বললেন, মোহাম্মদ (সা.) আল্লাহর রাসূল ছিলেন, তিনি যদি শহীদ হয়েও থাকেন তবে তোমাদের কিসের ভালোবাসা? এসো আমরা লড়াই করি শাহাদাত বরণ করি। এরপর আল্লাহকে বললেন, হে আল্লাহ তায়ালা! ওরা যা বলেছে আমি তা থেকে মুক্ত। আমার মনোভাব ওদের মতো নয়। এরপর হযরত আনাস ইবনে নযর (রা.) পাগলের মতো প্রবল বিক্রমে লড়াই করে শহীদ হয়ে গেলেন।

সত্যের পতঙ্গেরা এভাবে সত্যের জন্য জীবন উৎসর্গ করতেন। সকল অবস্থায় তারা আল্লাহর আনুগত্যে অটল অবিচল থাকতেন। সাফল্য-অসাফল্য কোনো অবস্থায়ই তারা আল্লাহর কাছে কোনো অভিযোগ করতেন না। অথচ যারা প্রবৃত্তির দাস তাদের অবস্থা সম্পূর্ণ আলাদা। তাদের জ্ঞান বুদ্ধি বিবেচনা বক্র এবং তারা পথভ্রষ্ট হয়ে যায়। আল্লাহ তায়ালা রব্বুল আলামিন বলেন, 'তিনিই আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সত্য প্রতিপালক। সত্য ত্যাগ করার পর বিভ্রান্তি ছাড়া আর কী থাকে? কাজেই তোমরা কোথায় চালিত হচ্ছো?' (সূরা ইউনূস আয়াত ৩২)

হযরত ওমর (রা.)-ইসলাম গ্রহণের আগে

রাসূল (সা.)-এর এই কথা সত্য প্রমাণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, খিয়ারুকুম ফিল জাহেলিয়াতে ওয়া খিয়ারুকুম ফিল ইসলাম।' অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে জাহেলি যুগে যারা উৎকৃষ্ট ছিলো ইসলামী যুগেও তারা উত্তম হবে। তবে শর্ত হচ্ছে যে, ইসলামকে বুঝতে হবে। হযরত ওমর (রা.) ইসলামকে ঠিক সে রকমই বুঝতেন যে রকম বোঝা উচিত। ইসলাম গ্রহণের আগেও হযরত ওমর (রা.) অত্যন্ত তেজি স্বভাবের এবং অনমনীয় ব্যক্তিত্বের মানুষ ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পরও তাঁর এই বৈশিষ্ট্য অটুট ছিলো। তবে ইসলাম তার মধ্যে নমনীয়তা এবং বিনয় সৃষ্টি করেছিলো। এই বিনয় নম্রতা এবং নির্বিলাস জীবন যাপনের অভ্যাস খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর আরো বেড়ে গিয়েছিলো। তার পৌরুষ, বীরত্ব এবং সাহসিকতা এমন ছিলো যে, হিজরতের সফর তিনি গোপনভাবে করেননি বরং মদিনায় রওনা হওয়ার আগে তিনি প্রকাশ্যে মদিনা যাওয়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন। মক্কার একটি উঁচু পাহাড়ের চূড়ায় আরোহণ করে তিনি কোরাইশ নেতাদের চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে বলেছিলেন, ওহে ইসলামের শত্রুরা, তোমরা শুনে রাখো ওমর মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করছে। কেউ যদি তার মাকে কাঁদাতে চায়, স্ত্রীকে বিধবা করতে চায় সন্তানদের এতিম করতে চায় তবে

www.amarboi.org

সে যেন সামনের ওই প্রান্তরে এসে আমার সাথে মোকাবেলা করে। মক্কার কোনো বাপের বেটা ওমর (রা.)-এর এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণের সাহস করেনি।

সত্যের পথে দৃঢ়তা

হযরত ওমর (রা.)-এর অনুভূতিপ্রবণ স্বভাব অসম সাহসিকতা, পৌরুষ, আইয়ামে জাহেলিয়াতে ছিলো কিংবদন্তিতুল্য। ইসলাম গ্রহণের পরও তার এসব গুণাবলি অটুট ছিলো। ইসলাম তার গুণাবলিকে মিথ্যা থেকে সত্যের দিকে ফিরিয়ে দিয়েছিলো। ইসলাম গ্রহণের পরই হযরত ওমর (রা.) ঘোষণা করেছিলেন যে, চুপিসারে এবং গোপনে গোপনে ইসলামের কাজ করার দরকার নেই। আমি নিজে ইসলাম প্রচারের কথা জোর গলায় সবাইকে জানিয়ে দেবো। সত্যের অনুসারীদের কাছে সাহসিকতা আত্মসম্মান পৌরুষের নিদর্শন। এসব গুণবৈশিষ্ট্যের কারণেই তিনি কারো তোয়াক্কা না করে হকের সাহায্যে বুক টান করে দাঁড়িয়েছিলেন। সত্য যদি কারো কাছে প্রকাশ হয়ে যায় এবং তিনি সেই সত্য মনেপ্রাণে গ্রহণ করেন তবে কোনো প্রকার কষ্ট নির্যাতন তাকে টলাতে পারে না। স্বাধীনভাবে কাজ করার অধিকার যদি হারিয়ে যায়, শারীরিক নির্যাতন শুরু হয় এমনকি জীবন যদি বিপন্ন হয়ে ওঠে তবে জীবন উৎসর্গ করার জন্যও সত্যের সৈনিক প্রস্তুত থাকেন। সত্যের পথে এই অবিচল দৃঢ়তা পুণ্যের বিচার অনেক বড়। এ কাজের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব রাসূল (সা.)-এর নিম্নোক্ত দু'টি হাদিস থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়।

রাসূল (সা.) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ যদি সত্যের কালেমা উচ্চারণ এবং মিথ্যা প্রতিরোধের জন্যে যুক্তি প্রদর্শন করে এবং নিজের প্রচেষ্টায় হক-এর সাহায্যের জন্য কাজ করে সেই ব্যক্তির এই কাজ আমার সঙ্গে হিজরত করার চেয়ে বেশি উত্তম বিবেচিত হবে।

রাসূল (সা.) আরো বলেন, ইসলামের পথে কারো এক ঘন্টার কষ্ট সহ্য করা এবং দৃঢ়পদ থাকা তার ৪০ বছর এবাদতের চেয়ে উত্তম।

মোমেনের অস্ত্র আল্লাহর ওপর ভরসা

বিপদের আশঙ্কা স্বভাবতই মানব মনে ভয়ের সৃষ্টি করে। স্বাভাবিক কারণেই মানুষ অজ্ঞাত বিপদের আশঙ্কা এবং পরিণামের চিন্তায় ভয় পেয়ে যায়। কিন্তু মোমেন বান্দা এ ধরনের ভয় পায় না। সত্য-মিথ্যা বা হক-বাতিলের দ্বন্দ্ব চিরন্তন এবং চিরস্থায়ী। এ ধরনের দ্বন্দ্ব দেখে আমরা যেন নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন না করি। উত্তাল ঢেউয়ের মধ্যে লাফিয়ে পড়ে হাত পা নড়াচড়া করে বাঁচার চেষ্টা

www.amarboi.org

করতে হবে। ঢেউয়ের সামনে আত্মসমর্পণ করা পৌরুষের প্রমাণ হতে পারে না। আল্লাহর পথে রয়েছে চেষ্টা সাধনা এবং সংগ্রাম। এটা বড়ই সৌভাগ্যের কাজ। আমাদের ভাগ্যে যা কিছু নির্ধারিত রয়েছে তা থেকে মুক্তির উপায় নেই। মৃত্যু তো সময় মতোই আসবে। অবশ্যই আসবে। বীর পুরুষের মতো মৃত্যুর সামনে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে জান কোরবান করে দেয়া নতজানু হয়ে জীবন ভিক্ষা চাওয়ার চেয়ে উত্তম। ধৈর্য এবং সত্যবাদিতার সাথে যারা জেহাদ করে তাদেরকে মিথ্যা আস্ফালন কাবু করতে পারে না।

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর অসীম সাহসিকতা

রাসূল মোহাম্মদ (সা.) এর পর মক্কার কাফেরদের সামনে সর্বপ্রথম প্রকাশ্যে কুরআন পাঠ করেছিলেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)। কুরআনের বাণী শোনার পর কাফেরদের গায়ে যেন আগুন ধরে গিয়েছিলো। তারা একযোগে আব্দুল্লাহর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং এলোপাতাড়ি প্রহারে তাকে রক্তাক্ত করে ফেললো। চেহারা জখমি করে রক্তাক্ত করলা। রক্ত গড়িয়ে পড়ছিলো। সে অবস্থায় ঘরে ফিরে গেলে সবাই বললো, আমরা আগেই আশঙ্কা করেছিলাম যে ওরা তোমাকে এমনিতে ছেড়ে দেবে না। আমাদের আশঙ্কাই সত্য হলো। আব্দুল্লাহ (রা.) বললেন, অতীতের যে কোনো সময়ের চেয়ে এই বিধর্মী আমার চোখে আজ অধিক মূল্যহীন। আগামীকাল আবার আমি আল্লাহর ওই দুশমনদের সাথে কুরআন পাঠ করবো। কিন্তু সাহাবারা নিষেধ করলেন। বললেন তুমি তাদের সামনে আল্লাহ তায়ালার সেই বাণী পেশ করেছো যা তাদের অত্যন্ত অপছন্দের।

ধৈর্যশীলদেরকে বে-হিসাব বিনিময়

হযরত কাতাদা (রা.) বলেন, হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) আমাকে বলেছেন যে, রাসূল (সা.) বলেছেন, কেয়ামতের দিন দাঁড়িপাল্লা লাগানো হবে, সদকা খয়রাত যারা করবে তারে দানের বিনিময়ে, পুরস্কার দেয়া হবে। নামাজ, রোজা, হজ ইত্যাদি নেক কাজের বিনিময় দেয়া হবে। এরপর আল্লাহর পথে বিপদ সহায্যকারীদের পালা আসবে। তাদের জন্য দাঁড়িপাল্লা লাগানোর আগেই তাদের নেক আমল ওজন হয়ে যাবে। তাদেরকে বে-হিসাব বিনিময় দেয়া হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, ধৈর্যশীলদেরকে তাদের পারিশ্রমিক বিনা হিসেবে দেয়া হবে। (সূরা জুমার, ১০)

দুনিয়ার জীবনে বিপদে-মুসিবতে বিপন্ন অসহায় বান্দারা কেয়ামতের দিন বে-হিসাব পুরস্কার পেতে থাকবেন। এই দৃশ্য দেখে দুনিয়ার জীবনে আরাম-

www.amarboi.org

আয়েশে বসবাসকারীরা আক্ষেপ করে বলতে থাকবে, আহা দুনিয়ার জীবনে আমার দেহ যদি কাঁচি দিয়ে কেটে টুকরো টুকরো করা হতো তবে আজ আমি অনেক বেশি পুরস্কার লাভ করতাম। অনেক বেশি মর্যাদা স্থায়ীভাবে লাভ করতাম।

হযরত যোবায়ের (রা.)-এর ঈমান

সত্যের সৈনিকদেরকে চাবুক দিয়ে যেমন দাবিয়ে রাখা যায় না তেমনি কোটি কোটি টাকা দিয়ে খরিদও করা যায় না। দৃশ্যত যদিও তারা দুর্বল থাকে কিন্তু নিজেদের ইমানের দৃঢ়তার কারণে শক্তিশালী এবং বিজয়ী হিসেবে আবির্ভূত হন। পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যে তাগুতি শক্তি অবিচল আস্থাবান ঈমানদারদের ওপর অকল্পনীয় অত্যাচারের পাহাড় চাপিয়ে দেয়। কিন্তু সত্যপ্রেমীরা কখনোই পরাজয় স্বীকার করেন না। ইসলামের ইতিহাসে ফাঁসিতে প্রথম মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছিলো হযরত যোবায়ের ইবনে আদী (রা.)-কে। সেই কঠিন সময়ে আপন বিশ্বাসে বলীয়ান মর্দে মোজাহেদ মৃত্যুর চোখে চোখ রেখে এ কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন-

'শত্রুর অত্যাচার নির্যাতনের সামনে
চিৎকার করবো না আমি
প্রকাশ করবো না ভীরুতা
আমি তো যাচ্ছি আমার
মালিকের সামনে হাজিরা দিতে।
ইসলামের জন্য শত্রুদের হাতে
কোরবান করছি প্রাণ
মৃত্যুর পর কোনো পাশে পড়ে যাবো
সে কথা মোটেই ভাবি না
আমার এই ত্যাগ আল্লাহর জন্য
আমার এ পরীক্ষা আল্লাহর পথে
আমার কর্তিত দেহে বরকত দেবেন
আল্লাহ তায়ালা যদি চান।'

কিছু মানুষ এমন রয়েছে যারা অত্যাচার নির্যাতনের কথা চিন্তা করলেই শঙ্কিত হয়ে ওঠে। এটা কি সত্য নয়? কিছু মানুষ দ্বীনের দাওয়াতের পরিণামের ভয়ে মরার আগেই মরে যায়? যে জাতি একবার ভীতিকবলিত হয়েছে এবং কাপুরুষতার পথের অনুসারী হয়েছে, তাদের ওপর চেপে বসেছে দীর্ঘমেয়াদি অবমাননা এবং লাঞ্ছনা। পক্ষান্তরে দ্বীনের সহায়তার কারণে কোনো জাতির

www.amarboi.org

লোকেরা যদি অত্যাচার নির্যাতনের মুখোমুখি হয়ে ধৈর্যের পরিচয় দেয় এবং অন্যদেরকে ধৈর্যের শিক্ষা দেয়, সত্য থেকে বিমুখ না হয় তবে তাদের জীবন অবশ্যই মর্যাদা এবং সম্মানের জীবনে পরিণত হবে। কিন্তু পরীক্ষামূলক বিপদ মুসিবত দেখে যারা ভয়ে কাঁপতে শুরু করবে তারা শুকনো ঘাসের মতো গুরুত্বহীন হয়ে পড়বে। কেউ যদি আল্লাহর দ্বীনের আওয়াজ বুলন্দ করার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হয়ে পড়ে তবে আল্লাহ তায়ালা তার সম্মান বৃদ্ধি করেন বরং বিজয় ও সফলতা তার ভাগ্য লিখনে পরিণত করে দেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর পথ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় আল্লাহ তায়ালা তাকে অবমাননা এবং পরাজয়ের মুখে ফেলে দেন।

হযরত ওমর (রা.) ফারূক উপাধি পেলেন

হযরত ওমর (রা.) ইসলাম গ্রহণের পর রাসূল (সা.) এর কাছে এ মর্মে আবেদন জানালেন যে, আমি কা'বাঘরে গিয়ে ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করতে চাই। রাসূল (সা.) দ্বারে আরকামে কারো ভয়ে আত্মগোপন করেননি। তিনি তো আল্লাহ তায়ালা ছাড়া কাউকেই ভয় করতেন না। কিন্তু পরিস্থিতির কারণে এবং মোমেনদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার প্রত্যাশায় তিনি নির্জনবাস গ্রহণ করেছিলেন। মোমেনদের ওপর এমন কোনো বিপদ আসবে যেটা তারা সহ্য করত পারবে না এমন যেন না হয়। এ কারণেই রাসূল (সা.) নির্জনবাস গ্রহণ করেছিলেন। হযরত ওমর (রা.)-এর প্রস্তাব শুনে রাসূল (সা.) খুশি হলেন। তিনি সাহাবাদের সঙ্গে নিয়ে দুই সারিতে কাবাঘরের দিকে রওয়ানা হলেন। এক সারির নেতৃত্বে ছিলেন হযরত হামযা (রা.), অন্য সারির নেতৃত্বে ছিলেন হযরত ওমর (রা.)। কোরাইশ কাফেররা এই দৃশ্য রুদ্ধশ্বাসে অবলোকন করলো। এর আগে তারা এ ধরনের দৃশ্য আর দেখেনি। সেদিনই রাসূল (সা.) হযরত ওমর (রা.)-কে ফারূক উপাধি দেন। এর অর্থ হচ্ছে সত্য এবং মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়কারী।

ওমর ফারূক (রা.)-এর অন্তরে সত্যের আলোক শিখা

ইসলাম গ্রহণের আগে ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) ইসলামের কট্টর দুশমন ছিলেন। মুসলমানদের ওপর তিনি নির্যাতন করতেন। কিন্তু ইসলামের শত্রু হলেও অমুসলিম অবস্থায়ও হযরত ওমর (রা.)-এর অন্তরে সত্যের আলোকশিখা বিদ্যমান ছিলো। সেই আলোকশিখা মাঝে মাঝে কিরণ ছড়াচ্ছিলো।

লায়লা বিনতে আবু হামনা এবং তার স্বামী আমের ইবনে রবিয়া (রা.) প্রথম দিকেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। লায়লা বলেন, মক্কায় মুসলমানদের ওপর

www.amarboi.org

নির্যাতনকারী কাফেরদের মধ্যে ওমর ছিলেন শীর্ষে। আমরা যখন হাবশায় হিজরত করার সিদ্ধান্ত নিয়ে সফরের পাথেয় বাঁধাছাদা করছিলাম এমন সময় হযরত ওমর (রা.) আমার কাছ এলেন। আমার স্বামী আমের ইবনে রবিয়া বাইরে গিয়েছিলেন। শিশু আব্দুল্লাহ বাইরে খেলছিলো। ওমর জিজ্ঞাসা করলেন তোমরা কোথায় যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছো আব্দুল্লাহর মা? আমি বললাম, আল্লাহর মনোনীত দ্বীন ইসলাম গ্রহণের কারণে তোমরা মক্কায় আমাদের জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছো, কিন্তু আল্লাহর দুনিয়া অনেক বড়। আমরা বাড়িঘর ছেড়ে চলে যাচ্ছি। একথা শুনে হযরত ওমর (রা.) দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, ছাহেবাকুমুল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সঙ্গী হোন। এ কথা বলে ওমর (রা.) চলে গেলেন। আমার স্বামী আমের ইবনে রবিয়া ঘরে ফেরার পথে তাকে আমি এ কথা জানালাম। তিনি বললেন, আশা রাখো, ওমর ইসলাম গ্রহণ করতে পারে।

এখানে আমরা একজন মহিলার সাহসিকতার পরিচয় পাচ্ছি। তিনি জানতেন যে, ওমর ইসলামের কট্টর দুশমন, তবুও নির্ভীকচিত্তে তিনি তার সামনে নিজেদের হিজরতের গোপন কথা প্রকাশ করে দিলেন। দ্বিতীয় একটি লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, ওমর (রা.) ইচ্ছা করলে লায়লার স্বীকারোক্তির পর তাকে শাস্তি দিতে পারতেন। কিন্তু এখানে তিনি পুরুষোচিত ভূমিকার পরিচয় দিলেন। একজন মহিলাকে কোনো পুরুষের নির্যাতন করা কোনোক্রমেই ভদ্রতা এবং শালীনতার পরিচায়ক নয়, ওমর এটা প্রমাণ করলেন। হিজরতের উদ্দেশ্যে প্রস্তুত দম্পতির পথরোধের চেষ্টা না করে ওমর (রা.) তাদের প্রতি সমর্থন জানালেন। সত্যের আলোয় তার মনের অন্ধকার তখন দূর হতে শুরু করেছে।

নবুয়ওতের ষষ্ঠ বছরে জিলহজ মাসে হযরত ওমর (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তখন তার বয়স ছিলো ২৬ বছর। হযরত ওমর (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণের আগে ৪০ থেকে ৪৫ জন নারী-পুরুষ ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। সেই সময় রাসূল (সা.) এবং সাহাবারা আরকাম ইবনে আবু আরকাম সাহাবীর ঘরে অবস্থান করছিলেন। সেখানে রাসূল (সা.) সাহাবাদের দ্বীন শিক্ষা দিতেন।

হযরত ওমর (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণ ইসলামের ইতিহাসের এক বিরাট ঘটনা। তার ইসলাম গ্রহণের আগে মুসলমানরা কাবাঘরে নামাজ আদায় করতে পারতেন না। কারণ মুসলমানদের প্রতি কোরাইশদের শত্রুতার সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিলো। হযরত ওমর (রা.) ইসলাম গ্রহণের পর কাফেরদের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলেন। তার চ্যালেঞ্জ গ্রহণের সাহস কারো হয়নি। মুসলমানরা কাবাঘরে নামাজ আদায় করতে শুরু করলেন। কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, যদি

www.amarboi.org

তোমরা আল্লাহকে সাহায্য করো তবে তিনিও তোমাদের সাহায্য করবেন এবং তোমাদের দৃঢ়পদ করে দেবেন।[১৬২]

এই মহান আন্দোলনের জন্য এই ধরনের লোকদেরই ছিলো প্রয়োজন। এ ধরনের লোকেরা দু-একজন করে আন্দোলনে আসতে থাকে। সাথে সাথে বৃদ্ধি পেতে থাকে সঙ্ঘাত। আর মানুষের ঈমানের পরীক্ষা হয় দুঃখ-কষ্ট ও মুসিবতের সময়। মদিনার তিন দিক ঘর-বাড়ি ও খেজুর বাগান দ্বারা পরিবেষ্টিত আর একদিক মাত্র উন্মুক্ত ছিলো। হযরত (সা.) তিন হাজার সাহাবী নিয়ে সে উন্মুক্ত দিকেই পরিখা খননের আদেশ দিলেন। পঞ্চম হিজরির ৮ জিলকদ এই খনন কার্য শুরু হলো। হযরত (সা.) নিজে পরিখার খনন কাজ উদ্বোধন করলেন এবং প্রতি দশজন লোকের মধ্যে দশ গজ ভূমি বন্টন করে দিলেন। পরিখার প্রস্ত পাঁচ গজ এবং গভীরতা পাঁচ গজ। বিশ দিনে তিন হাজার মুসলমান এ বিরাট পরিখা খনন করে ফেললেন। পরিখা খননকালে হযরত (সা.) সকল লোকের সঙ্গে কাজে ব্যস্ত রইলেন। ঘটনাক্রমে এক জায়গায় একটি বিরাটাকার পাথর সামনে পড়লো। সেটা কোনো প্রকারেই ভাঙা যাচ্ছিলো না। হযরত (সা.) সেখানে গিয়ে এরূপ জোরে কোদাল মারলেন যে, পাথরটি ভেঙে চুরমার হয়ে গেলো। এ ঘটনাও নবী করীম (সা.)-এর একটা বিশিষ্ট মু'জিজা।

কাফিরদের সৈন্য বাহিনী তিন দলে বিভক্ত হয়ে তিন দিক থেকে মদিনার ওপর হামলা করলো। এই হামলা ছিলো অত্যন্ত প্রচণ্ড ও ভয়াবহ। কুরআন পাকের সূরা আহজাব এর ১০ এবং ১১ নং আয়াতে নিম্নোক্ত ভাষায় এই হামলার চিত্র আঁকা হয়েছে :

إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا () هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا

যখন দুশমনরা ওপর (পূর্ব) ও নিচের (পশ্চিম) দিক থেকে তোমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো, যখন চক্ষু ফেটে যাবার উপক্রম হলো এবং কলিজা মুখের কাছে আসতে লাগলো আর তোমরা খোদা সম্পর্কে নানারূপ সন্দেহ করতে লাগলে, ঠিক তখন মুমিনদের পরীক্ষার সময় এলো এবং তীব্রভাবে ভূকম্পন সৃষ্টি হলো।

অত্যন্ত কঠিন পরীক্ষা

এটা ছিলো বাস্তবিকই অত্যন্ত কঠিন পরীক্ষার সময়। এক দিকে প্রচণ্ড শীতকাল, খাদ্যদ্রব্যের অভাব, উপর্যুপরি কয়েক বেলা অনশন, রাতের নিদ্রা আর দিনের

১৬১, সাইয়েদ ওমর তেলমেসানী, শহীদে মেহরাব হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব, আল কোরআন একাডেমী লন্ডন।

www.amarboi.org

বিশ্রাম উধাও, প্রতিটি মুহূর্ত জীবনের ভয়, মালামালা ও সন্তানাদি দুশমনের আঘাতের মুখে আর অন্য দিকে বেশুমার শত্রুসৈন্য । এমনিতরো সঙ্কটাবস্থায় যাদের ঈমান ছিলো সাচ্চা ও সুদৃঢ়, কেবল তারাই সত্যের পথে অবিচল থাকতে পারছিলো । দুর্বল ঈমানদার ও মুনাফিকগণ এ পরিস্থিতির আদৌ মোকাবেলা করতে পারছিলো না; বরং মুসলমানদের সমাজ-সংগঠনে যে সব মুনাফিক অনুপ্রবেশ করেছিলো, তারা এ সময় খোলাখুলিভাবে আত্মপ্রকাশ করলো । তারা বলতে শুরু করলো : 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমাদের কাছে বিজয় ও সাহায্যের যে ওয়াদা করেছিলেন, তা সম্পূর্ণ ধোঁকা ।' (সূরা আহযাব : আয়াত ১২) এর পাশাপাশি তারা নিজেদের জান বাঁচানোর জন্য নানারূপ বাহানা তালাশ করতে লাগলো এবং :'হে মদিনাবাসী! ফিরে চলো, আজ আর তোমাদের রক্ষা নেই ।' তারা নবী করীম (সা.)-এর সামনে এসে বলতে শুরু করলো : 'আমাদেরকে ঘর-বাড়িতে থেকে আত্মরক্ষা করার অনুমতি দিন; আমাদের বাড়িঘর সম্পূর্ণ অরক্ষিত ।' (সূরা আহযাব : আয়াত ১৪) ।

কিন্তু যাদের ভেতর যথার্থ ঈমান ছিলো এবং যারা ঈমানের দাবিতে ছিলো সত্যবাদী, এ সময় তাদের অবস্থা ছিলো সম্পূর্ণ ভিন্ন । তারা কাফিরদের সৈন্য-সামন্ত দেখে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে উঠলো :

وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا (22) مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا

'আল্লাহ এবং রাসূল তো আমাদের সঙ্গে এরই (অবস্থার) ওয়াদা করেছিলেন । তা ছাড়া এ অবস্থা দেখে তাদের ভেতর ঈমানের ভাবধারা আরো সতেজ হয়ে উঠলো এবং অধিকতর আনুগত্য ও আজ্ঞানুবর্তিতার জন্য তারা প্রস্তুত হলো । এই কঠিন অবস্থা তাদের ভেতরে অণু পরিমাণও পরিবর্তন ঘটাতে পারলো না । (সূরা আহযাব : ২২ ও ২৩ আয়াত)

দুশমনরা প্রায় এক মাসকাল মদিনা অবরোধ করে রইলো । এই অবরোধ এতো কঠিন ছিল যে, মুসলমানদেরকে একাধিক্রমে তিন-চার বেলা পর্যন্ত অনশনে কাটাতে হলো । এভাবে অবরোধ অত্যন্ত কঠিন ও বিপজ্জনক রূপ পরিগ্রহ করলো । কিন্তু তা সত্ত্বেও অবরোধকারীরা কিছুতেই পরিখা পার হতে পারলো না । এ কারণে তারা অপর পারেই অবস্থান করতে লাগলো । হযরত (সা.) তাঁর সৈন্যদেরকে পরিখার বিভিন্ন স্থানে মোতায়েন করলেন । কাফিররা বাইরে থেকে পাথর ও তীর ছুড়তে লাগলো । এদিক থেকেও তার প্রত্যুত্তর দেয়া হলো । এরই

www.amarboi.org

ভেতর বিক্ষিপ্তভাবে দু-একটি হামলাও চলতে লাগলো। কখনো কখনো কাফিরদের আক্রমণ এতো তীব্রতর রূপ ধারণ করতে লাগলো যে, তাদেরকে পরিখার এপার থেকে প্রতিহত করার জন্য পূর্ণ দৃঢ়তর সাথে মোকাবেলা করতে হলো। এমনকি এর ফলে দু-একবার নামাজ পর্যন্ত কাজা হয়ে গেলো।

অবরোধ যতো দীর্ঘায়িত হলো, হানাদারদের উৎসাহও ততোটা হ্রাস পেতে লাগলো। দশ-বারো হাজার লোকের খানাপিনার ব্যবস্থা করা মোটেই সহজ কাজ ছিলো না। তদুপরি ছিলো প্রচণ্ড শীত। এরই মধ্যে একদিন এমনি প্রচণ্ড বেগে ঝড় বইলো যে, কাফিরদের সমস্ত ছাউনি উড়ে গেলো। তাদের সৈন্য-সামন্ত ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেলো। তাদের ওপর যেন খোদার মূর্তিমান আজাব নেমে এলো। আর বাস্তবিকই আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের জন্য রহমত এবং কাফিরদের জন্য আজাব হিসেবেই এ ঝড় প্রেরণ করেছিলেন। এই ঘটনাকে আল্লাহ তাঁর একটি অনুগ্রহরূপে আখ্যায়িত করে বলেছেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا

'হে মুমিনগণ! খোদার সেই অনুগ্রহের কথা স্মরণ করো, যখন তোমদের ওপর সম্মিলিত বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো আর আমি তাদের ওপর প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা বইয়ে দিলাম এবং এমন সৈন্য (ফেরেশতা) পাঠালাম, যা তোমরা দেখতে পাওনি। (সূরা আহযাব : আয়াত ৯)

তাই কাফিরগণ এ পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে পারলো না। তাদের মেরুদণ্ড অচিরেই ভেঙে পড়লো। অবস্থা বেগতিক দেখে ইহুদিরা আগেই কেটে পড়েছিলো। এখন বাকি রইলো শুধু কুরাইশরা। তাই তাদেরও ফিরে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর রইলো না। এভাবে শুধু আল্লাহর অনুগ্রহ এবং তাঁর অদৃশ্য সাহায্যে মদিনার আকাশে ঘনীভূত ঘনঘটা আপনা-আপনি কেটে গেলো। কুরআন মজিদে এই যুদ্ধের কাহিনী যে ভঙ্গিতে বর্ণিত হয়েছে এবং তাতে মুসলমানদের প্রশিক্ষণের জন্য যে সব উপাদান রয়েছে, তার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় নিম্নে উদ্ধৃত করা যাচ্ছে।

মুমিনের প্রত্যয় হচ্ছে এই যে, প্রকৃত শক্তি আল্লাহর হাতে নিবদ্ধ। বিশ্বজাহানে যা কিছু ঘটে, তা শুধু তাঁরই অভিপ্রায় ও হুকুম অনুসারে ঘটে থাকে। মুমিন তার কোনো সাফল্যকেই আপন চেষ্ট-সাধনা বা নিজস্ব শক্তির ফল মনে করে না; বরং তাকে মনে করে আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ (ফযল)। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় : খন্দক যুদ্ধের সময় দশ-বারো হাজার কাফির সৈন্য তিন হাজার মুসলমানের

www.amarboi.org

কোনোই ক্ষতি করতে পারলো না; বরং তাদেরকে দিশেহারা হয়ে ফিরে যেতে হলো। এই পরিস্থিতিকে কিছু মুসলমান হয়তো নিজেদের চেষ্টা-তদবিরের (পরিখা খননের) ফল মনে করতে পারতো। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এই দুর্বলতা থেকে বাঁচানোর জন্য পূর্বাহ্নে ইরশাদ করলেন : 'হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর সেই অনুগ্রহের কথা স্মরণ করো, যখন তোমাদের ওপর সম্মিলিত বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো এবং আমরা তাদের ওপর প্রচণ্ড ঝড় বইয়ে দিলাম আর এমন সৈন্য পাঠালাম, যা তোমরা দেখতে পাওনি।' (সূরা আহযাব : ৯)

ঈমানের পরীক্ষা হয় দুঃখ-কষ্ট ও মুসিবতের সময়

মানুষের ঈমানের পরীক্ষা হয় দুঃখ-কষ্ট ও মুসিবতের সময়। তখন সে নিজে যেমন নিজের অবস্থাটা উপলব্ধি করতে পারে, তেমনি অপরেও আন্দাজ করতে পারে যে, এই পথে সে কতখানি অবিচল থাকতে সক্ষম। স্বাভাবিক অবস্থায় বহু লোক সম্পর্কেই এটা অনুমান করা যায় না যে, উদ্দেশ্যের প্রতি স্বাভাবিক ভালোবাসা এ জীবনপণ করার সঙ্কল্পে তারা বাস্তবিকই কতটা প্রস্তুত, বরং কখনো কখনো তারা নিজেরাই নিজেদের সম্পর্কে একটা ধোঁকায় পড়ে থাকে। কিন্তু যখন কোনো সঙ্কটকাল আসে, তখন আসল ও মেকির পার্থক্যটা অত্যন্ত সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। খন্দক যুদ্ধে এই কাজটিই করেছে। মদিনার মুসলমানদের দলে এক বিরাট সংখ্যক মুনাফিক ও মেকি ঈমানদার ঢুকে পড়েছিলো। তাদের সত্যিকার পরিচয়টা সাধারণ মুসলমানদের সামনে উদঘাটন করার প্রয়োজন ছিলো।

তাই এই সঙ্কটের মাধ্যমে তাদের মুখোশটি খসে পড়লো। ক্রমাগত পরিখা খনন করা, খানাপিনা ও আরাম-আয়েশ ত্যাগ করে রাত-দিন একাকার করে দেয়া, একটি বিরাট বাহিনীর মোকাবেলার জন্যে জীবন হাতে নিয়ে তৈরি থাকা, সর্বোপরি কুড়ি-বাইশ দিন পর্যন্ত ক্রমাগত ভীতি ও শঙ্কার মধ্যে রাতের ঘুম ও দিনের বিশ্রাম হারাম করে দেয়া কোনো সহজ কাজ ছিলো না। তাদের অনেকেই বরং বলতে লাগলো : 'রাসূল আমাদের কাছে বিজয় ও সাহায্যের ওয়াদা করেছিলেন; কিন্তু এখন তো দেখছি হাওয়া ঘুরে যাচ্ছে। আমরা বুঝতে পেরেছি, আল্লাহ ও রাসূল আমাদের কাছে যে ওয়াদা করেছিলেন তা নিছক একটি ধোঁকা মাত্র।' (সূরা আহযাব) কিছু লোক আবার নানারকম বাহানা তালাশ করে ফিরছিলো। তারা আপন ঘরবাড়ির হেফাজতের বাহানায় ময়দান থেকে সরে পড়লো। পক্ষান্তরে আল্লাহর যেসব বান্দাহ সাচ্চা ঈমানের অধিকারী ছিলো, তারা এ অবস্থায় স্বতন্ত্র ভূমিকা গ্রহণ করলো। তারা শত্রু সৈন্যদেরকে এগিয়ে আসতে দেখেই বলতে লাগলো : 'ঠিক ঠিক এমনি অবস্থার কথাই আল্লাহ এবং

www.amarboi.org

রাসূল আমাদেরকে আগে জানিয়েছিলেন, আল্লাহ ও রাসূল তো এরই ওয়াদা করেছিলেন আমাদের কাছে। আল্লাহ ও রাসূল তো সত্য কথাই বলেছেন। এই অবস্থায় তাদের ভেতর ঈমানের শক্তি আরো বৃদ্ধি পেলো এবং তারা অধিকতর আনুগত্য ও ফর্মাবরদারির জন্যে প্রস্তুত হলো।' (সূরা আহযাব)

জান ও মালের ক্ষতির আশঙ্কা হচ্ছে মানুষের সবচাইতে বড়ো দুর্বলতা; বরং বলা চলে, সমস্ত দুর্বলতার মূল উৎস। আল্লাহর সত্তা ও তাঁর গুণাবলি সম্পর্কে ইসলাম যে ধরনের ঈমান আনার দাবি জানায়, তাতে মূলগতভাবে এই আকিদা শামিল রয়েছে যে, জীবন-মৃত্যু, লাভ-ক্ষতি ইত্যাদি সবকিছুই আল্লাহর হাতে নিবদ্ধ। অপর কোনো শক্তি মৃত্যুকে বিলম্বিত করতে পারে না।

আর কবির ভাষায়-

'সত্যের তরে দৈত্যের সাথে করে যাও সংগ্রাম
রণ-ক্ষেত্রে মরিলে অমর হইয়া রহিবে নাম।
এই আল্লাহ হুকুম-ধরায় নিত্য প্রবল রবে,
প্রবলেই যুগে যুগে সম্ভব করেছে অসম্ভবে।'

এমনি প্রত্যয় এবং এমনি ঈমানই হচ্ছে শক্তির মূল ভিত্তি। এই ভিত্তি যতোটা দুর্বল হবে, মুসলমানের প্রতিটি কাজে ততোটা দুর্বলতাই প্রকাশ পাবে। তাই এই দুর্বলতাকে দূর করার জন্যে সুস্পষ্টভকে জানিয়ে দেয়া হলো :

قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا

'হে নবী! তাদেরকে বলে দিন যে, তোমরা যদি মৃত্যু বা হত্যার ভয়ে পালাতে চাও তো পালিয়ে দেখ; এরূপ পলায়নে তোমাদের কোনোই ফায়দা হবে না। তাদেরকে আরো বলে দিন যে, (তারা চিন্তা করে দেখুক) আল্লাহ যদি তাদের কোনো ক্ষতি করার সিদ্ধান্ত নেন, তাহলে তাদেরকে আর কে বাঁচাতে পারে? আর যদি আল্লাহ সিদ্ধান্ত নেন তাদের কোনো উপকার করার, তাহলে তাঁকে আর কে প্রতিরোধ করতে পারে? (তাদের স্মরণ রাখা উচিত যে,) আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে না পাবে পৃষ্ঠপোষক আর না পাবে মদদগার।' (সূরা আহযাব : আয়াত ১৭)

আর আমাদের প্রিয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের সাহসী উচ্চারণ -

'অন্তরে আর বাহিরে সমান নিত্য প্রবল হও!
যত দুর্দিন ঘিরে আসে, তত অটল হইয়া রও!

www.amarboi.org

যত পরাজয়-ভয় আসে, তত দুর্জয় হয়ে উঠ,
মৃত্যুর ভয়ে শিথিল যেন না হয় তলোয়ার-মুঠো।
সত্যের তরে দৈত্যের সাথে করে যাও সংগ্রাম
রণ-ক্ষেত্রে মরিলে অমর হইয়া রহিবে নাম।
এই আল্লাহ হুকুম-ধরায় নিত্য প্রবল রবে,
প্রবলেই যুগে যুগে সম্ভব করেছে অসম্ভবে।'

রাসূলের অনুকরণীয় আদর্শ

এই যুদ্ধ সংক্রান্ত আলোচনার মধ্যেই মুসলমানদেরকে এ কথা জানিয়ে দেয়া হলো যে, রাসূল (সা.)-এর জীবন হচ্ছে তোমাদের জন্যে অনুকরণীয় আদর্শ। তবে যারা আল্লাহ তা'আলার দিদার এবং আখিরাতের প্রাপ্য পুরস্কারের প্রত্যাশা করে এবং আল্লাহকে খুব বেশি পরিমাণ স্মরণ করে, এ আদর্শ থেকে কেবল তারাই ফায়দা হাসিল করতে পারে। এ প্রসঙ্গে ইসলামপন্থীদের মনোবল বজায় রাখা এবং চরম সঙ্কটকালে তাদের অন্তরকে সুদৃঢ় রাখার জন্য পূর্ণ ধৈর্য-স্থৈর্য, কঠোর সঙ্কল্প ও খোদা-নির্ভরতার কিছু নমুনা পেশ করা হলো। যারা আল্লাহর দ্বীনকে বাস্তবে কায়েম কতে ইচ্ছুক এবং এ উদ্দেশ্যেই এ পথের অগ্রপথিক, খোদার সেসব বান্দার জন্য এ নমুনা কিয়ামত পর্যন্ত অনুকরণযোগ্য হয়ে থাকবে। তাই জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই এ নমুনা তাদের সামনে রাখা উচিত। কারণ এ-ই হচ্ছে তাদের জন্য প্রকৃত আলোকবর্তিকা।

আকাবার প্রথম বাইয়াত

'উবাদা ইবনুস্ ছামিত বলেন, "আমি আকাবার প্রথম বাইয়াতে উপস্থিত ছিলাম। আমরা ছিলাম বারো জন পুরুষ। নারীদের বাইয়াতের পদ্ধতিতেই আমাদের বাইয়াত সম্পন্ন হয় এবং তা ছিল যুদ্ধের নির্দেশ আসার পূর্বেকার ঘটনা। আমাদের রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে অঙ্গীকার করেছিলেন যে, আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করবো না, চুরি-ডাকাতি করবো না, ব্যভিচার করবো না, সন্তান হত্যা করবো না। কারো বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটাবো না এবং ন্যায়সঙ্গত ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবাধ্যতা করবো না।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "এসব অঙ্গীকার পূরণ করলে তোমাদের জন্য জান্নাতও রয়েছে। আর এর কোন একটি ভঙ্গ করলে তোমাদের পরিণতি আল্লাহর হাতে ন্যস্ত থাকবে। ইচ্ছে করলে তিনি শাস্তি দেবেন, ইচ্ছে করলে মাফ করে দেবেন।"

www.amarboi.org

আকাবার দ্বিতীয় বাইয়াত

কিছুদিন পর মুস'য়াব ইবনে উমাইয়া মক্কা ফিললেন। মদিনার কিছু কিছু নওমুসলিম তাঁদের স্বগোত্রীয় পৌত্তলিকদের সাথে হজ উপলক্ষে মক্কা গেলেন। আইয়ামে তাশরিকের মাঝামাঝি সময়ে তাঁরা সবাই আকাবায় সমবেত হওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কথা দিলেন। বলাবাহুল্য আল্লাহর রাসূলের মর্যাদা বৃদ্ধি ও বিজয় দান, ইসলাম ও মুসলমানদের শক্তি বৃদ্ধি এবং অংশীদার ও অংশীবাদীদের পতন ঘটাতে আল্লাহর ইপ্সিত মুহূর্তটি সমাগত হলে এই দ্বিতীয় বাইয়াত সম্পন্ন হলো।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছিলেন, "তোমাদের মধ্য থেকে বারো জন নকিব বা আহ্বায়ক নির্বাচন করে আমার কাছে পাঠাও যাতে তারা নিজ নিজ গোত্রের লোকদের এই অঙ্গীকারে শামিল করে নিতে পারে।" তারা তখন বারো জন আহ্বায়ক নির্বাচন করে তন্মধ্যে ৯ জন ছিল খাজরাজ গোত্রের এবং তিন জন আওস গোত্রের।

যিনি সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে হাত রেখে বাইয়াত করেন তিনি বারা ইবনে মা'রূর। পরে তিনি নিজ গোত্রকে ঐ বাইয়াত শামিল করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আমাদের এই বাইয়াত অনুষ্ঠান উঠলো যে ও রকম বিকট চিৎকার আমি আর কখনো শুনিনি। সে চিৎকার করে বলছিলো, "হে মিনাবসী, মুজাম্মাম অর্থাৎ নিন্দিত ব্যক্তির সাথে ধর্মদ্রোহীরা যে পাঁয়তারা করছে।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "এ হলো আকাবার শয়তান আয়েব ইবনে উযাইবের চিৎকার।"

অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "তোমরা নিজ নিজ কাফিলায় চলে যাও।"

'আব্বাস ইবনে উবাদা ইবনে নাদলা বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ, যে আল্লাহ আপনাকে সত্য বিধানসহ পাঠিয়েছেন তাঁর শপথ করে বলছি, আপনি চাইলে আমরা আগামীকালই মিনায় অবস্থানকারীদের ওপর তরবারি নিয়ে হামলা চালাবো।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "আমাকে এরূপ কাজ করতে নির্দেশ দেয়া হয়নি। তোমরা নিজ নিজ কাফিলায় ফিরে যাও।"

আকাবার শেষ বাইয়াত

আকাবার শেষ বাইয়াতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মু'মিনদের নিকট থেকে যুদ্ধের ব্যাপারে এই মর্মে অঙ্গীকার গ্রহণ করেন যে, তারা দুনিয়ার সকল কাফিরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করবেন। তিনি তাদের ওপর আল্লাহর

www.amarboi.org

পক্ষ থেকে অঙ্গীকারের শর্তাবলি আরোপ করেন এবং সেই শর্তাবলিসহ অঙ্গীকার পালন করলে তাদের জন্য জান্নাত রয়েছে বলে ঘোষণা করেন।

'উবাদা ইবনে ছামিত (রা.) বর্ণনা করেন, "আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে যুদ্ধের অঙ্গীকার আবদ্ধ হলাম। সেই অঙ্গীকারের শর্তাবলি ছিলো এই : অবস্থা কঠিন কিংবা স্বাভাবিক যা হোক না কেন এবং স্বেচ্ছায় হোক কিংবা অনিচ্ছায় হোক, নেতার আনুগত্য করবো ও নির্দেশ মেনে চলবো, আমরা আমাদের মুহাজির মুসলিম ভাইকে সব বিষয়ে অগ্রাধিকার প্রদান করবো, দায়িত্বশীল নেতার সাথে তাঁর কর্তৃত্বাধীন বিষয়ে কলহ করবো না, যেখানেই থাকি না কেন আমরা সর্বদা সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে কথা বলবো এবং আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারের পরোয়া করবো না।"[১৬৩]

কা'বা জিয়ারতের সফর

আরবরা সাধারণত তামাম বছরব্যাপী যুদ্ধে মেতে থাকতো। কিন্তু হজ উপলক্ষে লোকেরা যাতে শান্তিপূর্ণভাবে কা'বা পর্যন্ত যাতায়াত করতে এবং নিশ্চিন্তে আল্লাহর ঘরের জিয়ারত সম্পন্ন করতে পারে, এজন্য চার মাসকাল তারা যুদ্ধ বন্ধ রাখতো। ষষ্ঠ হিজরির জিলকদ মাসে হযরত (সা.) কা'বা জিয়ারতের সিদ্ধান্ত নিলেন। এহেন সৌভাগ্য লাভের জন্যে বহু আনসার ও মুহাজির প্রতীক্ষা করছিলো। তাই চৌদ্দ শ' মুসলমান হযরত (সা.)-এর সহগামী হলেন। যুল হুলায়ফা নামক স্থানে পৌঁছে তাঁরা কোরবানির প্রাথমিক রীতিসমূহ পালন করলেন। এভাবে সবাইকে জানিয়ে দেয়া হলো যে, মুসলমানদের উদ্দেশ্য শুধু কা'বা শরীফ জিয়ারত করা, কোনোরূপ যুদ্ধ বা আক্রমণের অভিসন্ধি নেই। তবুও কুরাইশদের অভিপ্রায় জেনে আসবার জন্য হযরত (সা.) এক ব্যক্তিকে মক্কায় প্রেরণ করলেন। সে এই মর্মে খবর নিয়ে এলো যে, কুরাইশরা সমস্ত গোত্রকে একত্রিত করে মুহাম্মদ (সা.)-এর মক্কায় প্রবেশকে বাধা দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এমনকি, তারা মক্কার বাইরে এক জায়গায় সৈন্য সমাবেশ করতেও শুরু করেছে এবং মোকাবেলার জন্য সম্পূর্ণ তৈরি হয়ে আছে।

কুরাইশদের সঙ্গে আলোচনা

এই সংবাদ জানার পরও হযরত (সা.) সামনে অগ্রসর হলেন এবং হুদাইবিয়া নামক স্থানে পৌঁছে যাত্রাবিরতি করলেন। এ জায়গাটি মক্কা থেকে এক মঞ্জিল দূরে অবস্থিত।[৪৫] এখানকার খোজায়া গোত্রের প্রধান হযরত (সা.)-এর খেদমতে

১৬২, ইবনে হিসাম, সিরাতে ইবনে হিসাম, বিআইসিএস, প্রকাশনী।

www.amarboi.org

হাজির হয়ে বললো : 'কুরাইশরা লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুতি নিয়েছে। তারা আপনাকে মক্কায় প্রবেশ করতে দেবে না।' হযরত (সা.) বললেন : 'তাদেরকে গিয়ে বলো যে, আমরা শুধু হজের নিয়্যাতে এসেছি, লড়াই করার জন্য নয়। কাজেই আমাদেরকে কা'বা শরীফ তাওয়াফ ও জিয়ারত করার সুযোগ দেয়া উচিত।' কুরাইশদের কাছে যখন এই পয়গাম গিয়ে পৌছলো, তখন কিছু দুষ্ট প্রকৃতির লোক বলে উঠলো : 'মুহাম্মদের পয়গাম শোনার কোনো প্রয়োজন আমাদের নেই।' কিন্তু চিন্তাশীল লোকদের ভেতর থেকে ওরওয়া নামক এক ব্যক্তি বললো : 'না, তোমরা আমার ওপর নির্ভর করো; আমি গিয়ে মুহাম্মদ (সা.)-এর সঙ্গে কথা বলছি।'

ওরওয়া হযরত (সা.)-এর খেদমতে হাজির হলো বটে, কিন্তু কোনো বিষয়েই মীমাংসা হলো না। ইতোমধ্যে কুরাইশরা মুসলমানদের ওপর হামলা করার জন্য একটি ক্ষুদ্র বাহিনী প্রেরণ করলো এবং তারা মুসলমানদের হাতে বন্দীও হলো; কিন্তু হযরত (সা.) তাঁর স্বভাবসুলভ করুণার বলে তাদেরকে ক্ষমা করে দিলেন এবং তাদেরকে মুক্তি দেয়া হলো। এর পর সন্ধির আলোচনা চালানোর জন্য হযরত উসমান (রা.) মক্কায় চলে গেলেন; কিন্তু কুরাইশরা মুসলমানদেরকে কা'বা জিয়ারত করার সুযোগ দিতে কিছুতেই রাজি হলো না; বরঞ্চ তারা হযরত উসমান (রা.)-কে আটক করে রাখলো।

রিযওয়ানের শপথ

এই পর্যায়ে মুসলমানদের কাছে এই মর্মে সংবাদ পৌছলো যে, হযরত উসমান (রা.) নিহত হয়েছেন। এই খবর মুসলমানদেরকে সাংঘাতিকভাবে অস্থির করে তুললো। হযরত (সা.) খবরটি শুনে বললেন : 'আমাদেরকে অবশ্যই উসমান (রা.)-এর রক্তের বদলা নিতে হবে।' এ কথা বলেই তিনি একটি বাবলা গাছের নিচে বসে পড়লেন। তিনি সাহাবীদের কাছ থেকে এই মর্মে শপথ গ্রহণ করলেন: 'আমরা ধ্বংস হয়ে যাবো, তবু লড়াই থেকে পিছু হটবো না। কুরাইশদের কাছ থেকে আমরা হযরত উসমান (রা.)-এর রক্তের বদলা নেবোই।' এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা মুসলমানদের মধ্যে এক আশ্চর্য উদ্দীপনার সৃষ্টি করলো। তারা শাহাদাতের প্রেরণায় উদ্দীপ্ত হয়ে কাফিরদের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যে প্রস্তুত হলেন। এরই নাম হচ্ছে 'রিযওয়ানের শপথ'। কুরআন পাকেও এই শপথের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সে সব ভাগ্যবান ব্যক্তি এ সময় হযরত (সা.)-এর পবিত্র হাতে হাত রেখে শপথ গ্রহণ করেছিলেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে পুরস্কৃত করার কথা বলেছেন।

www.amarboi.org

হুদাইবিয়া সন্ধির শর্তাবলি

মুসলমানদের এই উৎসাহ-উদ্দীপনার কথা কুরাইশদের কাছেও গিয়ে পৌঁছলো। সেই সঙ্গে এ-ও জানা গেলো যে, হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যার খবর সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। এই পরিস্থিতিতে কুরাইশরা সন্ধি করতে প্রস্তুত হলো এবং এ সম্পর্কে আলোচনা করার জন্যে সুহাইল বিন্ আমরকে দূত বানিয়ে পাঠালো। তার সঙ্গে দীর্ঘ সময়ব্যাপী আলোচনা হলো এবং শেষ পর্যন্ত সন্ধির শর্তাবলি স্থিরিকৃত হলো। সন্ধিপত্র লেখার জন্যে হযরত আলী (রা.)-কে ডাকা হলো। সন্ধিপত্রে যখন লেখা হলো 'এই সন্ধি আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ (সা.)-এর তরফ থেকে। তখন কুরাইশ প্রতিনিধি সুহাইল প্রতিবাদ জানিয়ে বললো : 'আল্লাহর রাসূল' কথাটি লেখা যাবে না; এ ব্যাপারে আমাদের আপত্তি আছে।' এ কথায় সাহাবীদের মধ্যে প্রচণ্ড ক্ষোভের সৃষ্টি হলো। সন্ধিপত্র লেখক হযরত আলী (রা.) কিছুতেই এটা মানতে রাজি হলেন না। কিন্তু হযরত (সা.) নানাদিক বিবেচনা করে সুহাইলের দাবি মেনে নিলেন এবং নিজের পবিত্র হাতে 'আল্লাহর রাসূল' কথাটি কেটে দিয়ে বললেন : 'তোমরা না মানো, তাতে কী? কিন্তু খোদার কসম, আমি তাঁর রাসূল।' এরপর নিম্নোক্ত শর্তাবলির ভিত্তিতে সন্ধি-চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো :

১. মুসলমানরা এ বছর হজ না করেই ফিরে যাবে।
২. তারা আগামী বছর আসবে এবং মাত্র তিন দিন থেকে চলে যাবে।
৩. কেউ অস্ত্রপাতি নিয়ে আসবে না। শুধু তলোয়ার সঙ্গে রাখতে পারবে: কিন্তু তাও কোষবদ্ধ থাকবে, বাইরে বের করা যাবে না।
৪. মক্কায় সে সব মুসলমান অবশিষ্ট রয়েছে, তাদের কাউকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবে না। আর কোনো মুসলমান মক্কায় ফিরে আসতে চাইলে তাকেও বাধা দেয়া যাবে না।
৫. কাফির বা মুসলমানদের মধ্য থেকে কেউ মদিনায় গেলে তাকে ফেরত পাঠাতে হবে। কিন্তু কোনো মুসলমান মক্কায় গেলে তাকে ফেরত দেয়া হবে না।
৬. আরবের গোত্রগুলো মুসলমান বা কাফির যে কোনো পক্ষের সাথে সন্ধিচুক্তি সম্পাদন করতে পারবে।
৭. এ সন্ধি-চুক্তি দশ বছরকাল বহাল থাকবে।

দৃশ্যত এই শর্তাবলি ছিলো মুসলমানদের স্বার্থবিরোধী আর মুসলমানরা যে চাপে পড়েই এ সন্ধি করেছিলো, তাও বেশ বোঝা যাচ্ছিলো।

www.amarboi.org

হযরত আবু জান্দালের ঘটনা

সন্ধিপত্র যখন লিখিত হচ্ছিলো, ঠিক সেই মুহূর্তে ঘটনাচক্রে সুহাইলের পুত্র হযরত আবু জান্দাল (রা.) মক্কা থেকে পালিয়ে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি শৃঙ্খলিত অবস্থায় মুসলমানদের সামনে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন এবং সবাইকে নিজের দুর্গতির কথা শোনালেন। তাঁকে ইসলাম গ্রহণের অপরাধে কী কী ধরনের শাস্তি দেয়া হয়েছে, তা-ও সবিস্তারে খুলে বললেন। অবশেষে তিনি হযরত (সা.)-এর কাছে আবেদন জানালেন : 'হুজুর আমাকে কাফিরদের কবল থেকেকে মুক্ত করে আপনার সঙ্গে নিয়ে চলুন।' এ কথা শুনে সুহাইল বলে উঠলো : 'দেখুন, সন্ধির শর্তানুসারে তাকে নিয়ে যেতে পারেন না।' এটা ছিলো বাস্তবিকই এক নাজুক সময়। কারণ, আবু জান্দাল ইসলাম গ্রহণ করে নির্যাতন ভোগ করছিলেন এবং বারবার ফরিয়াদ জানাচ্ছিলেন : 'হে মুসলিম ভাইগণ! তোমরা কি আমাকে আবার কাফিরদের হাতে তুলে দিতে চাও?' সমস্ত মুসলমান এই পরিস্থিতিতে অত্যন্ত অস্থির হয়ে উঠলো। হযরত উমর (রা.) তো রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে এ পর্যন্ত বললেন যে, 'আপনি যখন আল্লাহর সত্য নবী, তখন আর আমরা এ অপমান কেন সইব? হযরত (সা.) তাকে বললেন : 'আমি খোদার পয়গাম্বর, তাঁর হুকুমের নাফরমানি আমি করতে পারিন না। খোদা-ই আমায় সাহায্য করবেন।'

মোটকথা, সন্ধিচুক্তি সম্পাদিত হলো। সন্ধির শর্ত মুতাবেক আবু জান্দালকে ফিরে যেতে হলো। এভাবে ইসলামের পথে জীবন উৎসর্গকারীরা রাসূলের আনুগত্যের এক কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। একদিকে ছিলো দৃশ্যত ইসলামের অবমাননা ও হযরত আবু জান্দালের শোচনীয় দুর্গতি আর অন্য দিকে ছিলো রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিরঙ্কুশ আনুগত্যের প্রশ্ন।

হযরত (সা.) আবু জান্দালকে বললেন : 'আবু জান্দাল! ধৈর্য ও সংযমের সাথে কাজ করো। খোদা তোমার এবং অন্যান্য মজলুমের জন্য কোনো রাস্তা বের করে দেবেনই। সন্ধিচুক্তি সম্পন্ন হয়ে গেছে। কাজেই আমরা তাদের তাদের সাথে বিশ্বাসভঙ্গ করতে পারি না।' তাই আবু জান্দালকে সেই শৃঙ্খলিত অবস্থায়ই ফিরে যেতে হলো।

হুদাইবিয়া সন্ধির প্রভাব

সন্ধিচুক্তি সম্পাদিত হবার পর হযরত (সা.) সেখানেই কোরবানি করার জন্য লোকদেরকে হুকুম দিলেন। সর্বপ্রথম তিনি নিজেই কোরবানি করলেন। সন্ধিচুক্তি সম্পাদনের পর হযরত (সা.) তিন দিন সেখানে অবস্থান করলেন।

www.amarboi.org

ফেরার পথে সূরা ফাতাহ্ নাযিল হলো। তাতে এই সন্ধির প্রতি ইঙ্গিত করে একে 'ফাতহুম মুবীন' বা সুস্পষ্ট বিজয় বলে অভিহিত করা হলো। যে সন্ধিচুক্তি মুসলমানরা চাপে পড়ে সম্পাদন করলো, তাকে আবার 'সুস্পষ্ট বিজয়' বলে আখ্যা দেয়া দৃশ্যত একটি বেখাপ্পা ব্যাপার ছিলো। কিন্তু পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ স্পষ্টত প্রমাণ করে দিলো যে, ইসলামের ইতিহাসে হুদাইবয়ার সন্ধি ছিলো একটি বিরাট বিজয়ের সূচনা মাত্র। এর বিস্তৃত বিবরণ হচ্ছে নিম্নরূপ :

এতদিন মুসলমান ও কাফিরদের মধ্যে পুরোপুরি একটা যুদ্ধংদেহি অবস্থা বিরাজ করছিলো। উভয় পক্ষের মধ্যে পারস্পরিক মেলামেশার কোনোই সুযোগ ছিলো না। এই সন্ধিচুক্তি সেই চরম অবস্থার অবসান ঘটিয়ে রুদ্ধ দুয়ার খুলে দিলো। এরপর মুসলমান ও অমুসলমানরা নির্বিবাধে মদিনায় আসতে লাগলো। এভাবে তারা এই নতুন ইসলামী সংগঠনের লোকদেরকে অতি নিকট থেকে দেখার ও জানার সুযোগ পেলো। এর পরিণতিতে তারা বিস্ময়কর রকমে প্রভাবিত হতে লাগলো। যেসব লোকের বিরুদ্ধে তাদের মনে ক্রোধ ও বিদ্বেষ পুঞ্জীভূত হয়েছিলো, তাদেরকে তারা নৈতিক চরিত্র, আচার-ব্যবহার ও স্বভাব-প্রকৃতির দিক দিয়ে আপন লোকদের চেয়ে অনেক বেশি উন্নত মানের দেখতে পেলো। তারা আরো প্রত্যক্ষ করলো, আল্লাহর যেসব বান্দাহর বিরুদ্ধে তারা এতদিন যুদ্ধংদেহি মনোভাব পোষণ করে আসছে, তাদের মনে কোনে ঘৃণা বা শত্রুতা নেই; বরং তাদের যা কিছুই ঘৃণা, তা শুধু বিশ্বাস ও গলদ আচার-পদ্ধতির বিরুদ্ধে। তারা (মুসলমানরা) যা কিছুই বলে, তার প্রতিটি কথা সহানুভূতি ও মানবিক ভাবধারায় পরিপূর্ণ। এতো যুদ্ধ-বিগ্রহ সত্ত্বেও তারা বিরুদ্ধবাদীদের সঙ্গে সহানুভূতি সদাচরণের বেলায় কোনো ত্রুটি করে না।

এ ছাড়া এরূপ মেলামেশার ফলে ইসলাম সম্পর্কে অমুসলিমদের সন্দেহ ও আপত্তিগুলো সম্পর্কে সরাসরি আলোচনা করারও প্রচুর সুযোগ হলো। এতে করে ইসলাম সম্পর্কে অমুসলিমরা কতখানি ভ্রান্ত ধারণায় নিমজ্জিত ছিলো, তা তারা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পারলো। মোটকথা, এই পরিস্থিতি এমনি এক আবহাওয়ার সৃষ্টি করলো যে, অমুসলিমদের হৃদয় স্বভাবতই ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হতে লাগলো। এর ফলে সন্ধিরচুক্তির মাত্র দেড়-দুই বছরের মধ্যে এতো লোক ইসলাম গ্রহণ করলো যে, ইতঃপূর্বে কখনো তা ঘটেনি। এরই মধ্যে কুরাইশদের কতিপয় নামজাদা সর্দার ও যোদ্ধা ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হলো এবং অমুসলিমদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে মুসলমানদের সঙ্গে হাত মিলালো। হযরত খালিদ বিন্ অলিদ (রা.) এবং হযরত আমর বিন্ আস (রা.) এ সময়ই ইসলাম গ্রহণ করলেন। এর ফলে ইসলামের প্রভাব-বলয় এতটা বিস্তৃত হলো

www.amarboi.org

এবং তার শক্তিও এতটা প্রচণ্ড রূপ পরিগ্রহ করলো যে, পুরনো জাহিলিয়াত স্পষ্টত মৃত্যু-লক্ষণ দেখতে লাগলো। কাফির নেতৃবৃন্দ এই পরিস্থিতি অনুধাবণ করে অত্যন্ত শঙ্কিত হয়ে উঠলো। তারা স্পষ্টত বুঝতে পারলো, ইসলামের মোকাবেলায় তাদের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। তাই অনতিবিলম্বে সন্ধিচুক্তি ভেঙে দেয়ার এবং এর ক্রমবর্ধমান সয়লাবকে প্রতিরোধ করার জন্য আর একবার ইসলামী আন্দোলনের সাথে ভাগ্য পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়া ছাড়া আর কোনো বিকল্প পথ তারা খুঁজে পেলো না।[১৬৪]

কারো রুজি রোজগারের পথ বন্ধ হয়ে যায়। কাউকে ঘর থেকে বের করে দেয়া হয়। কেউ আপনজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। কারো ছুটে যায় বন্ধু, কারো হিতাকাঙ্ক্ষী। কারো ওপরে আসে মারধর। কাউকেও করা হয় জিঞ্জিরাবদ্ধ। কাউকে পাথর চাপা দিয়ে শুইয়ে রাখা হয় তপ্ত বালুকার ওপর। কাউকেও জর্জরিত করা হয় গালি দিয়ে, কাউকেও বা পাথর দিয়ে। উৎপাটিত করা হয় কারো চোখ। বিচূর্ণ করা হয় কারো শির। নারী, সম্পদ, ক্ষমতা, নেতৃত্ব এবং সকল প্রকার লোভনীয় জিনিস দিয়ে খরিদ করার চেষ্টাও করা হয় কাউকে। এই সকল অগ্নিপরীক্ষা ইসলামী আন্দোলনের ওপর এসেছে। আসা জরুরি ছিলো। এগুলো ছাড়া ইসলামী আন্দোলন না মজবুত হতে পারতো, আর না পারতো ক্রমবিকাশ ও প্রসার লাভ করতে।

অগ্নিপরীক্ষার পয়লা ফায়দা

এসব অগ্নিপরীক্ষা ইসলামী আন্দোলনের জন্য ছিলো খুবই সহায়ক। এসব অগ্নিপরীক্ষার পয়লা ফায়দা এই ছিলো যে, এর ফলে ভীরু কাপুরুষ, হীন চরিত্র ও দুর্বল সঙ্কল্পের লোকেরা এ আন্দোলনের কাছেই ঘেঁষতে পারেনি। তাই সমাজের মণিমুক্তগুলোই কেবল এসে শরিক হলো আন্দোলনে। আর এ মহান আন্দোলনের জন্য প্রয়োজন ছিলো এদেরই। তাই যিনিই এই আন্দোলনে শরিক হলেন, কঠিন অগ্নিপরীক্ষার মধ্যে দিয়েই তাকে শরিক হতে হয়েছে। বস্তুত এক মহান বিপ্লবী আন্দোলনের উপযোগী শ্রেষ্ঠ লোকদের বাছাইয়ের জন্য এর চাইতে উত্তম আর কোনো পন্থা হতে পারে না।

প্রিয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের কবিতার বাণী-

'সত্য পথের তীর্থ-পথিক! ভয় নাই, নাহি ভয়,
শান্তি যাদের লক্ষ, তাদের নাই নাই পরাজয়!
অশান্তি-কামী চলনার রূপে জয় পায় মাঝ মাঝে,

১৬২, আবু সলিম মুহাম্মদ আবদুল হাই, রাসূলুল্লাহর বিপ্লবী জীবন।

www.amarboi.org

অবশেষে চির-লাঞ্ছিত হয় অপমানে আর লাজে!
পথের উর্ধ্বে ওঠে ঝোড়ো বায়ে পথের আবর্জনা
তাই বলে তারা উর্ধ্বে উঠেছে-কেহ কভু ভাবিও না!
উর্ধ্বে যাদের গতি, তাহাদেরি পথে হয় ওরা বাধা;
পিচ্ছিল করে পথ, তাই বলে জয়ী হয় না ক কাদা!
জয়ে পরাজয়ে সমান শান্ত রবি আমরা সবে,
জয়ী যদি হই, এক আল্লার মাহিমার জয় হবে!
লাঞ্ছিত হলে বাঞ্ছিত হব পরলোকে আল্লাহ,
রণভূমে যদি হত হই মোরা হব চির-প্রিয় তাঁর!
হয়ত কখনো জয়ী হবে ওরা, হটিব না মোরা তবু,
বুঝিব মোদের পরীক্ষা করে মোদের পরম প্রভু!'

অগ্নিপরীক্ষার দ্বিতীয় ফায়দা

এই অগ্নিপরীক্ষার দ্বিতীয় ফায়দা হলো, এরকম কঠিন অবস্থার মধ্যে যারা আন্দোলনে শরিক হয়েছে, তাঁরা কোনো প্রকার ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা জাতীয় স্বার্থে নয়, বরঞ্চ কেবলমাত্র সত্যপ্রিয়তা এবং আল্লাহ ও তাঁর সন্তুষ্টির জন্যই এই ভয়াবহ বিপদ মুসিবত ও দুঃখ লাঞ্ছনার মোকাবেলা করেছেন। এরই জন্য তাঁদের সইতে হয়েছে শত অত্যাচার নির্যাতন। এরই জন্য হতে হয়েছে আহত প্রহৃত। এরই জন্য তাদের পড়তে হয়েছে কায়েমি স্বার্থবাদীদের হিংস্র কোপানলে। কিন্তু এর ফল হয়েছে শুভ। এর ফলে তাঁদের মধ্যে সৃষ্টি হতে থাকে ইসলামী আন্দোলনের উপযোগী মনমানসিকতা। পয়দা হতে থাকে খাঁটি ইসলামী চরিত্র। আল্লাহর ইবাদতেও বৃদ্ধি হতে থাকে পরম আন্তরিকতা আর নিষ্ঠা।

আসলে বিপদ মুসিবতের এই মহা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ইসলামী চরিত্র ও ভাবধারা সৃষ্টি হওয়া ছিলো এক স্বাভাবিক ব্যাপার। কোনো ব্যক্তি যখন একটি লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রবল উদ্যমে যাত্রা শুরু করে, আর তার সেই লক্ষ্য পথে যদি তাকে সম্মুখীন হতে হয় প্রাণান্তকর সংগ্রাম, চরম দ্বন্দ্ব-সংঘাত, অবর্ণনীয় বিপদ মুসিবত, দুঃখ-কষ্ট, সীমাহীন হয়রানি, যাতনাকর আঘাত, অমানবিক কারা নির্যাতন, বিরামহীন ক্ষুধা আর দুঃসহনীয় নির্বাসনের, তবে এই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ফলে তার সেই মহান লক্ষ্য ও আদর্শের সমস্ত বৈশিষ্ট্য প্রবলভাবে রেখাপাত করে তার হৃদয়-মনে। তার মন মগজ, শিরা উপশিরায় প্রবাহিত হতে থাকে তার সেই মহান লক্ষ্যেরই ফল্গুধারা। তার গোটা ব্যক্তিসত্তাই তখন তার জীবনোদ্দেশ্যের রূপ পরিগ্রহ করে।

www.amarboi.org

অগ্নিপরীক্ষা ও চরম সঙ্ঘাতের তৃতীয় সুফল

এই অগ্নিপরীক্ষা ও চরম সঙ্ঘাতের তৃতীয় সুফল এই ছিলো যে, এর ফলে একদিকে এই বিপ্লবী কাফেলায় যারা শরিক হচ্ছিল, বাস্তব ময়দানে তাদের হতে থাকে যথার্থ প্রশিক্ষণ। অপর দিকে দিনের পর দিন প্রসারিত সম্প্রসারিত হতে থাকে ইসলামী আন্দোলন। মানুষ যখন দেখতে থাকলো, কিছু লোক দিনের পর দিন মার খাচ্ছে, নির্যাতিত হচ্ছে। তখন স্বাভাবিকভাবেই এর আসল কারণ জানার প্রবল আগ্রহ পয়দা হতে থাকে তাদের মনে। এই লোকগুলোকে নিয়ে কেন এতো হৈ হট্টগোল?–এই প্রশ্নের জবাব পেতে উৎসুক হয়ে উঠে তাদের মন। অতঃপর তাদের অনুসন্ধানী দৃষ্টি যখন জানতে পারতো, আল্লাহর এই বান্দাগুলো কোনো নারী, সম্পদ, প্রতিপত্তি বা কোনো প্রকার ব্যক্তিগত স্বার্থে নয়, বরং এক মহাসত্য তাদের কাছে উন্মুক্ত হয়েছে এবং তারা তা একনিষ্ঠভাবে আঁকড়ে ধরে আছে বিধায় এভাবে তাদের অত্যাচার করা হচ্ছে, তখন স্বভাবতই সেই মহাসত্যকে জানার জন্য তাদের মন হয়ে উঠতো ব্যাকুল।

অতঃপর যখন লোকেরা জানতে পারতো, সেই মহাসত্য হচ্ছে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" আর এ জিনিসই মানবজীবনে এমন ধরনের বিপ্লব সৃষ্টি করে, এরই দাওয়াত নিয়ে এমন সব লোক উত্থিত হয়েছে, যারা কেবল এই সত্যেরই জন্য দুনিয়ার সমস্ত ফায়দা ও স্বার্থকে ভূলুণ্ঠিত করছে। নিজেদের জমি, মাল, সন্তান সন্ততিসহ প্রতিটি জিনিস অকাতরে কোরবানি করছে, তখন তারা বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যেতো। খুলে যেতো তাদের চোখ। ফেটে যেতো তাদের মন মগজকে আচ্ছন্ন করে রাখার পর্দা। আর এই মহাসত্য তাদের হৃদয়ের মধ্যে বিদ্ধ হতো তীরের তীব্র ফলকের মতো। এরই ফলে সব মানুষ এসে শামিল হয়েছে এই আন্দোলনে। অবশ্য শেষ পর্যন্ত কেবল সেই গুটিকয়েক লোকই এ আন্দোলনে শরিক হতে পারেনি, যাদেরকে আভিজাত্যের অহঙ্কার, পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুকরণ আর পার্থিব স্বার্থ সম্পূর্ণরূপে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছিল। এছাড়া সে সমাজের প্রতিটি নিঃস্বার্থ ও সত্যপ্রিয় লোককেই, কেউ আগে কেউ পরে, শেষ পর্যন্ত এ আন্দোলনে এসে শরিক হতে হয়েছে।

এই বিপ্লবী আন্দোলনের মহান নেতা মুহাম্মদ (সা.) তাঁর আন্দোলনের ব্যাপারে নিজের দেশ, জাতি, গোত্র ও বংশের কারো স্বার্থেরই কোনো পরোয়া করেননি। আন্দোলনের ব্যাপারে কোনো স্বার্থের সাথেই তিনি আপস করেননি। তাঁর এই নৈতিক দৃঢ়তাই মানুষের মনে এক চরম আস্থার জন্ম দিলো যে, নিঃসন্দেহে মানুষের কল্যাণের জন্য তাঁর আবির্ভাব ঘটেছে। আর এ আস্থার ফলেই

www.amarboi.org

প্রত্যেকটি কওমের লোক এসে তাঁর আন্দোলনের পতাকাতলে সমবেত হয়েছে। তিনি যদি কেবল নিজ খান্দানের কল্যাণ চিন্তা করতেন, তবে হাশেমি গোত্রের লোক ছাড়া আর কারোই এ আন্দোলনের প্রতি কোনো আগ্রহ থাকতো না। তিনি যদি কুরাইশদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যস্ত হতেন, তবে অকুরাইশ আরবরা তাঁর আন্দোলনে শরিক হবার কল্পনাই করতো না। কিংবা আরব জাতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা যদি হতো তাঁর উদ্দেশ্য, তবে হাবশী বেলাল, রোমদেশীয় সুহাইব আর পারস্যের সালমানের (রা.) কী স্বার্থ ছিলো তাঁর সহযোগিতা করার?

বস্তুত, যে জিনিস সব জাতির লোকদের তাঁর প্রতি আকৃষ্ট করেছে, তা ছিলো নিরেট আল্লাহর দাসত্বের আহ্বান। ব্যক্তিগত, বংশগত, গোত্রগত ও জাতিগত স্বার্থের ব্যাপারে পরিপূর্ণ অনাগ্রহ। গোটা মানবতাকে খালেস আল্লাহর দাসত্বের প্রতি আহ্বানের ফলেই বংশ, বর্ণ ও জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল ধরনের মানুষ এ আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এর প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণোৎসর্গ করতে সবাই প্রস্তুত হয়ে যায়।

তিনি যখন মক্কা থেকে হিজরত করতে বাধ্য হন, তখনো তাঁর শত্রুদের প্রচুর ধন সম্পদ তাঁর কাছে আমানত ছিলো। এগুলো নিজ নিজ মালিকের কাছে ফেরৎ দেবার জন্য তিনি হযরত আলীকে (রা.) বুঝিয়ে দিয়ে যান। কোনো দুনিয়াপূজারী লোকের পক্ষে এ ধরনের সুযোগ হাতছাড়া করা সম্ভব নয়। সে সবকিছুই আত্মসাৎ করে সাথে নিয়ে যায়। কিন্তু আল্লাহর দাস তখনো নিজের জানের দুশমন ও রক্ত পিপাসুদের সম্পদ তাদের হাতে পৌঁছে দেবার চিন্তা করেন, যখন তারা তাঁকে হত্যা করবার ফায়সালা গ্রহণ করে। নৈতিক চরিত্রের এই অকল্পনীয় উচ্চতা অবলোকন করে আরবের লোকেরা বিস্মিত না হয়ে পেরেছিলো কি? আমার দৃঢ় বিশ্বাস, দুই বছর পর যখন তারা বদর ময়দানে তাঁর বিরুদ্ধে তরবারি উত্তোলন করেছিল, তখন তাদের মন হয়তো তাদের বলছিল, এ কোন মহা মানবের সাথে তোমরা লড়ছো? সেই মহানুভবের বিরুদ্ধে তোমরা তরবারি উত্তোলন করছো, জন্মভূমি থেকে বিদায়ের কালেও যিনি মানুষের অধিকার ও আমানতের দায়িত্বের কথা ভোলেননি? হয়তো জিদের বশবর্তী হয়ে তখন তারা তাঁর বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল, কিন্তু তাদের বিবেক তাদের দংশন করছিলো। আমার বিশ্বাস, বদর যুদ্ধে কাফিরদের পরাজয়ের নৈতিক কারণগুলোর মধ্যে এটাও ছিলো অন্যতম।[১৬৫]

---

১৬৫ সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী, ইসলামী বিপ্লবের পথ।

www.amarboi.org

মানবরচিত মতাদর্শ কায়েমে কালজয়ী যারা

পৃথিবীতে বিপ্লবের জন্ম তারাই দিতে সক্ষম হয়েছেন, যারা ভাবনা থেকে নিজেকে আলাদা করতে পেরেছেন। সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে তাদের মধ্যে **নেলসন ম্যান্ডেলা, অং সান সু চি ও আর্নেস্তো চে গুয়েভারা**। তাদের কারো জীবনচরিতই আমার অনুকরণীয় আদর্শ নয়। এদের জীবনের ঘটনা বর্ণনার উদ্দেশ্যও তাই নয়। শুধুমাত্র মানবরচিত ও কল্পনাপ্রসূত চিন্তার নায়কদের দুঃসাহসিকতার একটি খণ্ডিত চিত্র তুলে ধরাই লক্ষ্য। তাহলেই হয়ত উপলব্ধি করা যাবে যারা নির্ভুল আদর্শ আল ইসলামের সৈনিক ভূমিকার দিকটিও। এদের জীবনেও শেখার আছে আমাদের জন্য অনেক কিছু।

নেলসন ম্যান্ডেলা

দক্ষিণ আফ্রিকার সংগ্রামী নেতা নেলসন ম্যান্ডেলার দীর্ঘ ২৭ বছর কারাভোগের ওপর ভিত্তি করে বিশ্ববিখ্যাত লেখক চার্লিন স্মিথের সাড়া জাগানো বই রোবেন সক্ষম হয়েছে। নেলসন ম্যান্ডেলা। বিশ্বজুড়ে তার অসম্ভব খ্যাতি, তাকে নিয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে কৌতূহলের শেষ নেই অনেকের কাছেই তিনি দেবতুল্য মহাপুরুষ। তবে বাস্তবতা হচ্ছে সব সময়ই ঐতিহাসিক সত্য এবং লোকমুখে প্রচলিত রূপকথার মধ্যে বিস্তার ফারাক থাকে, আর ম্যান্ডেলার বর্তমান অবস্থায় উপনীত হওয়ার ক্ষেত্রে, তার আত্মনির্মাণ এবং বিকাশের ক্ষেত্রে বেশকিছু বাস্তবতা এবং সমকালীন স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনাপ্রবাহ, ব্যক্তিগত খুঁটিনাটি, চাওয়া-পাওয়া বৃহত্তর স্বার্থে তার ত্যাগ এমন বহু বাস্তবতা দৃশ্যের অন্তরাল থেকে ক্রিয়াশীল থেকে আমাদের মাঝে এমন এক ম্যান্ডেলাকে উপস্থিত করেছে যার প্রজ্ঞা, রাজনৈতিক অন্তর্দৃষ্টি, ক্ষমা, পুনর্মিত্রতা, মহানুভবতা, নিয়মানুবর্তিতা, ধৈর্য এবং সহনশীলতার মতো যাবতীয় মহৎ গুণাবলি বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মাঝে কালোত্তীর্ণ।

নির্যাতিত-নিপীড়িত, নিষ্পেষিত জনতার অধিকার এবং মর্যাদাবোধ সম্পর্কে বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে এমন এক আবহ তৈরি করতে সাহায্য করেছে, যার উদাহরণ নিকট অতীতে বিরল, ঊনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীর ক্রান্তিকালে জাতিগত অধিকার এবং সচেতনতা, পারস্পরিক মর্যাদাবোধ নিয়ে বিশ্ব যখন চরম সঙ্কটের মোকাবেলা করছিল, ঠিক তেমনি একটি মুহূর্তে ভাবমূর্তির সঙ্কটে নিপতিত বিশ্বজনতা আদর্শ এক প্রতীক সঙ্কটে ভুগছিল, ম্যান্ডেলা নিজের কর্মমহানুভবতার মাধ্যমে স্বমহিমায় নিজেকে এমনই এক প্রতীকে রূপায়িত করেছেন।[১৬৬]

১৬৪, এনথনি স্যাম্পসন, ম্যান্ডেলা, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ।

www.amarboi.org

অং সান সু চি

অহিংসবাদী ও সংগ্রামী নারী অং সান সুচি প্রায় পনের বছরের বন্দিজীবনের কালো অধ্যায় পেরিয়ে মুক্ত আলোয় ফিরেছেন। গত ২১ বছরের রাজনৈতিক জীবনের ১৫ বছরই কাটিয়েছেন কারাগারে আর গৃহবন্দী হিসেবে। এ সময় তিনি শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। হারিয়েছেন স্বামী ড. মাইকেল এরিসকে।

নেলসন ম্যান্ডেলার পর এটাই হবে বিশ্বের সবচেয়ে আলোচিত রাজবন্দীর মুক্তি। সু চি মাঝারি গড়নের হলেও সাহস আর মনোবলের দিক থেকে তাকে নেলসন ম্যান্ডেলার পেছনের সারিতে রাখার সুযোগ নেই। একটি জায়গায় দু'জনের অত্যন্ত মিল রয়েছে। তারা দু'জনই জোরে কথা বলা বা বক্তৃতা করতে অভ্যস্ত নন। কিন্তু তারা যা-ই বলুন না কেন, ওটা বিশ্বে তীব্র গর্জনের মতো মুহূর্তেই ছড়িয়ে যায়।

১৯৯১ সালে শান্তিতে নোবেল জেতার পর মিডিয়াকে সু চি বলেছিলেন, 'মানবজাতির জন্য স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা এ কারণে প্রয়োজন, যাতে তারা তাদের সম্ভাবনা সম্পর্কে জানতে পারে।' এ আহ্বানটি গণতান্ত্রিক বিশ্বে বেশ সাড়া জাগালেও সামরিক জান্তার মন টলাতে পারেনি।

সমসাময়িক বিশ্বে গণতন্ত্রের পক্ষে কথার বলার অপরাধে দক্ষিণ আফ্রিকার জীবন্ত কিংবদন্তি নেলসন ম্যান্ডেলার পর সু চি-ই সবচেয়ে বেশি দিন অর্থাৎ প্রায় ১৫ বছর কারাভোগ করেছেন। গত বছরই তার মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু একজন মার্কিন নাগরিক তার গৃহে অবৈধভাবে প্রবেশ করার অপরাধে সামরিক জান্তা তাকে আরও ১৮ মাস গৃহবন্দী রাখে।

আর্নেস্তো চে গুয়েভারা

আর্নেস্তো চে গুয়েভারা দ্যা সের্নার জন্ম হয়েছিল আর্জেন্টিনার রোজারিও শহরে ১৯২৮ সালের ১ জুন। বুয়েনার্সে উচ্চশিক্ষা শেষ করার পর ডাক্তারি সার্টিফিকেট লাভ করেন। ডাক্তারি পেশায় না এসে, তিনি ঘুরে বেড়াতে থাকেন ল্যাতিন আমেরিকার আনাচে-কানাচে। ১৯৫৪ সালে আমেরিকার গুয়েতেমালায় স্বচক্ষে দেখতে পান সিআইএ মদতপুষ্ট সামরিক অভ্যুত্থান, দেখতে পান প্রগতিশীল বাম সরকারের পতন। এ রক্তক্ষয়ী অভ্যুত্থান আর নিপীড়িত জনমানুষের ওপর অত্যাচার আর বিভীষিকাময় সময়ের ভেতর দিয়ে নিজেকে গড়ে তোলেন অগণিত জনমানুষের বাঁচা, সংগ্রাম, আর বিপ্লবের প্রস্তুতির নির্দেশক হিসেবে।

সাম্রাজ্যবাদী ছায় সরকার চে গুয়েভারাকে দেশ ছাড়তে বাধ্য করে। কোনরকম জান নিয়ে পালিয়ে আসেন মেক্সিকোতে। সে সময় ফিদেল ক্যাস্ত্রো ও তাঁর

www.amarboi.org

বাহিনী নিয়ে বিপ্লবের প্রাথমিক ব্যর্থতার পর ফের নতুন করে কিউবার বিপ্লবকে সংগঠিত করেছিলেন। চে' সে সময়ই ক্যাস্ত্রোর দলে যোগ দেন। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই বিপ্লবীরা সিয়েরা পর্বাতাঞ্চলে গেরিলা যুদ্ধ শুরু করে। প্রথমে দলে ডাক্তার হিসেবেই নিজেকে দাঁড় করান। পরে সচেতনতা, মেধা, মনন আর অগ্রসরতার জন্য ধীরে ধীরে সর্বোচ্চ অধিনায়কের একজন হয়ে ওঠেন।

১৯৫৯ এর জানুয়ারিতে বিপ্লবীরা কিউবার ক্ষমতা দখল করে। প্রথমে এ সরকার মধ্যপন্থী, গণতান্ত্রিক, জাতীয়তাবাদী জোট হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে, পরে ক্রমশ বামদিকে এগোতে থাকে। এছাড়া মার্কিন সরকারের শত্রুতা বিপ্লবীদের টিকে থাকার প্রয়োজনে সমাজতান্ত্রিক দর্শনের দিকে এগিয়ে আসেন।

বিপ্লবী সরকারের প্রথম কাজ হিসেবে চোখে পড়ে পশ্চাদপদতা, দারিদ্র্য, ফসলভিত্তিক সারাদেশকে সমৃদ্ধ ও উন্নত করে যে আশাআকাঙ্ক্ষা নিয়ে সাধারণ মানুষ বিপ্লবকে সমর্থন করেছিল, তা অন্তত কিছুটা হলেও পূর্ণ করা এ সরকারের দায়িত্ব। বিপ্লবী যুদ্ধ পুনর্গঠনে চে গুয়েভারা এগিয়ে আসেন। ১৯৫৯ সালের সেপ্টেম্বরে চে' [National Instiute of Agrarian Reform] NRA শিল্প বিভাগের প্রধান হন। ১৯৬৯ সালের নভেম্বর ন্যাশনাল ব্যাংকের প্রেসিডেনট হন। ১৯৬১ ফেব্রুয়ারিতে চে' শিল্পমন্ত্রী ক্ষেত্রে অনেক অবদান রেখেছেন। ১৯৬৫ সালে অনেক সংগঠন মিলে কিউবার কমিউনিস্ট পার্টি সংগঠিত হয়। চে গুয়েভারা ছিলেন তার অন্যতম নেতা।

১৯৬৫ এপ্রিলে চে গুয়েভারা স্বেচ্ছায় কিউবা ছেড়ে যান, ফের সরাসরি সশস্ত্র বিপ্লবের নেতৃত্ব দিতে। প্রথম আফ্রিকার কঙ্গো, পরে গোপনে ফিরে আসেন বলিভিয়া, সেখানে গেরিলা বাহিনীর নেতা হিসেবে সামরিক একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করেন। মার্কিন তাবোর বলিভিয়ান সৈন্যরা চে গুয়েভারাকে আহত ও বন্দী করে, পরদিন মার্কিন সিআইএ'র হুকুমে ১৯৬৭ সালের ৮ অক্টোবর চে গুয়েভারাকে হত্যা করে। কিউবা সরকারের অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও চে গুয়েভারার মরদেহ বলিভিয়ান-মার্কিনি ছায়া সরকার ফিরিয়ে দেয়নি।[১৬৭]

পৃথিবীতে বিপ্লবের জন্ম তারাই দিতে সক্ষম হয়েছেন, যারা ভাবনা থেকে নিজেকে আলাদা করতে পেরেছেন। **নেলসন ম্যান্ডেলা, অং সান সু চি, আর্নেস্তো চে গুয়েভারা,** এদের কারো জীবনচরিতই আমার অনুকরণীয় আদর্শ নয়। এদের জীবনের ঘটনা বর্ণনার উদ্দেশ্যও তাই নয়। কারণ আমার কাছে আছে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব, মানবতার বন্ধু, পথপ্রদর্শক, সেরা বীর হয়রত

১৬৫, মাহবুব কামরান সম্পাদিত, চে গুয়েভারা রচনা সমগ্র।

www.amarboi.org

মুহাম্মদ (সা.) এর জীবনাদর্শ। কিন্তু একটি বার কি আমরা ভেবে দেখেছি, শুধুমাত্র মানবরচিত কোন আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য এ মানুষগুলো যদি এত ত্যাগ স্বীকার করতে পারেন, তাহলে এ পৃথিবীর সেই নিভুল আদর্শ আল-ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য মুসলমানদের ত্যাগের ইতিহাস কত বিস্তৃত ও ব্যাপক হওয়া প্রয়োজন ছিল। এ কথা আমরা প্রত্যেকেই নিজেকে যদি একবার জিজ্ঞাসা করি। তাহলে আমরা এর কোনো সদুত্তর দিতে পারব কি? হযরত বেলাল, খাব্বাব, হামজা (রা.) যে জান্নাত পাওয়ার জন্য এত ত্যাগ স্বীকার করেছেন আমাদেরকে কোন ত্যাগ ছাড়াই যদি অমন জান্নাত দেযা হয় তাহলে এর মূল্যের পার্থক্যটি কোথায়?

বিশ্বব্যাপী নয়া ক্রুসেড

খ্রিষ্টান ইউরোপ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধর ইসলামের ওপর ক্ষুব্ধ ছিল। কিন্তু শক্তিশালী মুসলিম সাম্রাজ্যের উপস্থিতিতে ও প্রতিবেশী খ্রিষ্টান রাজ্যগুলোর ওপর তাদের অব্যাহত অগ্রাভিযানের দরুন তাদের আক্রমণ পরিচালনার সাহস হতো না। হি. ৫ম/খ্রি. ১১শ শতাব্দীর শেষে এমন অবস্থার উদ্ভব হয় যে, ইউরোপের ক্রুসেড যোদ্ধারা সিরিয়া ও ফিলিস্তিন অভিমুখে ধাবিত হয় এবং তাদের সেনাবাহিনী জেরুসালেম (বায়তুল মাকদিস) জয় করে নেয় এবং কয়েক বছরের মধ্যেই ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের এক বিরাট অংশই তদের দখলে চলে যায়। বিখ্যাত ইংরেজ ঐতিহাসিক স্টানলি লেনপুল বলেন :

"The crusaders penetrated like a wedge between the old wood and the new and for a while seemed to cleave the trunk of Mhamadan Empire into splinters."

"ক্রুসেডাররা এসব দেশে এমন সহজে ঢুকে পড়েছিল যেমন পুরনো কাষ্ঠখণ্ডের ভেতর খুব সহজে পেরেক ঢোকানো হয়। স্বল্প সময়ের জন্য এরূপ মনে হচ্ছিল যে, তারা ইসলামরূপী বৃক্ষের মূল কাণ্ড উপড়ে ফেলে তা ধুনিত তুলোর মতো উড়িয়ে দেবে।"

ক্রুসেডাররা বায়তুল মুকাদ্দাসে প্রবেশের সময় বিজয়ের নেশায় উন্মত্ত হয়ে অসহায় মুসলমানদের সঙ্গে যে আচরণ করেছিল তার উল্লেখ একজন খ্রিষ্টান ঐতিহাসিক নিম্নোক্তভাবে করেছেন :

"So terrible, it is Sid, was the carnage which followed that the horses of the crusaders who rode up to the mosque of Omar were knee-deep in the stream of blood. Infants were seized by their feet and deshed against the wlls or whirled over the battlements, while the Jews were all burnt alive in their synagogue."

www.amarboi.org

"বায়তুল মুকাদ্দাসে বিজয়ীবেশে প্রবেশ করার পর ক্রুসেড যোদ্ধারা এভাবে পাইকরি হত্যাকাণ্ড চালিয়েছিল যে, যেসব ক্রুসেড যোদ্ধা ঘোড়ায় চড়ে মসজিদে ওমর (রা.)-এ গিয়েছিল তাদের ঘোড়ার হাঁটু পর্যন্ত রক্তের বন্যায় ডুবে গিয়েছিল। বাচ্চা শিশুদেরকে ঠ্যাং ধরে দেয়াল গাত্রে আছড়ে মারা হয় অথবা প্রাচীরের ওপর থেকে চক্রাকারে ঘুরিয়ে বাইরে নিক্ষেপ করা হয়। অন্য দিকে ইহুদিদেরকে তাদের সিনাগগের মধ্যে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়।"[১৬৮]

বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয় ছিল মুসলিম সাম্রাজ্যের দুর্বলতার পতন এবং খ্রিষ্টান বিশ্বের উত্থান ও ক্রমবর্ধমান শক্তির পরিচায়ক। এ ছিল মুসলিম বিশ্বের জন্য বিপদ সঙ্কেত। খ্রিষ্টানদের দুঃসাহস ও ধৃষ্টতা এরপর থেকে এতখানি বেড়ে যায় যে, কির্ক-এর শাসনকর্তা রেজিনাল্ড মক্কা মুআজ্জমা ও মদিনা মুনাওয়ারার ওপর আক্রমণ পরিচালনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছিল। রিদ্দার ঘটনার পর ইসলামের ইতিহাসে এর চাইতে বেশি নাযুক মুহূর্ত ও বিপজ্জনক সময় আর আসেনি।

ঠিক এমনি ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ, দ্বিধাদ্বন্দ্ব ও বর্ধিত হতাশার মাঝে মুসলিম জাহানের ভাগ্যাকাশে এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের আবির্ভাব ঘটে। যেখানে আদৌ আশার ক্ষীণ আলোকরেখা দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল না, সেখান থেকে এমন এক নতুন শক্তির অভ্যুদয় হয় যার কল্পনাও কারও মনে ঠাঁই পায়নি। আর সেটা ছিল মাওসিলের জঙ্গি খান্দানের দু'জন সদস্য ইমাদুদ্দীন জঙ্গি (মৃ. ৫৪১ হি.) এবং তদীয় পুত্র নূরুদ্দীন জঙ্গি (মৃ ৫৬৯ হি.)। তাঁরা ক্রুসেডারদের উপর্যুপরি পরাজয় বরণে বাধ্য করেন এবং বায়তুল মুকাদ্দাস ব্যতিরেকে (যার বিজয় সুলতান সালাহউদ্দীনের ভাগ্যে নির্ধারিত ছিল) ফিলিস্তিনের প্রায় গোটাটাই ক্রুসেডারদের হাত থেকে মুক্ত করেছিলেন। নূরুদ্দীন জঙ্গি তাঁর আত্মিক সৌজন্য, যুহ্দ ও আল্লাহভীতি, উত্তম ব্যবস্থাপনা, ন্যায়বিচার, বিশ্বস্ততা, বিনয় ও নম্রতা, জিহাদী প্রেরণা এবং ঈমান ও ইয়াকিনের দিক দিয়ে ইসলামের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব হিসেবে উদ্ভাসিত হয়ে আছেন। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনুল-আছীর জাযারী তদীয় 'তারিখুল কামিল' নামক গ্রন্থে বলেন : আমি বিগত সুলতানদের জীবন ও সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে গভীরভাবে পড়াশোনা করেছি। খুলাফায়ে রাশেদীন ও ওমর ইবনু'ল আবদুল আযীযের পর নূরুদ্দীনের চাইতে অনুপম চরিত্রের অধিকারী ও তাঁর চেয়ে অধিক ন্যায়বিচারক সুলতান আমি আর দেখিনি।

১৬৬, আবুল ফিদা হামাবীর ইতিহাস।

www.amarboi.org

মুসলমানদের হাতে বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয়

মুসলমানদের হাতে বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয় ও হিত্তিন রণক্ষেত্রে খ্রিষ্টানদের অবমাননাকর পরাজয়ে গোটা ইউরোপে পুনরায় ক্রোধ ও জিঘাংসার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। সমগ্র ইউরোপ সিরিয়া (শাম)-এর মত ছোট্ট দেশটির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এদের সকলের মোকাবেলায় ছিলেন একাকী সুলতান সালাহউদ্দীন, তাঁর আত্মীয়-বান্ধব ও কতিপয় মিত্র যাঁরা গোটা মুসলিম বিশ্বের পক্ষ থেকে খ্রিষ্টান শক্তিকে প্রতিরোধ ও প্রতিহত করে যাচ্ছিলেন।

অবশেষে পাঁচ বছরের অব্যাহত রক্তাক্ত যুদ্ধের পর ১১৯২ খ্রিষ্টাব্দে রমলা নামক স্থানে ক্লান্ত ও অবসন্ন উভয় পক্ষের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয়। বায়তুল মুকাদ্দাসসহ মুসলমানদের বিজিত শহর ও দুর্গগুলো স্বাগের মতই মুসলমানদের হাতে থাকে।

সমুদ্রোপকূলবর্তী ক্ষুদ্র রাজ্য একরের নিয়ন্ত্রণ খ্রিষ্টানদের হাতে ছিল। বাদ বাকি গোটা দেশই ছিল সুলতান সালহউদ্দীনের অধিকারে। সুলতান সালাহউদ্দীন যে দায়িত্ব ও খেদমত নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন এবং সত্যি বলতে কী, আল্লাহ তা'আলা যে কর্মভার তাঁর কাঁধে ন্যস্ত করেছিলেনর তাঁর হাতে তা পূর্ণতা লাভ করে।[১৬৬] লেনপুল বলেন :

The Holy War was over; the five years' contest ended. Before the great victory at Hittin in July, 1187, not an inch of Palestine west of the Jordan ws in the Muslim's hands. After the peace of Ramla in September, 1192, the whole land was theirs except an arrow strip of coast from tyre to Jaffa. Sladin had no couse to be ashamed of the treaty.

"পাঁচ বছরের অব্যাহত রক্তারক্তির পর অবশেষে পবিত্র যুদ্ধ (?) শেষ হলো। ১১৮৭ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই মাসে হিত্তিনে মুসলমানদের বিজয়ের আগে জর্দান নদীর পশ্চিমে তাদের অধিকারে এক ইঞ্চি জায়গাও ছিল না। ১১৯২ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরে যখন রমলার সন্ধি স্থাপিত হয় তখন সূর থেকে শুরু করে য়াফা পর্যন্ত সমুদ্রোপকূল এলাকায় এক চিলতে ভূখণ্ড ছাড়া গোটা দেশটাই মুসলমানদের অধিকার চলে গেল। এই সন্ধি স্থাপনের দরুন সালাহউদ্দীনের এতটুকু লজ্জিত হওয়ার প্রয়োজন ছিল না।"

১৬৬, সুলতান সালাহুদ্দীন।

www.amarboi.org

সুলতান সালাহউদ্দীন সর্বোত্তম সাংগঠনিক যোগ্যতা ও নেতৃত্বসুলভ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। তিনি কেবল সিপাহসালার ও বিজেতাই ছিলেন না, বরং জনপ্রিয় নেতা ও সকলের কাছেই গ্রহণযোগ্য সিপাহিও ছিলেন। কয়েক শতাব্দী পর বিক্ষিপ্ত ও বিস্তৃত ইসলামী রাজ্য ও শক্তি এবং নানাভাবে বিভক্ত ও পরস্পর বিরোধী মুসলিম জাতিগোষ্ঠী ও গোত্রগুলোকে তিনি জিহাদের পতাকাতলে সমবেত করেন। সুদীর্ঘকাল পর তাঁর নেতৃত্বে মুসলিম বিশ্ব একটি সুসংগঠিত ও সুশৃঙ্খল আন্তরিকতাপূর্ণ যুদ্ধ করে যার লক্ষ্য ইসলামের হেফাজত ও জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ ছাড়া আর কিছু ছিল না। লেনপুল যথাযথ লিলেছেন :

"All the strength of Christendom concentrated in the third Crusade had not shaken Saladin's power. His soldiers may have murmured at their long months of hard and perilous service year after year, but they never refused to come to his summons and lay down their lives in his cause....."

"তৃতীয় ক্রুসেড যুদ্ধে সমগ্র খ্রিষ্টান জগতের মিলিত শক্তি মুসলমানদের মোকাবেলায় অবতীর্ণ হয়। কিন্তু সালাহউদ্দীনের শক্তিতে তারা এতটুকু চিড় ধরাতে পারেনি। সালাহউদ্দীনের সৈন্যরা মাসের পর মাস কঠিন পরিশ্রম এবং বছরের পর বছর বিপদসঙ্কুল খেদমতে নিয়োজিত থাকার কারণে ক্লান্তি ও অবসাদে ভেঙে পড়েছিল বটে, কিন্তু তাদের মুখে অভিযোগের লেশমাত্র ছিল না। তলব মাত্রই হাজির হতে এবং একটি নেক কাজে নিজেদের জীবন কোরবানি দিতে তাদের কেউ পিছপা হয়নি।"

সম্মুখে অগ্রসর হয়ে তিনি বলেন :

Kurds, Tukmans, Arabs and Egyptians, they ware all Moslem's and his servants when he called. In spite of their differences of race, their national jealousies and tribal pride, he had kept tem together as one host-not without difficulty and, twice or thrice, a critical wavers.

"কুর্দ, তুর্কমেন, আরব, মিসরীয় সমস্ত মুসলমানই ছিল সুলতানের খাদেম। তলব মাত্রই তারা খাদেমের মতই সুলতানের খেদমতে এসে হাজির হতো। কে কোন্ বংশের কিংবা কে কোন্ জাতিগোষ্ঠীর সেদিকে তাদের লক্ষ্য ছিল না। বর্ণ, বংশ, গোত্রগত বৈপরীত্য সত্ত্বেও সুলতান তাদেরকে এমন একটি অখণ্ড ও ঐক্যবদ্ধ শক্তিতে পরিণত করেছিলেন যে, গোটা বাহিনী যেন এক আত্মায় লীন হয়ে গিয়েছিল। মনে হতো সবাই যেন একটি জাতিগোষ্ঠীর সদস্য!"

www.amarboi.org

বীর সালাহউদ্দীনের নেতৃত্ব

নূরুদ্দীনের পর তাঁরই হাতে গড়া ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সুলতান সালাহউদ্দীন খ্রিষ্টান জগতের মোকাবেলায় মুসলিম বিশ্বের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। অবশেষে বিভিন্ন যুদ্ধের পর তিনি হিত্তিন (ফিলিস্তিন) প্রান্তরে ১৪ রবিউল আউয়াল, ৫৮৩ হি./৪ঠা জুলাই ১১৮৭ খ্রি. ক্রুসেডারদের এমন শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন যে, তাদের কোমর ভেঙে যায় এবং তাদের ভাগ্যের চূড়ান্ত ফয়সালা শুনিয়ে দেয়।

"A single saracen was seen dragging some thirty Christians he had taken prisoners and tied together with ropes. The dead lay in heaps, like stones upon stones, whilst mutilated heads strewed the ground like a plentiful crop of melons."

"এক একজন মুসলিম সৈনিক তিরিশ জনের মত খ্রিষ্টান সৈন্যের প্লাটুন, যাদেরকে সে স্বহস্তে বন্দী করেছিল, তাঁবুর দড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছিল। নিহত ক্রুসেডারদের লাশ ও তাদের কর্তিত হাত-পা এমনভাবে স্তূপাকারে পড়েছিল যেমনভাবে পাথরের পর পাথর স্তূপাকারে পড়ে থাকে। কর্তিত ও খণ্ড-বিখণ্ড লাশ বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে থাকে।"

যুদ্ধের এই রক্তাক্ত ময়দানে ৩০ হাজার লোক মারা গিয়েছিল বলে দীর্ঘদিন যাবৎ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল।

হিত্তিন যুদ্ধে বিজয় লাভের পর সুলতান সালাহউদ্দীন ২৭ রজব তারিখে হি. ৫৮৩/১১৮৭ খ্রি. বায়তুল মুকাদ্দাস পুনরুদ্ধার করেন এবং সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেন যা সুদীর্ঘ ৯০ বছর যাবৎ মুসলমানদের হৃদয়-মনকে অস্থির করে রেখেছিল। সুলতানের বিশ্বস্ত বন্ধু ও সাথী কাযী বাহাউদ্দীন ইবন শাদ্দাদ বলেন :

"এ ছিল এক বিরাট বিজয়। এই পবিত্র মুহূর্তে বায়তুল মুকাদ্দাসে আলিম-ওলামা, কামিল ও মুসাফির-পর্যটকদের এক বিরাট সমাবেশ ঘটে। লোকেরা যখন জানতে পারল, সমুদ্রোপকূলবর্তী এক বিরাট সমাবেশ ঘটে। লোকেরা যখন জানতে পারল, সমুদ্রোপকূলবর্তী এলাকাসমূহ মুসলমানরা জয় করে ফেলেছে, তখন মিসর ও সিরিয়া থেকে ওলামায়ে কিরাম দলে দলে বায়তুল মুকাদ্দাস অভিমুখে রওয়ানা হন। চতুর্দিকে দো'আ ও তকবির-তাহলিল ধ্বনিত হচ্ছিল। ৯০ বছর পর বায়তুল মুকাদ্দাসে জুমুার সালাত অনুষ্ঠিত হয় এবং কুব্বাতু'স-সাখবার ওপর সেই ক্রস-কাষ্ঠ স্থাপন করা হয়েছিল তা নামিয়ে ফেলা হয়। সে এক আশ্চর্য দৃশ্য! ইসলামের বিজয় ও আল্লাহর সাহায্য খোলা চোখে দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল।"

www.amarboi.org

সুলতান সালাহউদ্দীন প্রদর্শিত ও সময়কার সদাশয়তা, উদারতা, মহত্ত্ব ও ইসলামী আখলাক-চরিত্রের কথা উল্লেখ করে ঐতিহাসিক লেনপুল বলেন :

"If the taking of Jerusalem were the only fact known about Saladin, it were enough to prove hi the most chivalrous and great-hearted conqueror of his own and perhaps of any age."

"সুলতান সালাহউদ্দীনের সমস্ত গুণের ভেতর কেবল এই একটি গুণের কথা যদি দুনিয়া জানত, যদি জানতে পারত তিনি কিভাবে জেরুসালেমকে অনুগৃহীত করেছিলেন তাহলে তারা এক বাক্যে স্বীকার করত, সুলতান সালাহউদ্দীন কেবল তাঁর যুগের নন, বরং সর্বযুগের সর্বাপেক্ষা উন্নত মনোবলসম্পন্ন হৃদয়বান মানুষ এবং বীরত্ব ও ঔদার্যের জীবন্ত প্রতীক ছিলেন।

আজ সালাহউদ্দীনের মত নেতার প্রয়োজন

৫৮৯ হিজরির ২৭ সফর/৪ মার্চ, ১১৯৩ খ্রি. তারিখে ইসলামের এই বিশ্বস্ত সন্তান দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করেন। সালাহউদ্দীনের জিহাদী প্রয়াস ও তাঁর সহয়োপযোগী নেতৃত্ব মুসলিম জাহানকে ক্রুসেডারদের গোলামির ভয়াবহ বিপদ থেকে দীর্ঘ দিনের জন্য নিরাপদ করে দেয়। মুসলিম জাহানের ভাগ্যাকাশ পরিষ্কার হয়ে যায়। ক্রুসেডাররা কিন্তু এরসব যুদ্ধ থেকে ঠিক ফায়দা লুটে। তারা নিজেদের ও মুসলিম জাহানের দুর্বলতাগুলো অধ্যয়ন ও অভিজ্ঞতার নিরিখে পর্যালোচনা করার পর নতুন ক্রুসেড যুদ্ধের (যার পরিণতি ঊনবিংশ শতাব্দীতে এসে দেখা দেয়) প্রস্তুতিতে মগ্ন হয়ে পড়ে। কিন্তু মুসলিম জাহানের ওপর পুনরায় আলস্য ও গাফিলতির ভূত চেপে বসে। পারস্পরিক অনৈক্য ও হানাহানি পুনরায় মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। সালাহউদ্দীনের পর মুসলিম জাহান পুনরায় এরকম অকৃত্রিম নেতা ও পথপ্রদর্শক পায়নি, যিনি নিঃস্বার্থভাবে ইসলামের খেদমতের জন্য অস্থির হয়েছেন, যার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য জিহাদ ফি সাবিল্লিাহ ছাড়া আর কিছু নয় এবং যিনি মুসলিম জাহানের এতটা আস্থা ও বিশ্বাস অর্জন করেছেন আর মুসলিম বিশ্বের নাড়ির সঙ্গে যিনি এতটা সম্পর্কিত ছিলেন যতটা ছিলেন সুলতান সালাহউদ্দীন।

তাই কবির ভাষায়-

হাসিয়া মরেছে, করেনি কখনো পৃষ্ঠপ্রদর্শন,
ইসলাম মানে বুঝেছিল তারা অসত্য সাথে রণ।
তা'রা জেনেছিল, দুনিয়ার তারা আল্লার সৈনিক,
অর্জন করেছিল স্বাধীনতা নেয়নি মাগিয়া ভিখ্!

www.amarboi.org

জয়ী হতে হলে মৃত্যুঞ্জয়ী পুরুষ হইতে হয়,
শত্রু-সৈন্য দেখে কাঁপে ভয়ে, সে ত সেনাপতি নয়!
শত্রু-সৈন্য যত দেখে তত রণ-তৃষ্ণা তার বাড়ে,
দাবানল-সম তেজ জ্বলে ওঠে শিয়ায় শিয়ায় হাড়ে!
তলোয়ারে তার তত তেজ ফোটে যত সে আঘাত খায়,
তত বধ করে শত্রুর সেনা, রসদ যত ফুরায়।

আজ পাশ্চাত্যের নয়া ক্রুসেডের মোকাবেলায় মুসলমানদের ঘরে ঘরে যদি তৈরি হয় সুলতান সালাহউদ্দীনের যোগ্য উত্তরসূরি তাহলে আবার বিজয় কেতন উড়বে বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তে। হযরত শাহজালাল, শাহ মখদুম, হাজী শরীয়ত উল্লাহ আর শহীদ তিতুমীরের স্মৃতি আর শহীদের রক্ত ভেজা মাটি ভেদ করে বেরিয়ে আসবে এই জনপদের যুবকদের মাঝ থেকেই বেরিয়ে আসবে এমন দুঃসাহসী নেতা। বিশ্ব আজ সালাহউদ্দীনের মতো নেতার প্রতীক্ষায় প্রহর গুনছে।

সারা পৃথিবীতে আবার মুসলিম উম্মাহর জয়গান ধ্বনিত হবে সেদিন বেশি দূরে নয়। তাই আশার আলোর মশাল দিয়ে জাগাতে হবে সবাইকে। কবির ভাষায়-

নিরাশ হয়ো না! নিরাশা ও অদৃষ্টবাদীরা যত
যুদ্ধ না করে হয়ে অছে কেউ আহত ও কেউ হত!
যে মাথা নোয়ায়ে সিজ্‌দা করেছ এক প্রভু আল্লারে,
নত করিও না সে মাথা কখনো কোনো ভয় কোনো মারে!
আল্লার নামে নিবেদিত শির নোয়ায় সাধ্য কার।

www.amarboi.org

ষষ্ঠ অধ্যায়

ধৈর্য সাফল্যের চাবিকাঠি

প্রকৃত পক্ষে সৎকর্মশীল ঈমানদারদের গোটা পার্থিব জীবনকেই সবর বা ধৈর্যের জীবন বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। ঈমান আনার পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কোন ব্যক্তির নিজের অবৈধ আশা-আকাঙ্ক্ষাকে অবদমিত করা। আল্লাহর নির্দিষ্ট সীমাসমূহ মেনে চলা, আল্লাহর নির্ধারিত ফরজসমূহ পালন করা, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য নিজের সময়, অর্থসম্পদ, নিজের শ্রম, নিজের শক্তি ও যোগ্যতা এমনকি প্রয়োজনের মুহূর্তে প্রাণ পর্যন্ত কুরবানি করা, এটা সার্বক্ষণিক সবর, স্থায়ী সবর, সর্বাত্মক সবর এবং জীবনব্যাপী সবর।

أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

তারা দুইবার পুরস্কৃত হবে তাদের সবরের কারণে। তারা মন্দের জওয়াবে ভাল করে এবং আমি তাদেরকে যা দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করে।[১৭০]

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ

অতএব, আপনি সবর করুন নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র ওয়াদা সত্য। আপনি আপনার গোনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং সকাল-সন্ধ্যায় আপনার পালনকর্তার প্রশংসাসহ পবিত্রতা বর্ণনা করুন।[১৭১]

وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ

এ চরিত্র তারাই লাভ করে, যারা সবর করে এবং এ চরিত্রের অধিকারী তারাই হয়, যারা অত্যন্ত ভাগ্যবান।[১৭২]

---

১৭০ সূরা কাসাস, ৫৪
১৭১ সূরা আল মুমিন, ৫৫
১৭২ সূরা হ-মী-ম আস সিজদা, ৩৫

www.amarboi.org

সাহসী লোকের দরকার

এজন্য সাহসী লোকের দরকার। দরকার দৃঢ়সঙ্কল্প, সাহস, অপরিসীম সহনশীলতা এবং চরম আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা। কিন্তু সে ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তিকে এমন সব বাতিলপন্থী দুষ্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে ন্যায় ও সত্যের জন্য লড়াই করতে হয়, যারা নৈতিকতার যে কোনো সীমা লঙ্ঘন করতে দ্বিধা করে না এবং শক্তি ও ক্ষমতার নেশায় চুর হয়ে আছে সেখানে দুষ্কর্মের মোকাবেলা সৎকর্ম দিয়ে করে যাওয়া তাও আবার উচ্চমাত্রার সৎকর্ম দিয়ে এবং এসবের নিয়ন্ত্রণের বাগডোর হাতছাড়া হতে না দেয়া কোনো সাধারণ মানুষের কাজ নয়। কেবল সে ব্যক্তিই এ কাজ করতে পারে যে বুঝে-শুনে ন্যায় ও সত্যকে সমুন্নত করার জন্য কাজ করার দৃঢ় সঙ্কল্প গ্রহণ করেছে। যে তার প্রবৃত্তিকে সম্পূর্ণরূপে জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিচার শক্তির অনুগত করে নিয়েছে এবং যার মধ্যে নেকি ও সততা এমন গভীরভাবে গেড়ে বসেছে যে বিরোধীদের কোনো অপকর্ম ও নোংরামি তাকে তার উচ্চাসন থেকে নিচে নামিয়ে আনতে সফল হতে পারে না।

وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ

আর বহু নবী ছিলেন, যাঁদের সঙ্গী-সাথীরা তাঁদের অনুবর্তী হয়ে জেহাদ করেছে; আল্লাহর পথে-তাদের কিছু কষ্ট হয়েছে বটে, কিন্তু আল্লাহ্‌র রাহে তারা হেরেও যায়নি, ক্লান্তও হয়নি এবং দমেও যায়নি। আর যারা সবর করে, আল্লাহ্ তাদেরকে ভালবাসেন।[১৭৩]

لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

অবশ্য ধন-সম্পদে এবং জনসম্পদে তোমাদের পরীক্ষা হবে এবং অবশ্য তোমরা শুনবে পূর্ববর্তী আহলে কিতাবদের কাছে এবং মুশরেকদের কাছে বহু অশোভন উক্তি। আর যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর এবং পরহেজগারি অবলম্বন কর, তবে তা হবে একান্ত সৎসাহসের ব্যাপার।[১৭৪]

তাদের গালিগালাজ, মিথ্যা দোষারোপ, বেহুদা কথাবার্তা ও অপপ্রচারের মোকাবেলায় অধৈর্য হয়ে তোমরা এমন কোনো কথা বলতে শুরু করো না যা সত্য, সততা, ন্যায়, ইনসাফ, শিষ্টাচার, শালীনতা ও নৈতিকতাবিরোধী।

---

১৭৩ সূরা আল ইমরান, ১৪৬

১৭৪ তদেক, ১৮৬

www.amarboi.org

إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ

তোমাদের যদি কোন মঙ্গল হয়; তাহলে তাদের খারাপ লাগে। আর তোমাদের যদি অমঙ্গল হয় তাহলে আনন্দিত হয় আর তাতে যদি তোমরা ধৈর্যধারণ কর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর, তবে তাদের প্রতারণায় তোমাদের কোনই ক্ষতি হবে না। নিশ্চয়ই তারা যা কিছু করে সে সমস্তই আল্লাহ্‌র আয়ত্তে রয়েছে।[১৭৫]

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ

তোমাদের কি ধারণা, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ আল্লাহ্‌ এখনও দেখেননি তোমাদের মধ্যে কারা জেহাদ করেছে এবং কারা ধৈর্যশীল।[১৭৬]

মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী ইসলামী আন্দোলন সাফল্যের শর্তাবলী বইয়ে সে চিত্রটি তুলে ধরেছেন এভাবে–

ধৈর্যকে সফল্যের চাবিকাঠি বলা যায়। ধৈর্যের বহু অর্থ হয় এবং খোদার পথে যারা কাজ করে তাদের এর প্রত্যেকটি অর্থের প্রেক্ষিতেই ধৈর্যশীল হতে হয়। ধৈর্যের একটি অর্থ হচ্ছে তাড়াহুড়ো না করা, নিজের প্রচেষ্টার ত্বরিত ফল লাভের জন্য অস্থির না হওয়া এবং বিলম্ব দেখে হিম্মত হারিয়ে না বসা। ধৈর্যশীল ব্যক্তি সারাজীবন একটি উদ্দেশ্য সম্পাদনের জন্য অনবরত পরিশ্রম করতে থাকে এবং একের পর এক ব্যর্থতার সম্মুখীন হয়েও পরিশ্রম থেকে বিরত হয় না। মানুষের সংশোধন ও পরিগঠনের কাজ অন্তহীন ধৈর্যের মুখাপেক্ষী। বিপুল ধৈর্য ছাড়া কোন ব্যক্তি এ কাজ সম্পাদনে সক্ষম হয় না। এটা নিছক ছেলের হাতের মোয়া নয়।

ধৈর্যের দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে তিক্ত স্বভাব, দুর্বল মত ও সঙ্কল্পহীনতার রোগে আক্রান্ত না হওয়া। ধৈর্যশীল ব্যক্তি একবার ভেবেচিন্তে যে পথ অবলম্বন করে তার ওপর অবিচল থাকে এবং একাগ্র ইচ্ছা ও সঙ্কল্পের পূর্ণ শক্তি নিয়ে অগ্রসর হতে থাকে।

ধৈর্যের সাথে বাধা বিপত্তির বিরোচিত মোকাবেলা

ধৈর্যের আর একটি অর্থ হচ্ছে বাধা বিপত্তির বিরোচিত মোকাবেলা করা এবং শান্তচিত্তে লক্ষ্য অর্জনের পথে যাবতীয় দুঃখ কষ্ট বরদাশত করা। ধৈর্যশীল ব্যক্তি যে কোন ঝড়-ঝঞ্ঝার পর্বত প্রমাণ তরঙ্গাঘাতে হিম্মতহারা হয়ে পড়ে না।

---

১৭৫ তদেক, ১২০
১৭৬ তদেক, ১৪২

www.amarboi.org

দুঃখ-বেদনা, ভারাক্রান্ত ক্রোধান্বিত না হওয়া এবং সহিষ্ণু হওয়াও ধৈর্যের একটি অর্থ। যে ব্যক্তিকে সমাজ সংশোধন ও পরিগঠনের খাতিরে কিছু অপরিহার্য ভাঙার কাজও করতে হয়, বিশেষ করে যখন দীর্ঘকালের বিকৃত সমাজে তাকে এ কর্তব্য সম্পাদন করতে হয়, তখন অবশ্যই তাকে বড়ই নিম্নস্তরের হীন ও বিশ্রী রকমের বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়। যদি সে গাল খেয়ে হাসবার ও নিন্দাবাদ হজম করার ক্ষমতা না রাখে এবং দোষারোপ ও মিথ্যা প্রোপাগান্ডাকে নির্বিবাদে এড়িয়ে গিয়ে স্থিরচিত্তে ও ঠাণ্ডা মস্তিষ্কে নিজের কাজে ব্যস্ত না থাকতে পারে, তাহলে এ পথে পা না বাড়ানোই তার জন্য বেহতর কারণ এ পথে কাঁটা বিছানো। এর প্রত্যেকটি কাঁটা এই দৃঢ় মনোবল নিয়ে মুখ উঁচিয়ে আছে যে, মানুষ অন্য যে কোনদিকে নির্বিঘ্নে অগ্রসর হতে পারে কিন্তু এ দিকে তাকে এক ইঞ্চিও এগিয়ে আসতে দেয়া হবে না। এ অবস্থায় যে ব্যক্তি কাপড়ের প্রত্যেকটি কাঁটা ছাড়াতে ব্যস্ত হবে সে কেমন করেই বা অগ্রসর হবে। এই পথে এমন সব লোকের প্রয়োজন যারা নিজের কাপড়ে কোন কাঁটা বিঁধলে কাপড়ের সেই অংশটি ছিঁড়ে কাঁটা গাছের গায়ে রেখে দিয়ে নিজের পথে এগিয়ে যেতে থাকবে। কেবল বিরোধীদের মোকাবেলায় এ ধৈর্যের প্রয়োজন হয় না বরং অনেক সময় এ পথের পথিকের নিজের সহযোগীদের তিক্ত ও বিরক্তিকর বাক্যবাণেও বিদ্ধ হতে হয় এবং তাদের ব্যাপারে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার পরিচয় না দিলে সমগ্র কাফেলা পথভ্রষ্ট হতে পারে।[১৭৭]

ধৈর্যের এক অর্থ হচ্ছে, সকল প্রকার ভয়ভীতি ও লোভ-লালসার মোকাবেলায় সঠিক পথে অবিচল থাকা, শয়তানের উৎসাহ প্রদান ও নফসের খায়েশের বিপক্ষে নিজের কর্তব্য সম্পাদন করা। হারাম থেকে দূরে থাকা ও খোদার নির্দেশিত সীমার মধ্যে অবস্থান করা, গোনাহর পথে যাবতীয় আরাম-আয়েশ, লোভ প্রত্যাখ্যান করা এবং নেকি ও সততার পথে সকল প্রকার ক্ষতি ও বঞ্চনাকে সাদরে বরণ করা। দুনিয়াপূজারীদের আরাম-আয়েশ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেও তার প্রতি লোভ না করা এবং এ জন্য সামান্য আক্ষেপ না করা। দুনিয়ার স্বার্থ উদ্ধারের পথ প্রশস্ত দেখে এবং সাফল্যের সুযোগ-সুবিধা নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়েও পূর্ণ মানসিক নিশ্চিন্ততার সাথে একমাত্র নিজের লক্ষ্য অর্জনের পথে লব্ধ দানের ওপর সন্তুষ্ট থাকার নাম ধৈর্য। উপরোক্ত সকল অর্থেই ধৈর্য হচ্ছে সাফল্যের চাবিকাঠি। কাজেই আমাদের কাজের মধ্যে যে কোন দিক দিয়ে ধৈর্যহীনতা দেখা দিলে অবশ্য আমাদেরকে তার কুফলের সম্মুখীন হতে হবে।

---

১৭৭ সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী, ইসলামী আন্দোলন : সাফল্যের শর্তাবলী।

www.amarboi.org

আমার প্রাণের কবি কাজী নজরুল ইসলামের কবিতায় এভাবে-
ভালোবাসেন না আল্লা, অবিশ্বাসী ও দুর্বলেরে,
"শেরে-খোদা" সেই হয়, যে পেয়েছে অটল বিশ্বাসেরে!
ধৈর্য ও বিশ্বাস হারায়, সে মুসলিম নয় কভু,
বিশ্বে কারেও করে না ক ভয় আল্লাহ্ যার প্রভু!
নিন্দাবাদের মাঝে "আল্লাহ্-জিন্দাবাদ"-এর ধ্বনি
বীর শুধু শোনে, কোনো নিন্দায় কোনো ভয় নাহি গণি'!
আল্লা পরম সত্য, ভয় সে ভ্রান্তির কারসাজি,
প্রচণ্ড হয় তত পৌরুষ, যত দেখে দাগাবাজি!
ভুলে কি গিয়াছ অসম সাহস নির্ভীক আরবির?
পারস্য আর রোমক সম্রাটের কাটিয়াছে শির!
কতজন ছিল সেনা তাহাদের? অস্ত্র কী ছিল হাতে?
তাদের পরম নির্ভর ছিল শুধু এক আল্লাতে!
জয় পরাজয় সমান গণিয়া করেছিল শুধু রণ,
তাদের দাপটে কেঁপে উঠেছিল পৃথিবীর প্রাঙ্গণ!
তারা দুনিয়ার বাদশাহী করেছিল ভিক্ষুক হয়ে,
তারা পরাজিত হয়নি কখনো ক্ষণিকের পরাজয়ে।

www.amarboi.org

নৈতিক চরিত্রই হাতিয়ার

বস্তুবাদী জীবনদর্শনে এই দুনিয়ার ধন-সম্পদ, ক্ষমতা কর্তৃত্বকেই সে সবকিছু মনে করে। এগুলো পেলে সে আনন্দে উল্লসিত হয় এবং বলে আল্লাহ আমাকে মর্যাদা দান করেছেন। আবার না পেলে বলে আল্লাহ আমাকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করেছেন। অর্থাৎ ধন-সম্পদ ও ক্ষমতা কর্তৃত্ব পাওয়া না পাওয়াই হচ্ছে তার কাছে মর্যাদা ও লাঞ্ছনার মানদণ্ড। অথচ প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে আল্লাহ দুনিয়ায় যাকে যা কিছুই দিয়েছেন পরীক্ষার জন্যই দিয়েছেন। ধন ও শক্তি দিয়ে পরীক্ষা করার জন্য। এগুলো পেয়ে মানুষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।
অকৃতজ্ঞ হয় তা তিনি দেখতে চান। দরিদ্র ও অভাব দিয়েছেন পরীক্ষা করার জন্য। ধৈর্য ও পরিতুষ্টিসহকারে মানুষ আল্লাহর ইচ্ছার ওপর সন্তুষ্ট থাকে এবং বৈধ সীমার মধ্যে অবস্থান করে নিজের সমস্যা ও সঙ্কটের মোকাবেলা করে, না সততা, বিশ্বস্ততা ও নৈতিকতার সব বাঁধন ছিন্ন করে আল্লাহকেই গালমন্দ দিতে থাকে তা আল্লাহ অবশ্যই দেখতে চান।

فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ (وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ

মানুষ এরূপ যে, যখন তার পালনকর্তা তাকে পরীক্ষা করেন, অতঃপর সম্মান ও অনুগ্রহ দান করেন, তখন বলেঃ আমার পালনকর্তা আমাকে সম্মান দান করেছেন। এবং যখন তাকে পরীক্ষা করেন, অতঃপর রিযিক সংকুচিত করে দেন, তখন বলেঃ আমার পালনকর্তা আমাকে হেয় করেছেন।[১৭৮]
মুসলমানদের বিশ্ব নেতৃত্বের পদে আসীন করার পর উম্মতকে সবার আগে যে কথাটির দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে, তা হলো তোমাদের জন্য যে বিছানা পেতে দেয়া হয়েছে সেটা কোন ফুলের বিছানা নয়। একটি বিরাট মহান ও বিপদসঙ্কুল কাজের বোঝা তোমাদের মাথায় চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। এই বোঝা মাথায় উঠাবার সাথে সাথেই তোমাদের ওপর চতুর্দিক থেকে বিপদ-আপদ ঝাঁপিয়ে পড়তে থাকবে। কঠিন পরীক্ষার মধ্যে তোমাদের ঠেলে দেয়া হবে।
অগণিত ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। সবর, দৃঢ়তা, অবিচলতা ও দ্বিধাহীন সঙ্কল্পের মাধ্যমে সমস্ত বিপদ-আপদের মোকাবেলা করে যখন তোমরা আল্লাহর পথে এগিয়ে যেতে থাকবে তখনই তোমাদের ওপর বর্ষিত হবে অনুগ্রহরাশি আর

---

১৭৮ সূরা ফজর, ১৫-১৬

www.amarboi.org

এই কঠিন দায়িত্বের বোঝা বহন করার জন্য তোমাদের জন্য অভ্যন্তরীণ শক্তির প্রয়োজন। একটি হচ্ছে নিজের মধ্যে সবর ও সহিষ্ণুতার শক্তি। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে নামাজ পড়ার মাধ্যমে নিজেকে শক্তিশালী করতে হবে।

দৃঢ়তা ও সাহসিকতা ঈমানের অনিবার্য দাবি

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

আর তোমরা নিরাশ হয়ো না এবং দুঃখ করো না। যদি তোমরা মুমিন হও তবে, তোমরাই জয়ী হবে।[১৭৯]

বাতিলের বিরুদ্ধে অটল ও অবিচল থাকা–

وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

তারা আর কিছুই বলেনি-শুধু বলেছে, হে আমাদের পালনকর্তা! মোচন করে দাও আমাদের পাপ এবং যা কিছু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে আমাদের কাজে। আর আমাদিগকে দৃঢ় রাখ এবং কাফেরদের ওপর আমাদিগকে সাহায্য কর।[১৮০]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

হে ঈমানদানগণ! ধৈর্য ধারণ কর এবং মোকাবেলায় দৃঢ়তা অবলম্বন কর। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক যাতে তোমরা তোমাদের উদ্দেশ্য লাভে সমর্থ হতে পার।[১৮১]

কাফেররা তাদের কুফরির ব্যাপারে যে দৃঢ়তা-অবিচলতা দেখাচ্ছে এবং কুফরির ঝাণ্ডা সমুন্নত রাখার জন্য যে ধরনের কষ্ট স্বীকার করছে তোমরা তাদের মোকাবেলায় তাদের চাইতেও বেশ দৃঢ়তা, অবিচলতা ও মজবুতি দেখাও। আর তাদের মোকাবেলায় তোমরা দৃঢ়তা, অবিচলতা ও মজবুতি দেখাবার ব্যাপারে পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতা করো।[১৮২]

لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

---

১৭৯ সূরা আল ইমরান, ১৩৯
১৮০ তদেক, ১৪৭
১৮১ তদেক, ২০০
১৮২ সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী, তাফহীমুল কুরআন, ঢাকা ঃ আধুনিক প্রকাশনী।

www.amarboi.org

অবশ্য ধন-সম্পদে এবং জনসম্পদে তোমাদের পরীক্ষা হবে এবং অবশ্য তোমরা শুনবে পূর্ববর্তী আহলে কিতাবদের কাছে এবং মুশরেকদের কাছে বহু অশোভন উক্তি। আর যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর এবং পরহেজগারি অবলম্বন কর, তবে তা হবে একান্ত সৎসাহসের ব্যাপার।[১৮৩]

إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا [184]

নিশ্চয়ই এবাদতের জন্য রাত্রিতে উঠা প্রবৃত্তি দলনে সহায়ক এবং স্পষ্ট উচ্চারণের অনুকূল।

وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا

রাত্রির কিছু অংশে তাঁর উদ্দেশে সিজদা করুন এবং রাত্রির দীর্ঘ সময় তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করুন।[১৮৫]

এমন একটি আদর্শবাদী দল যখন নিজেদের আদর্শ প্রচার করতে শুরু করে, তখন এই আদর্শের বিরোধী লোকগণ তাদের প্রতিরোধ করতে উদ্যত হয়। ফলে উভয় দলের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে যায়। কিন্তু এই দ্বন্দ্বের তীব্রতা যতই বৃদ্ধি পায় আদর্শবাদী দল বিরুদ্ধবাদীদের মোকাবেলায় ততই উন্নত চরিত্র ও মহান মানবিক গুণ মাহাত্ম্যের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতে থাকে। সে তার কর্মনীতি দ্বারা প্রমাণ করে যে, মানব সমষ্টি-তথা গোটা সৃষ্টিজগতের কল্যাণ সাধন ভিন্ন তার অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই। বিরুদ্ধবাদীদের ব্যক্তিসত্তা কিংবা তাদের জাতীয়তার সাথে এর কোন শত্রুতা নেই। শত্রুতা আছে শুধু তাদের গৃহীত জীবনধারা ও চিন্তা মতবাদের সাথে। তা পরিত্যাগ করলেই তার রক্তপিপাসু শত্রুকেও প্রাণভরা ভালবাসা দান করতে পারে। বুকের সঙ্গে মিলাতে পারে।

পরন্তু সে আরও প্রমাণ করবে যে বিরুদ্ধ পক্ষের ধন-দৌলত কিংবা তাদের ব্যবসায় ও শিল্পপণ্যের প্রতিও তার কোন লালসা নেই, তাদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণ সাধনাই একমাত্র কাম্য। তা লাভ হলেই যথেষ্ট। তাদের ধন-দৌলত তাদেরই সৌভাগ্যের কারণ হবে। কঠিন কঠোরতম পরীক্ষার সময়ও এই দল কোনরূপ মিথ্যা, প্রতারণা ও শঠতার আশ্রয় নেবে না। কূটিলতা ষড়যন্ত্রের প্রত্যুত্তরে তারা সহজ-সরল কর্মনীতিই অনুসরণ করবে। প্রতিশোধ গ্রহণের তীব্র উত্তেজনার সময়ও অত্যাচার-অবিচার, উৎপীড়নের নির্মমতায় মেতে উঠবে না। যুদ্ধেও প্রবল সংঘর্ষের কঠিন মুহূর্তেও তারা নিজেদের নীতি আদর্শ

---

১৮৩ সূরা আল ইমরান, ১৮৬
১৮৪ সূরা মুজাম্মিল
১৮৫ সূরা দাহর, ২৬

www.amarboi.org

পরিত্যাগ করবে না। কারণ সেই আদর্শের প্রচার প্রতিষ্ঠার জন্যই তো তার জন্ম। এ জন্য সততা, সত্যবাদিতা, প্রতিশ্রুতি পূরণ, নির্মল আচার-ব্যবহার ও নিঃস্বার্থ কর্মনীতির ওপর তারা দৃঢ়তার সাথে দাঁড়িয়ে থাকে।

নিরপেক্ষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা

নিরপেক্ষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে এবং প্রথমত আদর্শ হিসেবে সততা ও ন্যায়বাদের যে মানদণ্ড বিশ্ববাসীর সামনে পেশ করেছিল, নিজেকে এর কষ্টিপাথরে যাচাই করে সত্য এবং খাঁটি বলে প্রমাণ করে দেয়। শত্রু পক্ষের ব্যভিচারী, মদ্যপায়ী, জুয়াড়ি, নিষ্ঠুর ও নির্দয় সৈন্যদের সাথে এই দলের আল্লাহভীরু, পবিত্র চরিত্র মহান আত্মা, দয়ার্দ্র হৃদয় ও উদার উন্নত মনোবৃত্তি সম্পন্ন মুজাহিদদের প্রবল মোকাবেলা হয়, তখন এই দলের প্রত্যেক ব্যক্তিরই ব্যক্তিগত মানবিক ও গুণ-গরিমা প্রতিপক্ষের পাশবিক ও বর্বরতার ওপর উজ্জ্বল উদ্ভাসিত হয়ে লোকচক্ষুর সামনে প্রকটিত হতে থাকে। শত্রুপক্ষের লোক আহত বা বন্দী হয়ে এলে চতুর্দিকে ভদ্রতা, সৌজন্য, পবিত্রতা ও নির্মল মানসিক চরিত্রের রাজত্ব বিরাজমান দেখতে পায় এবং তা দেখে তাদের কলুষিত আত্মা ও পবিত্র ভাবধারার সংস্পর্শে কলুষমুক্ত হয়ে যায়।

পক্ষান্তরে এই দলের লোক যদি বন্দী হয়ে শত্রুপক্ষের শিবিরে চলে যায়, সেখানকার অন্ধকারাচ্ছন্ন পূতিগন্ধময় পরিবেশে এদের মনুষ্যত্বের মহিমা আরো উজ্জ্বল ও চাকচিক্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। এরা কোন দেশ জয় করলে বিজিত জনগণ প্রতিশোধের নির্মম আঘাতের পরিবর্তে ক্ষমা করুণা পায়, কঠোরতা নির্মমতার পরিবর্তে সহানুভূতি; গর্ব অহঙ্কার ও ঘৃণার পরিবর্তে পায় সহিষ্ণুতা ও বিনয়; ভর্ৎসনার পরিবর্তে সাদর সম্ভাষণ এবং মিথ্যা প্রচারণার পরিবর্তে সত্যের মূলনীতিসমূহের বৈজ্ঞানিক প্রচার। আর এসব দেখে খুশিতে তাদের হৃদয় মন ভরে ওঠে।

তারা দেখতে পায় যে, বিজয়ী সৈনিকরা তাদের নিকট নারীদেহের দাবি করে না, গোপন রহস্যের সন্ধান করার জন্যও এরা উদগ্রীব নয়, তাদের অর্থনৈতিক শক্তি সম্পদকে ধ্বংস করার চিন্তাও এদের নেই। তাদের জাতীয় সংস্কৃতি ও সম্মান মর্যাদার ওপরও এরা হস্তক্ষেপ করে না। বিজিত জনতা শুধু দেখতে পায়, এরা এক গভীর চিন্তায় নিমগ্ন এই জন্য যে বিজিত দেশের- একটি মানুষেরও সম্মান বা সতীত্ব যেন নষ্ট না হয়, কারো ধনমাল যেন ধ্বংস না হয়, কেউ যেন সঙ্গত অধিকার হতে বঞ্চিত না থেকে যায়, কোনরূপ অসচ্চরিত্রতা তাদের মধ্যে যেন ফুটে না ওঠে এবং সামগ্রিক জুলুম-পীড়ন যেন কোনরূপেই অনুষ্ঠিত হতে না পারে।

www.amarboi.org

পক্ষান্তরে শত্রুপক্ষ যখন কোন দেশে প্রবেশ করে, তখন সে দেশের সমগ্র অধিবাসী তাদের অত্যাচার, নির্মমতা ও অমানুষিক ধ্বংসলীলায় আর্তনাদ করে ওঠে। একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারা যায়, এই ধরনের আদর্শবাদী জিহাদের সাথে জাতীয়তাবাদী যুদ্ধ সংগ্রামের কত আকাশস্পর্শী পার্থক্য হয়ে থাকে। এই ধরনের লড়াইয়ে উচ্চতর মানবিকতা নগণ্য বৈষয়িক শক্তি-সামর্থ্য সহকারে ও শত্রুপক্ষের লৌহবর্ম রক্ষিত পাশবিকতাকে যে অতি সহজেই প্রথম আক্রমণেই পরাজিত করবে তাতে আর সন্দেহ কী?

বস্তুত উন্নত নির্মল নৈতিকতার হাতিয়ার বন্দুক-কামানের গোলাগুলি অপেক্ষাও দূরপাল্লায় গিয়ে লক্ষ্যভেদ করবে। প্রচণ্ড লড়াইয়ে কঠিন মুহূর্তেও শত্রুরা বন্ধুতে পরিণত হবে। দেশের পূর্বে মানুষের হৃদয়-মন বিজিত হবে, দেশের পর দেশ-জনপদের পর জনপদ বিনাযুদ্ধেই পরাজয় স্বীকার করে মুক্তির চিরন্তন স্বাদ গ্রহণ করবে।[১৮৬]

১৮৬ সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী, ইসলামী আন্দোলনের নৈতিক ভিত্তি।

www.amarboi.org

আল্লাহ তায়ালার ওপরই তায়াক্কুল

দুনিয়ার বৃহত্তম শক্তির পরোয়া করো না এবং মহাপরাক্রমশালী ও দয়াময় সত্তার ওপর নির্ভর করে কাজ করে যাও। যার পেছনে তার সমর্থন আছে তাকে দুনিয়ার কেউ হেয় প্রতিপন্ন করতে পারে না।

তার জন্য যে ব্যক্তির সত্যের ঝাণ্ডা বুলন্দ করার কাজে জীবন উৎসর্গ করবে তার প্রচেষ্টা তিনি কখন নিষ্ফল হতে দেবেন না।

"(তাদের অবাধ্য আচরণে তুমি মনোক্ষুণ্ন হয়ো না, তুমি বরং) সর্বোচ্চ পরাক্রমশালী ও দয়ালু আল্লাহ তায়ালার ওপরই ভরসা করো।"

(সূরা আশ শুআরা : ২১৭)

الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

নেককার মানুষ হচ্ছে তারা,) যারা ধৈর্য ধারণ করেছে (এবং সর্বাবস্থায়) নিজেদের মালিকের ওপরই নির্ভর করেছে।[১৮৭]

অর্থাৎ এমন সবার যার মধ্যে অভিযোগ ফরিয়াদ ভয়ভীতি ও কারো ক্ষতি নেই একজন উচ্চ ও প্রশস্ত হৃদয়বত্তার অধিকারী মানুষের ওপর যে বিপদ আসে তাকে ধীরস্থিরভাবে বরদাস্ত করে একমাত্র মালিকের সন্তুষ্টির জন্য আপাদমস্তক ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার প্রতিচ্ছবি মুমিন ব্যক্তির দু'টি বিশ্বাস ছিল যে এ সত্য বলার অপরাধে যে ফেরাউনের গোটা রাজ্য শাস্তিময় রোষানলে পড়বে এবং তাকে শুধু তার সম্মান মর্যাদা ও স্বার্থ হারাতে হবে তাই নয়, জীবনের আশাও ছেড়ে দিতে হবে। কিন্তু এত কিছু বুঝতে পারা সত্ত্বেও তা তিনি শুধু আল্লাহর ওপর ভরসা করে এ নাজুক সময়ে তার বিবেক যেটিকে তার কর্তব্য বলে মনে করেছে সে দায়িত্ব পালন করেছেন।[১৮৮]

وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ

"তোমরা যখন বলেছিলো, হে মূসা, আমরা আল্লাহকে প্রত্যক্ষভাবে না দেখলে কখনো তার ওপর ঈমান আনবো না, তখন (এ ধৃষ্টতার শাস্তি হিসেবে) মুহূর্তের মধ্যেই বজ্র (-সম এক গযব) তোমাদের ওপর নিপতিত হলো, আর তোমরা তার দিকে চেয়েই থাকলে (কিছুই করতে পারলে না।)"[১৮৯]

---

১৮৭ সূরা আনকাবুত, ৫৯

১৮৮ সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী,তাফহীমুল কুরআন, টিকা।

১৮৯ সূরা বাকারা , ৫৫

www.amarboi.org

যদি সৎকর্মশীলতার পথে চলা কঠিন মনে করে থাকা তাহলে সবর ও নামাজ এই কাঠিন্য দূর করতে পারে। এদের সাহায্যেই কঠিন পথ পাড়ি দেয়া সম্ভব। সবর এর শাব্দিক অর্থ বাধা দেয়া, বিরত থাকা বেঁধে রাখা। এ ক্ষেত্রে মজবুত ইচ্ছা অবিচল সঙ্কল্পই মূল হাতিয়ার।

الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ

"এরা হচ্ছে ধৈর্যশীল এবং সত্যাশ্রয়ী, (এরা) অনুগত এবং দানশীল, (সর্বোপরি) এরা হচ্ছে শেষরাতে কিংবা উষালগ্নের পূর্বে ক্ষমা প্রার্থনাকারী।"[১৯০]

সত্য পথে পূর্ণ অবিচলতার সাথে প্রতিষ্ঠিত থাকে কোন ক্ষতি বা বিপদের মুখে কখনো সাহস ও হিম্মত হারা হয় না। ব্যর্থতা এদের মনে কোন চিড় ধরায় না। লোভ লালসায় পা পিছলে যায় না। যখন আপাদদৃষ্টিতে সফল্যের কোন সম্ভাবনাই দেখা যায় না, তখনো এরা মজবুতভাবে সত্যকে আঁকড়ে ধরে থাকে।

وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ

"(আল্লাহর) আরো অনেক নবীই (এখানে এসে) ছিলো, সে নবী (আল্লাহর পথে) যুদ্ধ করেছে, তার সাথে (আরো যুদ্ধ করেছে) অনেক সাধক (ও জ্ঞানবান) ব্যক্তি, আল্লাহর পথে তাদের ওপর যত বিপদ-মসিবতই এসেছে তাতে (কোনোদিনই) তারা হতাশ হয়ে পড়েনি, তারা দুর্বলও হয়নি, (বাতিলের সামনে তারা) মাথাও নত করেনি, (এ ধরনের) ধৈর্যশীল ব্যক্তিদেরই আল্লাহ তায়ালা ভালোবাসেন।"[১৯১]

নিজেদের আবেগ-অনুভূতি, কামনা-বাসনাকে সংযত রাখে। তাড়াহুড়া করো না। ভীত আতঙ্কিত হওয়া লোভ লালসা পোষণ করা এবং অসঙ্গত উৎসাহ উদ্দীপনা প্রকাশ থেকে দূরে থাকে।

স্থির মস্তিষ্কে এবং ভারসাম্যপূর্ণ ও যথার্থ পরিমিত বিচক্ষতা ও ফায়সালা করার শক্তি সহকারে কাজ করে। বিপদ আপদ ও সঙ্কট সমস্যার সম্মুখীন হলেও যেন তোমাদের পা-না টলে, উত্তেজনাকর পরিস্থিতি দেখা দিলে ক্রোধ ও ক্ষোভের তরঙ্গে ভেসে গিয়ে তোমরা যেন কোন অর্থহীন কাজ করে না বসো। বিপদের আক্রমণ চলতে থাকলে অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে মোড় নিয়েছে দেখতে

---

১৯০ সূরা আল ইমরান, ১৭
১৯১ তদেক, ১৪৬

www.amarboi.org

পেলে মানসিক অস্থিরতার কারণে তোমাদের চেতনাশক্তি বিক্ষিপ্ত ও বিশৃঙ্খল না হয়ে পড়ে। এর মধ্যেই প্রকৃত সবর নিহিত রয়েছে।

إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ

"কিন্তু যারা পরম ধৈর্য ধারণ করে এবং নেক আমল করে, এরাই হচ্ছে সেসব লোক, যাদের জন্যে রয়েছে (আল্লাহর) ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।"[১৯২]

প্রকৃত সবরকারী কালের পরিবর্তনে মানসিক ভারসাম্য অটুট রাখে। সর্বাবস্থায় একটি যুক্তিসঙ্গত ও সঠিক মনোভাব নিয়ে এগিয়ে চলে।

অনুকূল পরিবেশের ধনাঢ্যতা কর্তৃত্ব ও খ্যাতির উচ্চাসনে চড়ে শ্রেষ্ঠত্ব ও অহঙ্কারের নেশায় মত্ত হয়ে বিপথগামী হয় না আবার বিপদ-আপদ ও সমস্যা সঙ্কটের করাল আঘাত তাকে ক্ষত-বিক্ষত করতে থাকে তাহলে এহেন অবস্থায়ও নিজের মানবিক চরিত্র বিনষ্ট করে না। এই উভয় অবস্থায়ই ধৈর্য ও সাহসিকতা অপরিবর্তিত ও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকে।

وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ

"যারা তাদের মালিকের সন্তুষ্টি লাভের জন্য (বিপদ মসিবতে) ধৈর্য ধারণ করে, যথারীতি নামায কায়েম করে, আমি তাদের যে রেযেক দিয়েছি তা থেকে তারা (আমারই পথে) খরচ করে- গোপনে কিংবা প্রকাশ্যে, যারা (নিজেদের) ভালো (কাজ) দ্বারা মন্দ (কাজ) দূরীভূত করে, তাদের জন্যই রয়েছে আখেরাতের শুভ পরিণাম।"[১৯৩]

যারা সকল প্রকার লোভ লালসা কামনা বাসনার মোকাবেলার সত্য ও সততার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে।

এই দুনিয়ায় সত্য ও ন্যায়ের পথ অবলম্বন করলে যেসব ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয় তা সবই যারা বরদাশত করে। দুনিয়ার অবৈধ পন্থা অবলম্বন করলে যেসব লাভ পাওয়া যেতে পারে তা সবই যারা দূরে নিক্ষেপ করে, যারা ভাল কাজের সুফল লাভ করার জন্য সে সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে প্রস্তুত থাকে। সে সময়টি পার্থিব জীবনের অবসান ঘটার পর অন্য জগতে আসবে এতটুকু আত্মবিশ্বাসে সবরকারীগণ বলীয়ান।

---

১৯২ সূরা হুদ, ১১
১৯৩ সূরা রাদ, ২২

www.amarboi.org

মুসলমানদের মন কখনো কখনো কাফেরদের জুলুম নিপীড়ন কূটতর্ক এবং লাগাতার মিথ্যাচার ও মিথ্যা দোষারোপের ফলে বিরক্তিতে ভরে ওঠে। এ অবস্থায় ধৈর্য ও নিশ্চিন্ততার সাথে অবস্থার মোকাবেলা এবং আত্মসংশোধন ও আত্মসংযমের জন্য তাদের নামাজ ব্যবস্থাপত্র দেয়া হয়েছে।

আল্লাহর পক্ষ থেকে মোট সবর একটি শব্দের মধ্যে দীন এবং দ্বীনি মনোভাব কর্মনীতি ও নৈতিকতার একটি বিশাল জগৎ আবদ্ধ করে রাখা হয়েছে।

أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

"এরাই হচ্ছে সেসব লোক যাদের তাদের (দ্বীনের পথে) ধৈর্য ধারণের জন্য দু'বার পুরস্কৃত করা হবে, তারা তাদের ভালো (আমল) দ্বারা মন্দ (আমল) দূর করে, আমি তাদের যে রেযেক দান করেছি তারা তা থেকে (আল্লাহর পথে) ব্যয় করে।"[১৯৪]

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ

"অতঃপর তুমি ধৈর্য ধারণ করো, আল্লাহ তায়ালার প্রতিশ্রুতি অবশ্যই সত্য, তুমি (বরং) তোমরা গুনাহখাতার জন্য আল্লাহ তায়ালার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং সকাল-সন্ধ্যায় তোমার মালিকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো।[১৯৫]

وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ

"আর এ (বিষয়)-টি শুধু তাদের (ভাগ্যেই লেখা) থাকে যারা ধৈর্য ধারণ করে এবং এ (সকল) লোক শুধু তারাই হয় যারা সৌভাগ্যের অধিকারী।"[১৯৬]

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (-) إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ

বস্তুত আল্লাহ্ বদরের যুদ্ধে তোমাদের সাহায্য করেছেন, অথচ তোমরা ছিলে দুর্বল। কাজেই আল্লাহ্কে ভয় করতে থাক, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হতে পারো। আপনি যখন বলতে লাগলেন মুমিনগণকে-তোমাদের জন্য কি যথেষ্ট নয় যে,

---

১৯৪ সূরা কাসাস, ৫৪
১৯৫ সূরা আল মুমিন, ৫৫
১৯৬ সূরা হামীম আস সিজদা, ৩৫

www.amarboi.org

তোমাদের সাহায্যার্থে তোমাদের পালনকর্তা আসমান থেকে অবতীর্ণ তিন হাজার ফেরেশ্‌তা পাঠাবেন।[১৯৭]

ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ

ধৈর্যের সাথে সাহায্য প্রার্থনা কর নামাযের মাধ্যমে। অবশ্য তা যথেষ্ট কঠিন। কিন্তু সে সমস্ত বিনয়ী লোকদের পক্ষেই তা সম্ভব।[১৯৮]

وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ

আপনার পূর্ববর্তী অনেক পয়গম্বরকে মিথ্যা বলা হয়েছে। তাঁরা এতে সবর করেছেন। তাদের কাছে আমার সাহায্য পৌঁছা পর্যন্ত তারা নির্যাতিত হয়েছেন। আল্লাহ্‌র বাণী কেউ পরিবর্তন করতে পারে না। আপনার কাছে পয়গম্বরদের কিছু কাহিনী পৌঁছেছে।[১৯৯]

تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ

এটি গায়বের খবর, আমি আপনার প্রতি অহি প্রেরণ করছি। ইতঃপূর্বে এটা আপনার এবং আপনার জাতির জানা ছিল না। আপনি ধৈর্যধারণ করুন। যারা ভয় করে চলে, তাদের পরিণাম ভাল, সন্দেহ নেই।[২০০]

যেভাবে নূহ এবং তাঁর সঙ্গী-সাথীরা সাফল্য লাভ করেছিলেন এবং তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছিল ঠিক তেমনি তুমি ও তোমার সাথীরাও সাফল্য লাভ করবে এবং তোমাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। এটিই আল্লাহর চিরাচরিত রীতি। শুরুতে সত্যের দুশমনরা যতই সফলতার অধিকারী হোক না কেন সবশেষে একমাত্র তারাই সফলকাম হবে। তোমাদের দাওয়াতকে দাবিয়ে দেয়ার জন্য তোমাদের বিরোধীদের আপাতদৃষ্টে যে সাফল্য দেখা যাচ্ছে, তাতে তোমাদের মন খারাপ করার কোনোই প্রয়োজন নেই। তোমরা সবর ও হিকমত সহকারে কাজকে অব্যাহত রাখো।

وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا

এবং তাদের সবরের প্রতিদানে তাদেরকে দেবেন জান্নাত ও রেশমি পোশাক।[২০১]

---

১৯৭ তদেক, ১২৩-১২৪
১৯৮ সূরা বাকারা ,৪৫
১৯৯ সূরা আন আম, ৩৪
২০০ সূরা হুদ, ৪৯

www.amarboi.org

নবীগণকে দাওয়াতে হকের পথে আপতিত বিপদ মসিবত সবর দ্বারা সত্য করার–

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ

আপনি আপনার পালনকর্তার আদেশের অপেক্ষায় সবর করুন এবং মাছওয়ালা ইউনুসের মতো হবেন না, যখন সে দুঃখিত মনে প্রার্থনা করেছিল।[২০২]

وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ

এবং আপনার পালনকর্তার উদ্দেশে সবর করুন।[২০৩]

قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

বলুন, হে আমার বিশ্বাসী বান্দাহগণ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর। যারা এ দুনিয়াতে সৎকাজ করে, তাদের জন্য রয়েছে পুণ্য। আল্লাহর পৃথিবী প্রশস্ত। যারা সবরকারী, তারাই তাদের পুরস্কার পায় অগণিত।[২০৪]

যারা আল্লাহভীরুতা ও নেকির পথে চলার ক্ষেত্রে সব রকমের দুঃখ-কষ্ট বরদাশত করেছে। কিন্তু ন্যায়ের পথ থেকে সরেনি তার মধ্যে যেসব লোক অন্তর্ভুক্ত যারা দীন ও ঈমানের কারণে হিজরত করে দেশান্তরিত হওয়ার দুঃখ-কষ্ট সহ্য করবে এবং যেসব লোকও অন্তর্ভুক্ত যারা জুলুম-নির্যাতনে ভরা দেশে থেকে সাহসিকতার সাথে সব বিপদের মোকাবেলা করবে।

এ জন্য সাহসী লোকের দরকার। দরকার দৃঢ়সঙ্কল্প, সাহস, অপরিসীম সহনশীলতা এবং চরম আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা। কিন্তু যে ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তিকে এমন সব বাতিলপন্থী দুষ্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে ন্যায় ও সত্যের জন্য লড়াই করতে হয়, যারা নৈতিকতার যে কোনো সীমা লঙ্ঘন করতে দ্বিধা করে না এবং শক্তি ও ক্ষমতার নেশায় চুর হয়ে আছে সেখানে দুষ্কর্মের মোকাবেলা সৎকর্ম দিয়ে করে যাওয়া তাও আবার উচ্চমাত্রার সৎকর্ম দিয়ে এবং এবকার ও নিয়ন্ত্রণের বাগডোর হাতছাড়া হতে না দেয়া কোনো সাধারণ মানুষের কাজ নয়। কেবল সে ব্যক্তিই এ কাজ করতে পারে যে বুঝে-শুনে ন্যায় ও সত্যকে সমুন্নত করার জন্য কাজ করার দৃঢ়সঙ্কল্প গ্রহণ করেছে। যে তার প্রবৃত্তিকে সম্পূর্ণরূপে জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিচারশক্তির অনুগত করে নিয়েছে এবং যার মধ্যে নেকি ও সততা এমন

---

২০১ সূরা দাহর, ১২
২০২ সূরা কলম, ৪৮
২০৩ সূরা মুদ্দাসির, ৭
২০৪ সূরা যুমার, ১০।

www.amarboi.org

গভীরভাবে গেড়ে বসেছে যে বিরোধীদের কোনো অপকর্ম ও নোংরামি তাকে তার উচ্চাসন থেকে নিচে নামিয়ে আনতে সফল হতে পারে না।

وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ()

"(আল্লাহর) আরো অনেক নবীই (এখানে এসে) ছিলো, সে নবী (আল্লাহর পথে) যুদ্ধ করেছে, তার সাথে (আরো যুদ্ধ করেছে) অনেক সাধক (ও জ্ঞানবান) ব্যক্তি, আল্লাহর পথে তাদের ওপর যত বিপদ-মসিবতই এসেছে তাতে (কোনোদিনই) তারা হতাশ হয়ে পড়েনি, তারা দুর্বলও হয়নি, (বাতিলের সামনে তারা) মাথাও নত করেনি, (এ ধরনের) ধৈর্যশীল ব্যক্তিদেরই আল্লাহ তায়ালা ভালোবাসেন।"[২০৫]

لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

"(হে ঈমানদার ব্যক্তিরা,) নিশ্চয়ই জান মালের (ক্ষতি সাধনের) মাধ্যমে তোমাদের পরীক্ষা নেয়া হবে। (এ পরীক্ষা দিতে গিয়ে) তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তী সম্প্রদায়- যাদের কাছে আল্লাহর কেতাব নাযিল হয়েছিলো এবং যারা আল্লাহর সাথে অন্যদের শরিক করেছে, তাদের (উভয়ের) কাছ থেকে অনেক (কষ্টদায়ক) কথাবার্তা শুনবে; এ অবস্থায় তোমরা যদি ধৈর্য ধারণ করো এবং আল্লাহকে ভয় করে চলো, তাহলে তা হবে অত্যন্ত বড় ধরনের এক সাহসিকতার ব্যাপার।"[২০৬]

তাদের গালিগালাজ, মিথ্যা দোষারোপ, বেহুদা কথাবার্তা ও অপপ্রচারের মোকাবেলায় অধৈর্য হয়ে তোমরা এমন কোনো কথা বলতে শুরু করো না যা সত্য, সততা, ন্যায়, ইনসাফ, শিষ্টাচার, শালীনতা ও নৈতিকতাবিরোধী।

إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ

"(তাদের অবস্থা হচ্ছে,) তোমাদের কোনো কল্যাণ হলে (তার কারণে) তাদের খারাপ লাগে, আবার তোমাদের কোনো অকল্যাণ দেখলে তারা আনন্দে ফেটে পড়ে; (এ প্রতিকূল অবস্থায়) যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ করতে পারো এবং নিজেরা সাবধান হয়ে চলতে পারো, তাহলে তাদের চক্রান্ত (ও ষড়যন্ত্র) তোমাদের কিছুই

---

২০৫ সূরা আল ইমরান, ১৪৬
২০৬ তদেব, ১৮৬

www.amarboi.org

ক্ষতি করতে পারবে না: নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা তাদের যাবতীয় কর্মকাণ্ড পরিবেষ্টন করে আছেন।"[২০৭]

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ

"তোমরা কি মনে করো তোমরা (এমনি এমনি) বেহেশতে প্রবেশ করে যাবে, অথচ আল্লাহ তায়ালা (পরীক্ষার মাধ্যমে) এ কথা জেনে নেবেন না যে, কে (তাঁর পথে) জেহাদ করতে প্রস্তুত হয়েছে এবং কে (বিপদে) কঠোর ধৈর্য ধারণ করতে পেরেছে!"[২০৮]

এই ভরসা করার কারণেই বদরে (যুদ্ধে) আল্লাহ তায়ালা তোমাদের বিজয় ও সাহায্য দান করেছিলেন, অথচ (তোমরা জানো) তোমরা কত দুর্বল ছিলে; অতএব আল্লাহকে ভয় করো, আশা করা যায় তোমরা (আল্লাহর) কৃতজ্ঞতা আদায় করতে সক্ষম হবে।"

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (-) إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ

"(সে মুহূর্তের কথাও স্মরণ করো,) যখন তুমি মোমেনদের বলছিলে, (যুদ্ধে বিজয় লাভ করার জন্য) তোমাদের মালিক যদি আসমান থেকে তিন হাজার ফেরেশতা পাঠিয়ে তোমাদের সাহায্য করেন, তাহলে তোমাদের (বিজয়ের জন্য তা কি) যথেষ্ট হবে না।"[২০৯]

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ

হে ঈমানদার ব্যক্তিরা,) তোমরা সবর ও নামাযের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও; (যাবতীয় হক আদায় করে) নামায প্রতিষ্ঠা করা (অবশ্যই একটা) কঠিন কাজ, কিন্তু যারা আল্লাহকে ভয় করে তাদের কথা আলাদা।"[২১০]

وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ

"তোমার আগেও (এভাবে) বহু (নবী)-রসূলকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা হয়েছিলো, কিন্তু তাদের মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা ও (নানা রকম) নির্যাতন চালানোর পরও তারা (কঠোর) ধৈর্য ধারণ করেছে, শেষ পর্যন্ত তাদের কাছে আমার (পক্ষ থেকে) সাহায্য এসে হাযির হয়েছে। আসলে আল্লাহর কথার

---

২০৭ সরা আল ইমরান, ১২০
২০৮ তদেব, ১৪২
২০৯ তদেক, ১২৩-১২৪
২১০ সূরা বাকারা ,৪৫

www.amarboi.org

রদবদলকারী কেউ নেই, তদুপরি নবীদের (এ সব) সংবাদ তো তোমার কাছে (আগেই) এসে পৌঁছেছে।" [২১১]

মুমিনের জন্য আল্লাহর সাহায্য অবধারিত

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ

তোমাদের কি এই ধারণা যে, তোমরা জান্নাতে চলে যাবে, অথচ সে লোকদের অবস্থা অতিক্রম করনি যারা তোমাদের পূর্বে অতীত হয়েছে। তাদের ওপর এসেছে বিপদ ও কষ্ট। আর এমনিভাবে শিহরিত হতে হয়েছে যাতে নবী ও তাঁর প্রতি যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে পর্যন্ত একথা বলতে হয়েছে যে, কখন আসবে আল্লাহ্‌র সাহায্য! তোমরা শোনে নাও, আল্লাহ্‌র সাহায্য একান্তই নিকটবর্তী।[২১২]

وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ

আপনার পূর্ববর্তী অনেক পয়গম্বরকে মিথ্যা বলা হয়েছে। তাঁরা এতে সবর করেছেন। তাদের কাছে আমার সাহায্য পৌঁছা পর্যন্ত তারা নির্যাতিত হয়েছেন। আল্লাহ্‌র বাণী কেউ পরিবর্তন করতে পারে না। আপনার কাছে পয়গম্বরদের কিছু কাহিনী পৌঁছেছে।[২১৩]

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو اللَّهِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ

অতঃপর তালুত যখন সৈন্য-সামন্ত নিয়ে বের হলো, তখন বলল, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদিগকে পরীক্ষা করবেন একটি নদীর মাধ্যমে। সুতরাং যে লোক সেই নদীর পানি পান করবে সে আমার নয়। আর যে, লোক তার স্বাদ গ্রহণ করলো না, নিশ্চয়ই সে আমার লোক। কিন্তু যে লোক হাতের আঁজলা ভরে

---

২১১ সূরা আনআম, ৩৪
২১২ সূরা বাকারা , ২১৪
২১৩ সরা আন আম, ৩৪

www.amarboi.org

সামান্য খেয়ে নেবে তার দোষ অবশ্য তেমন গুরুতর হবে না। অতঃপর সবাই পান করল সে পানি, সামান্য কয়েকজন ছাড়া। পরে তালুত যখন তা পার হলো এবং তার সাথে ছিল মাত্র কয়েকজন ঈমানদার, তখন তারা বলতে লাগল, আজকের দিনে জালুত এবং তার সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধ করার শক্তি আমাদের নেই, যাদের ধারণা ছিল যে, আল্লাহ্‌র সামনে তাদের একদিন উপস্থিত হতে হবে, তারা বারবার বলতে লাগল, সামান্য দলই বিরাট দলের মোকাবেলায় জয়ী হয়েছে আল্লাহ্‌র হুকুমে। আর যারা ধৈর্যশীল আল্লাহ্ তাদের সাথে রয়েছেন।[২১৪]

قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ

নিশ্চয়ই দুটো দলের মোকাবেলার মধ্যে তোমাদের জন্য নিদর্শন ছিল। একটি দল আল্লাহ্‌র রাহে যুদ্ধ করে। আর অপর দল ছিল কাফেরদের, এরা স্বচক্ষে তাদেরকে দ্বিগুণ দেখছিল। আর আল্লাহ্ যাকে নিজের সাহায্যের মাধ্যমে শক্তি দান করেন। এরই মধ্যে শিক্ষণীয় রয়েছে দৃষ্টিসম্পন্নদের জন্য।[২১৫]

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

আর তাদেরকে তাদের নবী বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তালুতকে তোমাদের জন্য বাদশাহ সাব্যস্ত করেছেন। তারা বলতে লাগল তা কেমন করে হয় যে, তার শাসন চলবে আমাদের ওপর। অথচ রাষ্ট্রক্ষমতা পাওয়ার ক্ষেত্রে তার চেয়ে আমাদেরই অধিকার বেশি। আর সে সম্পদের দিক দিয়েও সচ্ছল নয়। নবী বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের ওপর তাকে পছন্দ করেছেন এবং স্বাস্থ্য ও জ্ঞানের দিক দিয়ে প্রাচুর্য দান করেছেন। বস্তুত আল্লাহ্ তাকেই রাজ্য দান করেন, যাকে ইচ্ছা। আর আল্লাহ্ হলেন অনুগ্রহ দানকারী এবং সব বিষয়ে অবগত।[২১৬]

إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ-) وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (-) إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ

---

২১৪ সূরা বাকারা ২৪৯
২১৫ সূরা আল ইমরান,১৩
২১৬ সূরা বাকারা, ২৪৭

www.amarboi.org

يَكْفِيَكُمْ اَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلٰثَةِ اٰلٰفٍ مِنَ الْمَلٰئِكَةِ مُنْزَلِيْنَ (-) بَلٰى اِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا وَيَاْتُوْكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ اٰلٰفٍ مِنَ الْمَلٰئِكَةِ مُسَوِّمِيْنَ

যখন তোমাদের দু'টি দল সাহস হারাবার উপক্রম হলো, অথচ আল্লাহ্ তাদের সাহায্যকারী ছিলেন, আর আল্লাহ্র ওপরই ভরসা করা মুমিনদের উচিত। বস্তুত আল্লাহ্ বদরের যুদ্ধে তোমাদের সাহায্য করেছেন, অথচ তোমরা ছিলে দুর্বল। কাজেই আল্লাহ্কে ভয় করতে থাক, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হতে পারো। আপনি যখন বলতে লাগলেন মুমিনগণকে-তোমাদের জন্য কি যথেষ্ট নয় যে, তোমাদের সাহায্যার্থে তোমাদের পালনকর্তা আসমান থেকে অবতীর্ণ তিন হাজার ফেরেশ্তা পাঠাবেন। অবশ্য তোমরা যদি সবর কর এবং বিরত থাক আর তারা যদি তখনই তোমাদের ওপর চড়াও হয়, তাহলে তোমাদের পালনকর্তা চিহ্নিত ঘোড়ার ওপর পাঁচ হাজার ফেরেশতা তোমাদের সাহায্যে পাঠাতে পারেন।[২১৭]

بَلِ اللّٰهُ مَوْلٰكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النّٰصِرِيْنَ

বরং আল্লাহ তোমাদের সাহায্যকারী, আর তাঁর সাহায্যই হচ্ছে উত্তম সাহায্য।[২১৮]

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جَاهَدُوْا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصّٰبِرِيْنَ

তোমাদের কি ধারণা, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ আল্লাহ্ এখনও দেখেননি তোমাদের মধ্যে কারা জেহাদ করেছে এবং কারা ধৈর্যশীল।[২১৯]

اِنْ يَنْصُرْكُمُ اللّٰهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَاِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِيْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهٖ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ

যদি আল্লাহ্ তোমাদের সহায়তা করেন, তাহলে কেউ তোমাদের ওপর পরাক্রান্ত হতে পারবে না। আর যদি তিনি তোমাদের সাহায্য না করেন, তবে এমন কে আছে, যে তোমাদের সাহায্য করতে পারে? আর আল্লাহ্র ওপরই মুসলমানগণের ভরসা করা উচিত।[২২০]

---

২১৭ সূরা আল ইমরান, ১২২-১২৫
২১৮ তদেক, ১৫০
২১৯ তদেক, ১৪২
২২০ তদেক, ১৬০

www.amarboi.org

দাওয়াতে হকের বিরুদ্ধে চক্রান্তকারীদের চক্রান্ত সফল হবে না

وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ

তাদের পূর্বে যারা ছিল, তারা চক্রান্ত করেছে। আর সকল চক্রান্ত তো আল্লাহ্‌র হাতেই আছে। তিনি জানেন প্রত্যেক ব্যক্তি যা কিছু করে। কাফেররা জেনে নেবে যে, পর জীবনের আবাসস্থল কাদের জন্য রয়েছে।[২২১]

সত্যের কণ্ঠ রুদ্ধ করার জন্য মিথ্যা প্রতারণা ও জুলুমের অস্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছে। এটা আজ কোন নতুন ঘটনা নয়। অতীতেও বারবার এমনি কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে সত্যের দাওয়াতকে পরাস্ত করার জন্য।

قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ

নিশ্চয় চক্রান্ত করেছে তাদের পূর্ববর্তীরা, অতঃপর আল্লাহ্ তাদের চক্রান্তের ইমারতের ভিত্তিমূলে আঘাত করেছিলেন। এরপর ওপর থেকে তাদের মাথায় ছাদ ধসে পড়ে গেছে এবং তাদের ওপর আজাব এসেছে যেখান থেকে তাদের ধারণা ছিল না।[২২২]

সত্যের পথিকেরা যা দ্বারা শক্তি অর্জন করে

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ (-) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ (-) وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ [223]

অর্থাৎ হক ও মিথ্যার সংঘাতের যে বিধান আল্লাহ তৈরি করে দিয়েছেন তা অনিবার্য। তা পরিবর্তনের ক্ষমতা কারো নেই। সত্যপন্থীদের অবশ্য দীর্ঘকাল পরীক্ষার আগুন ঝালাই হতে হবে। তাদের পরীক্ষা দিতে হবে নিজেদের সবর। সহিষ্ণুতা, সততা, সত্যবাদিতা, ত্যাগ-তিতিক্ষা, আত্মোৎসর্গিতা, ঈমানী দৃঢ়তা ও আল্লাহর প্রতি নির্ভরশীলতা, বিপদ-মসিবত, সমস্যা ও সঙ্কটের সুকঠিন পথ অতিক্রম করে তাদের মধ্যে এমন গুণাবলী সৃষ্টি করতে হবে যা কেবল মাত্র ঐ কঠিন বিপদসঙ্কুল গিরিপথেই লালিত হতে পারে।

---

২২১ সূরা রাদ, ৪২
২২২ সূরা নাহল, ২৬
২২৩ সূরা হিজর, ৯৭-৯৮

www.amarboi.org

তাদেরকে শুরুতেই নির্ভেজাল উন্নত নৈতিক গুণাবলী ও সচ্চরিত্রের অস্ত্র ব্যবহার করে জাহেলিয়াতের ওপর বিজয় লাভ করতে হবে। এভাবে তারা নিজেদেরকে উন্নত সবরকারী বলে প্রমাণ করতে পারলেই আল্লাহর সাহায্য যথাসময়ে তাদেরকে সহায়তা দান করার জন্য এগিয়ে আসবে। কিন্তু সময় হবার পূর্বে কেউ হাজার চেষ্টা করেও তাকে আনতে পারবে না। সত্যবাদীদের বিজয় সুনিশ্চিত। কবি ভাষায়-

"পুনঃ তখ্‌তে বসিয়া যে করে তখ্‌তের অপমান,
রাজার রাজা যে, তাঁর হুকুমেই যায় তার গর্দ্দান!
ভিস্তিওয়ালার রাজত্ব, ভাই, হয়ে এল ঐ শেষ;
বিশ্বের যিনি সম্রাট তাঁরি হইবে সর্বদেশ!
রক্তচক্ষু রক্ষ যক্ষ, সাবধান! সাবধান!
ভুল বুঝাইয়া, বুঝেছ ভুলাবে আল্লার ফরমান্?
এক আল্লারে ভয় করি মোরা, কারেও করি না ভয়,
মোদের পথের দিশারী এক সে সর্বশক্তিময়।
সাক্ষী থাকিবে আকাশ পৃথিবী, রবি শশী গ্রহ তারা,
কাহারা সত্যপথের পথিক, পথভ্রষ্ট কারা!
ভয় নাহি, নাহি ভয়!
মিথ্যা হইবে ক্ষয়!
সত্য লভিবে জয়!

www.amarboi.org

ISBN 984-33-2265-4

আরজু পাবলিকেশন্স

পরিবেশনায়
ঢাকা বুক কর্ণার
৬০/ডি পুরানা পল্টন, ঢাকা ১০০০
ফোন : ০১৭১১০৩০৭১৬, ০১৯১৭ ২০৬৫০৪